Last 3 Minit_25-3-21
Datacenter_Prothoma Prokashon

পৃষ্ঠা ১৬০ = ফর্মা ১০

টেক্সট সাইজ = ৩.৭৫×৬.৭৫ ইঞ্চি
আফটার কাটিং = ৫.৩৫×৮.২৭ ইঞ্চি
১×১৬ ডিডি (২ লাইন বেশি) গোল্ডেন রেসিও
লেখা : ১২ পয়েন্ট × লাইন স্পেস : ১৩.৫

শব্দ : ৪৪,৫৩৫
(সফট কপি)
সম্পাদনার জন্য প্রিন্ট আবুল বাসারকে। মাসুম ২৩-১২-২০
আবুল বাসার ভাইয়ের কাটা কারেকশন করা হলো। মাসুম ৮-৩-২১
বানান সমন্বয়ের জন্য জাকারিয়া সুমনকে। মাসুম ৮-৩-২১
ওকে : বিপ্লব
নোট : দাগ দেখে দিতে হবে
দাগ দেখে দিয়েছি। উচ্ছ্বাস ৩০-০৩-২১
মেকআপ প্রিন্ট জাকারিয়া সুমনকে। মাসুম ১-৪-২১
সুমনের চূড়ান্ত কাটা কারেকশন করা হলো। এবং তার দাগানো জায়গাগুলো উচ্ছাস ঠিক করে দিলেন। মাসুম ৬-৪-২১
ব্ল্যাক হোল>ব্ল্যাকহোল
সৌর ভর>সৌরভর
তড়িচ্চুম্বকীয়>তড়িৎ-চুম্বকীয়
মেকআপ প্রিন্ট সম্পাদককে। মাসুম ৭-৪-২১
আবুল বাসারকে পিডিএফ। মাসুম ৭-৪-২১

দ্য লাস্ট থ্রি মিনিটস

পল ডেভিস

দ্য লাস্ট থ্রি মিনিটস

অনুবাদ

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

প্রথমা প্রকাশন

দ্য লাস্ট থ্রি মিনিটস
অনুবাদস্বত্ব © ২০২১ আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২১
চৈত্র ১৪২৭, এপ্রিল ২০২১

প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন : ৮১১০০৮১

প্রচ্ছদ : এরফান উদ্দিন আহমদ

মুদ্রণ : আর জে জেড প্রিন্টার্স
২৫৭ ফকিরেরপুল, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ২৮০ টাকা

The Last Three Minutes by Paul Davies
Translated in Bangla by Abdullah Adil Mahmud
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8110081
e-mail : prothoma@prothomalo.com

Price : Taka 280 only

ISBN 978 984 95673 5 6

ঘরে বসে বই পেতে ভিজিট করুন : www.prothoma.com
অথবা ফোন করুন : ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রজ মো. শহীদুল্লাহ শাহীন ভাই
যিনি সব সময় স্নেহের বাঁধনে
আটকে রেখেছেন আমাকে

অনুবাদকের ভূমিকা

মহাবিশ্ব নিয়ে সবচেয়ে বড় দুটি প্রশ্নের একটি মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ। আরেকটি তো জানাই। মহাবিশ্বের অতীত। মানে কীভাবে জন্ম হয়েছিল মহাবিশ্বের। এই দুটো প্রশ্নের উত্তর পেলেই পুরো মহাবিশ্বের ইতিহাস জানা হয়। মহাবিশ্বের অতীত নিয়ে নোবেলজয়ী পদার্থবিদ স্টিভেন উইনবার্গ লিখেছেন কালজয়ী বই `Å dvÔ¡ w^ wgwbUm। বলা বাহুল্য, নামটি যথেষ্ট সার্থক হয়েছে। `Å jvÔ¡ w^ wgwbUm বইটি নব্বইয়ের দশকে লেখা। বর্তমান সময়ের আলোকে তাই একে কিছুটা সেকেলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

বইটি লেখার পরে কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘটেছে জ্যোতির্বিদ্যায়। বইটির আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক একটি আবিষ্কার হলো ১৯৯৮ সালের মহাবিশ্বের ত্বরিত প্রসারণ accelerating expansion। এর মাধ্যমে জানা গেল, দূরের ছায়াপথরা কোনো পর্যবেক্ষক থেকে যত দূরে সরছে, ততই তাদের দূরে সরার বেগ বাড়ছে।

এ আবিষ্কারের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণায় কিছু পরিবর্তন আসে। এর ফলে বইয়ের অল্প কিছু তথ্য আপাতদৃষ্টে সেকেলে হয়ে গেছে। তবে পুরোপুরি সেকেলে হয়নি। বইটির শেষের দিকে মহাসংকোচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান জ্ঞান বলছে, মহাবিশ্ব আবার গুটিয়ে যাবে, সে সম্ভাবনা কম। তবে ঘটবেই না, এমনটা বলা সম্ভব না। ফলে বইটির ওই আলোচনা অর্থহীন নয়। তা ছাড়া মহাসংকোচন একেবারে বাতিল হয়ে থাকলেও এর সম্ভাব্য কৌশল ও ফলাফল কী হবে, সেটা নিয়ে বইটির আলোচনা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক।

বইটির আলোচ্য বিষয়কে যুগোপযোগী করে তুলতে বইটির পরিশিষ্ট অংশে মহাবিশ্বের সম্ভাব্য পরিণতিবিষয়ক একটি লেখা যুক্ত করেছি।

অত্যন্ত সতর্ক থাকা সত্ত্বেও বইটিতে কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। যেকোনো ধরনের ত্রুটি চোখে পড়লে ই-মেইলের মাধ্যমে আমাকে জানালে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব। কোনো পরামর্শ থাকলেও জানানোর অনুরোধ রইল।

বইটির উল্লেখযোগ্য অংশ অনলাইনে &3m.bishwo.com ঠিকানায় পড়া যাবে। পাওয়া যাবে সংশোধিত তথ্যও।

বইটি লেখার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে সহধর্মিণী সালমা সিদ্দিকার অকৃত্রিম উৎসাহ ও পরামর্শের জন্য তাঁদের সবার প্রতি ঐকান্তিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বরাবরের মতোই বইটি প্রকাশে 'বিজ্ঞানচিন্তা'র বাসার ভাই ও রনি ভাইয়ের ক্রমাগত ও নিঃস্বার্থ উৎসাহ দেওয়ার কথা আজীবন মনে থাকবে। এ জন্য তাঁদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বইটি প্রকাশ করার জন্য প্রথমা প্রকাশনের প্রকাশক ও প্রকাশনার সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত সবার প্রতিও অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ
০৮ অক্টোবর, ২০২০
পাবনা ক্যাডেট কলেজ
almahmud.sbi@gmail.com

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা ১১
প্রথম অধ্যায় : মহাপ্রলয় ১৫
দ্বিতীয় অধ্যায় : মুমূর্ষু মহাবিশ্ব ২২
তৃতীয় অধ্যায় : প্রথম তিন মিনিট ৩২
চতুর্থ অধ্যায় : নক্ষত্রের মৃত্যু ৪৮
পঞ্চম অধ্যায় : অন্ধকার অমানিশা ৫৯
ষষ্ঠ অধ্যায় : মহাবিশ্বের ওজন পরিমাপ ৭৫
সপ্তম অধ্যায় : চিরকাল একটি দীর্ঘ সময় ৮৯
অষ্টম অধ্যায় : ধীরগতির জীবন ১০৪
নবম অধ্যায় : দ্রুতগতির জীবন ১২০
দশম অধ্যায় : হঠাৎ মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ১২৮
একাদশ অধ্যায় : যে পৃথিবীর শেষ নেই ১৩৯

পরিশিষ্ট : মহাবিশ্বের সম্ভাব্য পরিণতি ১৫১

পরিভাষা ১৫৪

লেখকের ভূমিকা

১৯৬০-এর দশকের শুরুর দিকের কথা। আমি ছাত্র তখন। মহাবিশ্বের শুরুর রহস্য জানার অপরিসীম কৌতূহল সবার চোখে-মুখে। বিগ ব্যাং তত্ত্বের জন্ম সেই ১৯২০-এর দশকে হলেও একে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া শুরু ১৯৫০-এর দশকের পরে। সবাই এর সঙ্গে পরিচিত থাকলেও তত্ত্বটি তখনো তেমন কোনো আস্থা অর্জন করতে পারেনি। ওদিকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আছে স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্ব স্থির অবস্থা তত্ত্ব (steady-state theory)। মহাবিশ্বেরও কোনো শুরু থাকতে পারে, সে সম্ভাবনাই এটি নাকচ করে দিয়েছে। বিভিন্ন মহলের কাছে এটি তখনো সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব। এরপর ১৯৬৫ সালে এল রবার্ট পেনজিয়াস ও আর্নো উইলসনের আবিষ্কার। মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণ। দৃশ্যপট পুরোপুরি পাল্টে গেল। পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হলো, একটি উত্তপ্ত, উন্মত্ত ও আকস্মিক অবস্থা থেকে শুরু মহাবিশ্বের।

কসমোলজিস্টরা এই আবিষ্কারের ফলাফল বের করতে উঠেপড়ে লাগলেন। বিগ ব্যাংয়ের ১০ লাখ বছর পর মহাবিশ্ব কতটা উত্তপ্ত ছিল? এক বছর পর? এক সেকেন্ড পর? সেই প্রারম্ভিক চুল্লিতে কোন ধরনের ভৌত প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল? সৃষ্টির শুরুর কোনো ধ্বংসাবশেষ বাকি আছে, যা থেকে জানা যাবে সেই সময়ের চরম অবস্থার খবর।

আমার ভালোমতো মনে আছে, ১৯৬৮ সালে একটি লেকচার শুনতে গিয়েছিলাম। সবশেষে অধ্যাপক মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণের (cosmic background heat radiation) আবিষ্কারের আলোকে বিগ ব্যাং নিয়ে কথা বললেন। হাসিমুখে বললেন, 'বিগ ব্যাংয়ের পরের প্রথম তিন মিনিটে সংঘটিত নিউক্লীয় প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে কিছু তাত্ত্বিক মহাবিশ্বের রাসায়নিক উপাদানের বিবরণ দিয়েছেন।' দর্শকেরা হাসিতে ফেটে পড়লেন। মহাবিশ্বের জন্মের এত সামান্য সময় পরের অবস্থার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা কতই না হাস্যকর! এমনকি সপ্তদশ শতকের যাজক জেমস উশারও এমন দুঃসাহস করেননি। অথচ তিনিই কিন্তু বাইবেলের ক্রমানুপুঞ্জির ওপর ভিত্তি

করে দাবি করেছিলেন, ৪০০৪ খ্রিষ্টপূর্ব সালের ২৩ অক্টোবর তারিখে সৃষ্টি হয়েছিল মহাবিশ্ব। প্রথম তিন মিনিটের ঘটনাপ্রবাহের নিখুঁত বর্ণনা কিন্তু তিনিও দিতে চেষ্টা করেননি।

কিন্তু মহাজাগতিক তাপ বিকিরণ আবিষ্কারের মাত্র এক দশকের মধ্যেই পাল্টে গেল বিজ্ঞানের গতিধারা। প্রথম তিন মিনিট ছাত্রদেরও মনোযোগ কেড়ে নিল। বই লেখা হতে লাগল। ১৯৭৭ সালে আমেরিকান পদার্থবিদ ও কসমোলজিস্ট স্টিভেন ওয়াইনবার্গ লিখলেন একটি বেস্টসেলার বই। শিরোনাম `Å dvÕ¡ w^ wgwbUm বা প্রথম তিন মিনিট। জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রকাশনার জগতে এটি নতুন ধারার প্রবর্তন করে। লেখক বিশ্ববিখ্যাত একজন পণ্ডিত। বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরের প্রক্রিয়াগুলো সাধারণ পাঠকের জন্য লিখেছেন বিস্তারিত ও বোধগম্য করে।

একদিকে উত্তেজক আবিষ্কারগুলো সাধারণ মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করেছেন। ওদিকে বিজ্ঞানীরাও বসে নেই। আগ্রহের বিষয় গেল পাল্টে। একসময় আগ্রহের বিষয় ছিল মহাবিশ্বের প্রারম্ভিক অবস্থার খোঁজ জানা। মানে জন্মের প্রায় কয়েক মিনিট পরের কথা। আর এখন আগ্রহের বিষয় হয়ে গেল তারও অনেক আগের খবর। জন্মের এক সেকেন্ডের প্রায় অসীম ভগ্নাংশ সময় পরের অবস্থা। তার প্রায় এক দশক পরে ব্রিটিশ গাণিতিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং লিখলেন Av wed wmwÕ¡ Ae UvBg। এক সেকেন্ডের দশ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ে কী ঘটেছিল তা-ও বললেন তিনি। ১৯৬৮ সালের সেই লেকচারের শেষ হাসিটুকই আজ হাস্যকর হয়ে গেছে।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব এখন বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করে ফেলেছে। ফলে এখন বেশি চিন্তাভাবনা চলছে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে। মহাবিশ্বের শুরুর খবর আমরা ভালোই জানি। কিন্তু এর পরিণতি কেমন হবে? এর চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে কী বলা যায়? শেষও কি হবে ব্যাং (বিস্ফোরণ) বা আর্তনাদের মাধ্যমে? বা আদৌ কি এর শেষ আছে? আমাদেরই-বা কী হবে? আমরা বা আমাদের পরের প্রজন্ম কি চিরকাল টিকে থাকবে? যদিও-বা সেটা হয় রক্ত-মাংসের গড়া বা রোবটিক শরীর।

বিষয়গুলো নিয়ে কৌতূহলী না হয়েও উপায় নেই। যদিও পৃথিবীর শেষ এখনো দূরে আছে বলেই মনে হচ্ছে। বর্তমানে মানবসৃষ্ট নানা সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবীতে আগে আমরা নিছক টিকে থাকার সংগ্রাম নিয়ে চিন্তা করতাম। এখন ঘুরে গেছে সে চিন্তার মোড়। আমাদের এখন অস্তিত্বের মহাজাগতিক দিক নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। `Å jvÕ¡ w^ wgwbUm বইয়ে বলব ভবিষ্যৎ মহাবিশ্বের গল্প। বিখ্যাত কিছু পদার্থবিদ ও কসমোলজিস্টের সর্বশেষ চিন্তার আলোকে সবচেয়ে সেরা অনুমানটুকুই আমরা তুলে ধরব। এটা

কল্পনানির্ভর হবে না। সত্যি বলতে, ভবিষ্যতে নজিরবিহীন অনেক কিছুই ঘটতে পারে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, যেটা একবার অস্তিত্বে আসতে পারে, সেটা অস্তিত্ব হারাতেও পারে।

বইটি সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা। বিজ্ঞান বা গণিতের কোনো পূর্বজ্ঞান না থাকলেও চলবে। তবে মাঝেমধ্যেই আমাকে অনেক বড় বা অনেক ছোট সংখ্যা নিয়ে কথা বলতে হবে। এ ক্ষেত্রে ১০-এর ঘাত (পাওয়ার) ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত গাণিতিক প্রতীক ব্যবহার করলে সুবিধা হবে। যেমন ১০ হাজার কোটিকে লিখতে গেলে ১০০,০০০,০০০,০০০ লিখতে হয়। এটা অসুবিধাজনক। এখানে ১-এর পরে ১১টি শূন্য আছে। ফলে আমরা একে $১০^{১১}$ বা ১০-এর ১১তম ঘাত আকারে লিখতে পারি। একইভাবে ১০ লাখ হলো $১০^{৬}$, ১ লাখ কোটি হলো $১০^{১২}$ ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে, এই প্রতীকের মাধ্যমে সংখ্যাগুলোর বৃদ্ধির হার সরাসরি বোঝা কঠিন। $১০^{১২}$ সংখ্যাটি $১০^{১০}$-এর একশ গুণ। প্রায় একই মনে হলেও পার্থক্যটা কিন্তু বিশাল। ১০ এর পাওয়ার ঋণাত্মক বসিয়ে আবার খুব ছোট সংখ্যাদেরও প্রকাশ করা যায়। যেমন ১০০ কোটির এক ভাগ বা ১/১,০০০,০০০,০০০ কে $১০^{-৯}$ (টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইন) লেখা যায়। কারণ, ভগ্নাংশের হরে ১-এর পরে ৯টি শূন্য আছে।

শেষমেশ পাঠককে একটা কথা বলে রাখি, স্বাভাবিকভাবে বইটি অনেকটাই অনুমাননির্ভর। হ্যাঁ, বইয়ের অধিকাংশ কথাই বর্তমান বিজ্ঞানের সেরা তথ্যের আলোকেই বলা হয়েছে। কিন্তু এরপরও ভবিষ্যতের পূর্বাভাস অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমান মর্যাদা পেতে পারে না। তবু মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে অনুমান করার লোভ সামলানো সম্ভব নয়। এই খোলা মনের আলোকেই বইটি লেখা। বৈজ্ঞানিকভাবে এ কথাগুলো মোটামুটি স্বীকৃত যে বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে, এখন এটি শীতল ও প্রসারিত হতে হতে বিপরীত ধর্মের কোনো চূড়ান্ত অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অথবা হয়তো উন্মত্তভাবে সংকুচিত হয়ে যাবে। তবে যে সুদীর্ঘ সময় নিয়ে আমরা কথা বলছি, তাতে কোনো ভৌত প্রক্রিয়া যে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখবে, তা খুব বেশি নিশ্চিত করে বলার সুযোগ নেই। সাধারণ নক্ষত্রের পরিণতি সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা মোটামুটি পরিষ্কার। নিউট্রন নক্ষত্র ও ব্ল্যাকহোলের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও তাঁদের ধারণা দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু যদি মহাবিশ্ব আরও লাখো কোটি বছর বা তারও বেশি সময় টিকে থাকে, তাহলে এতে এমন কোনো সূক্ষ্ম ভৌত প্রতিক্রিয়া ঘটতেও পারে, যা সম্পর্কে আমাদের অনুমান করা ছাড়া কিছু করার নেই। একসময় হয়তো সেটাই হবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া।

প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কিন্তু অসম্পূর্ণ। ফলে মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি জানার চেষ্টা ও অনুমান করার উপায় আছে একটিই। আমাদের হাতে যেসব তত্ত্ব আছে, সেগুলো কাজে লাগিয়েই যুক্তিভিত্তিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু এতেও সমস্যা আছে। মহাবিশ্বের পরিণতিবিষয়ক অনেক তত্ত্বেরই এখন পর্যন্ত প্রায়োগিক পরীক্ষা হয়নি। এমন কিছু বিষয়েও আলোচনা করেছি যেগুলো নিয়ে তাত্ত্বিকেরা খুব আশাবাদী, কিন্তু এখনো তার প্রমাণ মেলেনি। যেমন মহাকর্ষ তরঙ্গ নির্গমন [২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ তরঙ্গ পাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল আগের বছরের অক্টোবরেই। ফলে বইটির গুরুত্ব বাড়ল বলা চলে।—অনুবাদক], প্রোটন ক্ষয় (proton decay) ও ব্ল্যাকহোল রেডিয়েন্স। আবার একইভাবে এমন কোনো ভৌত প্রক্রিয়াও নিশ্চয়ই থাকবে, যা আমরা এখন একেবারেই জানি না। হয়তো সেটা এ বইয়ের কথাগুলোকে বহুলাংশে পাল্টে দেবে।

মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণীর সম্ভাব্য কার্যক্রমের কথা ভাবলে এই অনিশ্চয়তাই আরও বড় হয়ে দেখা দেয়। এবার আমরা বিজ্ঞান কল্পকাহিনির জগতে প্রবেশ করে ফেলেছি। তবুও এমনটা তো হতেই পারে যে কালের আবর্তনে একসময় জীবিত প্রাণীরা ভৌত সিস্টেমের আচরণ ক্রমেই বড় পরিসরে উল্লেখযোগ্য রকম পরিবর্তন করে ফেলল। মহাবিশ্বের প্রাণ সম্পর্কেও আমি আলোচনা করেছি। কারণ, অনেক পাঠক মহাবিশ্বের পরিণতি জানতে চান মূলত মানুষ বা তার পরবর্তী প্রজন্মের পরিণতি জানার জন্যই। তবে মনে রাখতে হবে, মানুষের চেতনার প্রকৃতি সম্পর্কে এখনো বিজ্ঞানীরা সঠিক করে কিছুই জানেন না। এটাও জানা নেই যে দূর ভবিষ্যতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে চেতনার মধ্যে কোন গুণাবলি থাকা প্রয়োজন।

বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সহায়ক আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য কয়েকজন মানুষকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। তাঁরা হলেন জন ব্যারো, ফ্র্যাঙ্ক টিপলার, জ্যাসন টমলি, রজার পেনরোজ ও ডানকান স্টিল। সিরিজের সম্পাদক জেরি লিয়নস পাণ্ডুলিপি গুরুত্বের সঙ্গে পড়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁকেও ধন্যবাদ। চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিতে কাজ করার জন্য স্যারা লিপিনকটকেও ধন্যবাদ।

পল ডেভিস

প্রথম অধ্যায়

মহাপ্রলয়

তারিখ : ২১ আগস্ট, ২১২৬। মহাপ্রলয়
স্থান : পৃথিবী

পৃথিবীর নানা প্রান্তে হতাশায় আচ্ছন্ন অনেকগুলো মানুষ লুকানোর চেষ্টায় ব্যস্ত। কোটি কোটি মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ পালিয়েছে ভূমির গভীরে। আশ্রয় নিয়েছে গুহা বা খনির দেয়ালে। কেউ আবার সাবমেরিনে চেপে সাগরে ডুব দিয়েছে। কেউ কেউ বেপরোয়াভাবে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে। তবে অধিকাংশ মানুষই হতবুদ্ধি ও বিষণ্ন বসে আছে। অপেক্ষা করছে শেষ পরিণতির জন্য।

আকাশের অনেক উঁচুতে আলোর একটি বড় রেখা দেখা যাচ্ছে। শুরুতে দেখা গিয়েছিল শুধু হালকা ধোঁয়ার মৃদু বিকিরণ। একদিন সেটাই মহাশূন্যের বুকে গড়ে তুলল ফুটন্ত গ্যাসের প্রচণ্ড ঘূর্ণি। গ্যাসের ওপরের দিকে একটি কালো, কুৎসিত ও ভয়ানক জিনিস দেখা যাচ্ছে। ধূমকেতুটির ক্ষুদ্র মাথা দেখে এর ভয়ানক ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা আঁচ করা কঠিন। সেকেন্ডে প্রায় ৪০ হাজার মাইল বেগে এটি ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। প্রতি সেকেন্ডে ১০ মাইল। লাখো কোটি টন বরফ ও পাথর শব্দের ৭০ গুণ বেগে পৃথিবীতে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত।

দেখা ও অপেক্ষা করা ছাড়া মানুষের করার কিছুই নেই। অনিবার্য পরিণতির মুখে পড়ে বিজ্ঞানীরা বহু আগেই টেলিস্কোপ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছেন। নীরবে বন্ধ করে দিয়েছেন কম্পিউটার। দুর্যোগের সঠিক আচরণ এখনো সঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না। যেটুকু জানা গেছে,

সেটাই এত ভয়াবহ যে তা সাধারণ মানুষকে জানানো ঠিক হবে না। কোনো কোনো বিজ্ঞানী টিকে থাকার কিছু পূর্ণাঙ্গ কৌশল তৈরি করেছেন। নিজেদের টেকনিক্যাল জ্ঞান কাজে লাগিয়ে অন্যদের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার ইচ্ছা তাঁদের। কেউ কেউ দুর্যোগটিকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণের চেষ্টারত। শেষ দিনটি পর্যন্তও তাঁরা তাঁদের সত্যিকার বিজ্ঞানীসুলভ আচরণ বজায় রাখতে চাচ্ছেন। পৃথিবীর গভীরে রাখা টাইম ক্যাপসুলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন সে উপাত্ত। উদ্দেশ্য, ভবিষৎ বংশধরেরা যাতে সেটা কাজে লাগাতে পারেন।

সংঘর্ষের মুহূর্ত আরও ঘনিয়ে এল। সারা পৃথিবীর লাখো মানুষ ভয়ে ভয়ে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। শেষ তিনটি মিনিট।

গ্রাউন্ড জিরোর ঠিক ওপরে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল। এক হাজার ঘন মাইল পরিমাণ বায়ু ছুটে গেল একদিকে। একটি শহরের আকারের চেয়েও বেশি পরিমাণ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ভূমির দিকে এগিয়ে আসছে। ১৫ সেকেন্ড পরই আঘাত হানল ভূপৃষ্ঠে। ১০ হাজার ভূমিকম্পের সমান আঘাতে কেঁপে উঠল পৃথিবী। স্থানান্তরিত বাতাসের শকওয়েভ উড়ে যাচ্ছে পৃথিবীপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে। ভেঙে পড়ল স্থাপনাগুলো। যেটাই সামনে পড়ল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সংঘর্ষের স্থানের চারপাশে সমতলভূমিতে একটি বৃত্তাকার তরল পাহাড় তৈরি হলো। উচ্চতা কয়েক মাইল। ১০০ মিটার চওড়া গর্ত দিয়ে পৃথিবীর ভেতরের বস্তু বেরিয়ে আসছে। গলিত পাথরের দেয়াল ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। এ তীব্র আঘাতের সামনে ভূপৃষ্ঠ যেন সামান্য একটি কম্বল।

গর্তের ভেতরের লাখো-কোটি টন পাথর বাষ্পীভূত হয়ে গেছে। তার চেয়ে অনেক বেশি ছিটকে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কিছু কিছু চলে যাচ্ছে মহাকাশের দিকেও। এর চেয়ে বেশি পরিমাণে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অর্ধমহাদেশ এলাকাজুড়ে। এরপর পতিত হচ্ছে শত শত, এমনকি হাজার হাজার মাইল দূরের এলাকায়। যেখানেই তা পড়ছে, ঘটাচ্ছে মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ। কিছু কিছু নিক্ষিপ্ত পদার্থ গিয়ে পড়ছে সাগরে। সেটা থেকে শুরু হচ্ছে সুনামি। ফলে দুর্যোগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেল। ধুলোময় ধ্বংসাবশেষের একটি বড় অংশ বায়ুমণ্ডলে উঠে গেল। সূর্য পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল। সূর্যের আলোর মুখ দেখা যাচ্ছে না পৃথিবীর কোথাও থেকে। তার বদলে দেখা যাচ্ছে শত কোটি উল্কার পৈশাচিক ঝলকানি। তীব্র উত্তাপ পাঠিয়ে এরা ঝলসে দিচ্ছে মাটির পৃথিবী। কারণ, বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলো মহাশূন্য থেকে আবার ফিরে আসছে বায়ুমণ্ডলে।

ওপরের দৃশ্যপটটি একটি অনুমান। সুইফট টাটল (Swift-Tuttle) নামের একটি ধূমকেতু ২১২৬ সালের ২১ আগস্ট তারিখে পৃথিবীতে আঘাত হানবে। যদি সেটাই ঘটে, বৈশ্বিক দুর্যোগ অবধারিত। ইতি ঘটবে মানুষেরও। ১৯৯৩ সালে একে দেখার পর হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেল, ২১২৬ সালে আসলেই একটি সংঘর্ষ হতে যাচ্ছে। পরে সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, এটি এক সপ্তাহের জন্য পৃথিবীকে মিস করবে। অল্পের জন্য বাঁচা। আমরা এর দিক থেকে নিশ্চিন্তেই থাকতে পারি। তবে বিপদ যে একেবারেই নেই, তা কিন্তু নয়। আজ হোক, কাল হোক, সুইফট টাটল বা এরই মতো কেউ পৃথিবীতে আঘাত হানবেই। হিসাব করে দেখা গেছে, অর্ধ কিলোমিটার বা তারও বেশি চওড়া দশ হাজার বস্তুর কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের ওপর দিয়ে গেছে। বিশাল বিশাল এই উপদ্রবগুলোর জন্ম সৌরজগতের বহিঃস্থ শীতল এলাকায়। কিছু কিছু হলো ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষ। আটকা পড়ে আছে গ্রহদের মহাকর্ষীয় বাঁধনে। অন্যদের উৎপত্তি গ্রহাণু বেষ্টনীতে (asteroid belt)। জায়গাটা মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যখানে। কক্ষপথের ভারসাম্যহীনতার কারণে এরা নিয়মিত সৌরজগতে আসা-যাওয়া করছে। আকারে ছোট হলেও এদের প্রতিক্রিয়া ভয়ংকর। পৃথিবী ও অন্য গ্রহদের স্থায়ী বিপদের কারণ।

এ বস্তুগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই পৃথিবীর সব নিউক্লিয়ার অস্ত্রের চেয়েও বেশি ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম। যেকোনো সময় কোনো একটি আঘাত হানতে পারে। সেটা মানুষের জন্য একটি খারাপ খবরই হবে। সেটা হবে মানবেতিহাসের একটি আকস্মিক ও নজিরবিহীন প্রতিবন্ধক। কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে এ রকম ঘটনা মোটামুটি নিয়ম মেনে চলে। ধূমকেতু বা গ্রহাণুর এ মাত্রার সংঘর্ষ গড়ে কয়েক মিলিয়ন[১] বছরে একবার ঘটে। অনেকের বিশ্বাস, এ ধরনের এক বা একাধিক ঘটনার ফলেই সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরেরবার হয়তো আমাদের পালা।

অনেক ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষেরা অ্যারমাগেডন[২] দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। বাইবেলের *eK Ae wiwfGjkb* পুস্তকে এ যুদ্ধে সংঘটিত হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির ভালো একটি বিবরণ দেওয়া আছে। সেটা এ রকম :

> এরপর এল বিদ্যুচ্চমক, বজ্রধ্বনি ও গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। সঙ্গে একটি তীব্র ভূমিকম্প। মানুষ পৃথিবীতে পা ফেলার পর এত বড় ভূমিকম্প আর কখনো ঘটেনি। এটা এতই তীব্র ছিল। বিভিন্ন দেশের শহরগুলো ভেঙে পড়ল। দ্বীপগুলো হারিয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে না পাহাড়গুলোও। আকাশ থেকে একেকটি ১০০ পাউন্ড[৩]

ওজনের শিলাবৃষ্টি পড়ল মানুষের মাথা ওপর। শিলাবৃষ্টির প্রকোপে মানুষ এলোমেলো গালাগাল বকতে লাগল। প্রকোপটা আসলেই ভয়াবহ ছিল।

অবশ্যই পৃথিবী আরও নানা রকম প্রতিকূল ঘটনার শিকার হতে পারে। বিপুল পরিমাণ বলের বাঁধনে পরিব্যাপ্ত মহাবিশ্বে পুঁচকে একটি বস্তু এই পৃথিবী। এত কিছুর পরও অন্তত সাড়ে তিন শ কোটি বছর ধরে আমাদের গ্রহটি প্রাণ ধারণের উপযোগী আছে। তবে গ্রহটিতে আমাদের সাফল্যের পেছনে রহস্য কিন্তু মহাকাশই। সেটা অনেকভাবেই। বিশাল শূন্যতার মহাসাগরে আমাদের সৌরজগৎ ক্ষুদ্র একটি সক্রিয় অঞ্চল। আমাদের নিকটতম নক্ষত্রের (সূর্যের পরে) অবস্থান চার আলোকবর্ষ[৪] দূরে। এই দূরত্ব কত বেশি, সেটা বুঝতে হলে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। সূর্য থেকে মাত্র সাড়ে আট মিনিটের মধ্যে আলো প্রায় ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল পথ পেরিয়ে আসে। চার বছরে তা অতিক্রম করে ২০ ট্রিলিয়ন (২০ লাখ কোটি) মাইলের বেশি পথ।

সূর্য একটি আদর্শ বামন নক্ষত্র। অবস্থান আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের (Milky Way galaxy) একটি আদর্শ অঞ্চলে। এ ছায়াপথে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার কোটি। কারও ভর সূর্যের কয়েক শতাংশ। কারও কারও ভর আবার সূর্যের ১০০ গুণ। এরা ধীরে ধীরে ছায়াপথের কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরছে। ঘুরছে ছায়াপথে থাকা প্রচুর পরিমাণ গ্যাসীয় মেঘ ও ধুলা, অজানাসংখ্যক ধূমকেতু ও গ্রহাণু, গ্রহ এবং কৃষ্ণগহ্বরও। এই বিপুল পরিমাণ বস্তুর উপস্থিতির কথা শুনে মনে হতে পারে, ছায়াপথটি বুঝি বিভিন্ন বস্তু দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি। এ ধারণা ভুল। আসলে ছায়াপথটির দৃশ্যমান অংশ প্রায় এক লাখ আলোকবর্ষ পরিমাণ চওড়া। আকৃতি হলো থালার মতো। কেন্দ্রীয় অংশটা একটু স্ফীত। একে ঘিরে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি সর্পিল বাহু। বাহুগুলো গড়া নক্ষত্র ও গ্যাসীয় পদার্থ দ্বারা। এমনই একটি সর্পিল বাহুতে রয়েছে আমাদের সূর্য। কেন্দ্র থেকে এটি আছে প্রায় ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে।

আমরা যত দূর জানি, আকাশগঙ্গা ছায়াপথে খুব ব্যতিক্রমধর্মী কিছুই নেই। একই রকম আরেকটি ছায়াপথ হলো অ্যান্ড্রোমিডা। এটি আছে আমাদের থেকে ২০ লাখ আলোকবর্ষ দূরে। আকাশের অ্যান্ড্রোমিডা তারামণ্ডলের দিকে এর অবস্থান[৫]। খালি চোখে একে ঝাপসা ছোপ ছোপ আলোর মতো মনে হয়। বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র সাজিয়ে রেখেছে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্ব। কোনোটি সর্পিল, কোনোটি উপবৃত্তাকার, কোনোটি আবার নির্দিষ্ট আকারহীন। দূরত্বের মাপকাঠি এখানে বিশাল। শক্তিশালী

টেলিস্কোপের সাহায্যে কয়েক বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের ছায়াপথও আলাদাভাবে দেখা সম্ভব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো এদের আলো আমাদের কাছে পৌঁছাতেই পৃথিবীর বয়সের (সাড়ে ৪০০ কোটি বছর) চেয়ে বেশি সময় লেগে গেছে।

এই বিশাল ফাঁকা স্থানের উপস্থিতির অর্থ হলো, মহাকাশে সংঘর্ষের ঘটনা খুব বেশি ঘটে না। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিপদ লুকিয়ে আছে এর আশপাশেই। গ্রহাণুদের কক্ষপথ সাধারণত পৃথিবীর কাছাকাছি থাকে না। এদের বড় অংশই মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানের গ্রহাণু বেষ্টনীতেই থাকে সব সময়। তবে বৃহস্পতির বিপুল ভর গ্রহাণুদের কক্ষপথ থেকে ছিটকে দিতে পারে। ফলে এদের কোনো কোনোটি সূর্যের দিকে চলে আসে। ডেকে আনে পৃথিবীর বিপদ।

আরেকটি বিপদ হলো ধূমকেতু। মনে করা হয়, দর্শনীয় এ বস্তুগুলোর উৎপত্তি সূর্য থেকে প্রায় এক আলোকবর্ষ দূরের একটি মেঘপুঞ্জে। এখানে দোষ বৃহস্পতির নয়। দায়ী বরং কাছের নক্ষত্ররা। ছায়াপথ স্থির বসে নেই। শুধু নক্ষত্রগুলোই ছায়াপথ কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে না, ছায়াপথ নিজেও ধীরে ধীরে আবর্তন করছে। সূর্য তার সঙ্গী গ্রহদের নিয়ে প্রায় ২০ কোটি বছরে ছায়াপথকে পুরো একবার ঘুরে আসে। এ যাত্রাপথে মুখোমুখি হতে হয় নানা রকম অভিজ্ঞতার। নিকটবর্তী নক্ষত্ররা ধূমকেতুর মেঘকে নাড়িয়ে দিতে পারে। কিছু কিছু ধূমকেতু তখন ছিটকে আসবে সূর্যের দিকে। ধূমকেতুরা সৌরজগতের ভেতরের দিকে চলে এলে সূর্যের উত্তাপে এদের উদ্বায়ী পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে যায়। সৌরবায়ুর ধাক্কায় একটি লম্বা প্রবাহ তৈরি হয়। এটাই ধূমকেতুর বিখ্যাত লেজ। সৌরজগতের ভেতরের দিকে চলে এলেও ধূমকেতুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হওয়ার আশঙ্কা খুব কম। ক্ষতি ধূমকেতুও করে। তবে তার দোষ কিন্তু পড়ে পথে দেখা হওয়া নক্ষত্রের ওপর। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো যে নক্ষত্রের মধ্যের দূরত্ব অনেক বেশি হওয়ায় এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটে না।

ছায়াপথের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে আরও কিছু বস্তু আমাদের দিকে চলে আসতে পারে। যেমন ছায়াপথে ভেসে চলা গ্যাসের বড় বড় মেঘপুঞ্জ। এরা অনেক চিকন হলেও সৌরবায়ুকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রভাবিত করতে পারে সূর্য থেকে আসা তাপের প্রবাহকে। অন্ধকার মহাশূন্যে আরও নানান ভয়ানক জিনিস লুকিয়ে থাকতে পারে। যেমন, বিচ্ছিন্ন গ্রহ, নিউট্রন নক্ষত্র, বাদামি বামন, কৃষ্ণগহ্বর ইত্যাদি[৬]। এরাসহ আরও অনেকেই আমাদের অজান্তেই আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে পারে। সৌরজগতে ঘটে যেতে পারে টালমাটাল অবস্থা।

বিপদ আরও ভয়াবহও হতে পারে। কোনো কোনো জ্যোতির্বিদ মনে করেন, সূর্য হয়তো একটি দ্বি-তারা[৭] জগতের অংশ। আমাদের ছায়াপথের আরও বহু নক্ষত্রের অবস্থাই এমন। প্রস্তাবিত সূর্যের এই সঙ্গী তারাটির নাম নেমেসিস। তবে অস্তিত্ব থাকলেও এটা হবে অনেক বেশি অনুজ্জ্বল। দূরত্ব হবে অনেক বেশি। এ জন্যই এখনো একে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সূর্যের চারপাশের কক্ষপথে এর গতি ধীর হলেও মহাকর্ষের মাধ্যমে এটি উপস্থিতির জানান দিতে পারে। মাঝেমধ্যে দূরের ধূমকেতুদের গতিপথ পাল্টে পাঠিয়ে দিতে পারে পৃথিবীর দিকে। পরিণতিতে ঘটবে একের পর এক সাংঘাতিক সংঘর্ষ। ভূতাত্ত্বিকেরা দেখেছেন যে নিয়মিত বিরতিতে বড় আকারের বস্তুগত (ecological) বিপর্যয় ঘটে। এটা ঘটে প্রতি ৩০ লাখ বছর পরে একবার।

আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতির্বিদেরা জানলেন, সম্পূর্ণ ছায়াপথগুলোই সংঘর্ষ বাধাতে পারে। আকাশগঙ্গার সঙ্গে আরেকটি ছায়াপথের ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা কেমন? এমন কিছু প্রমাণ অবশ্য আছেই। নক্ষত্রদের দ্রুত চলাচল দেখে বোঝা যায়, ইতিমধ্যে আকাশগঙ্গা ছায়াপথ কাছের ছায়াপথগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষ করে নড়েচড়ে বসেছে। তবে কাছের দুটো ছায়াপথের সংঘর্ষ বাধলেই যে ছায়াপথ পরিবারের নক্ষত্রদেরও বিপর্যয় ঘটবে, এমন কোনো কথা নেই। ছায়াপথগুলোর ঘনত্ব এত কম যে নক্ষত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ না ঘটিয়েও এরা একে অন্যের সঙ্গে মিশে যেতে পারে।

মহাপ্রলয়ের আলোচনা অধিকাংশ মানুষকে মুগ্ধ করে। তাদের কাছে মহাপ্রলয় মানে আকস্মিক ও দৃষ্টিকাড়া উপায়ে পৃথিবীর মৃত্যু। তবে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে হঠাৎ মৃত্যুর মধ্যেই বিপদ কম। অনেকগুলো উপায়ে পৃথিবী ধীরে ধীরে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। যেমন বাস্তুসংস্থানের ক্রমাবনতি, জলবায়ু পরিবর্তন বা সূর্য থেকে আসা তাপের পরিমাণের একটুখানি তারতম্য। ভঙ্গুর পৃথিবীতে এগুলো আমাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে না ফেললেও আরাম-আয়েশের জীবনে ইতি অবশ্যই ঘটাবে। তবে এ ধরনের পরিবর্তন ঘটতে হাজার হাজার বা এমনকি লাখো বছরও লেগে যায়। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষ হয়তো এগুলোকে প্রতিরোধও করতে পারবে। যেমন নতুন করে ধীরে ধীরে বরফযুগের সূচনা হতে থাকলেও আমাদের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটবে না। সেটা ঘটার আগে সবকিছু নতুন করে ঢেলে সাজানোর জন্য যথেষ্ট সময় হাতে থাকবে আমাদের। ধরে নেওয়া যায় যে একবিংশ শতাব্দীতেও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটতে থাকবে। ফলে এটা বিশ্বাসযোগ্য যে মানুষ বা তার বংশধরেরা ক্রমেই জগতের বড় কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে। ঠেকাতে পারবে বড় সব দুর্যোগও।

তাত্ত্বিকভাবে কি মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে? হয়তো পারে। কিন্তু আমরা দেখব, অমরত্ব অর্জন করা সোজা কথা নয়। হয়তো সেটা অসম্ভবই। মহাবিশ্ব নিজেই ভৌত সূত্রের অধীন। সূত্রগুলোই এর জীবনচক্র বেঁধে দিয়েছে: জন্ম, ক্রমবিকাশ এবং হয়তো মৃত্যু। নক্ষত্রের নিয়তির সঙ্গে আমাদের নিয়তি অনিবার্যভাবে জড়িয়ে আছে।

তথ্যনির্দেশ

১. ১ মিলিয়ন সমান ১০ লাখ।
২. বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অংশ অনুসারে পৃথিবীর শেষের দিকে একটি বড় যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধের ময়দানের সত্যিকার বা প্রতীকী নাম হলো অ্যারমাগেডন।
৩. ১ পাউন্ড সমান ০.৪৫৩৬ কেজি। মানে, ১০০ পাউন্ড সমান প্রায় ৪৫ কেজি।
৪. এক আলোকবর্ষ হলো আলোর এক বছরে অতিক্রান্ত দূরত্ব। আলোর বেগ সেকেন্ডে ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল।
৫. অ্যান্ড্রোমিডা একই সঙ্গে একটি ছায়াপথ এবং একটি তারামণ্ডলের নাম। মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান নির্দিষ্ট করার জন্য পুরো আকাশের দৃশ্যমান গোলককে ৮৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রতিটিকে এক একটি তারামণ্ডল (constellation) বলে।
৬. এদের পরিচয় ও পার্থক্য দেখুন পরিশিষ্ট অংশে।
৭. বর্তমানে দ্বি-তারা বা ডাবল স্টার বলা হয় এমন দুটো তারাকে যাদের পৃথিবী থেকে দেখতে খুব কাছাকাছি মনে হয়। বাস্তবে এরা নিজেদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেও পৃথিবীর আকাশে কাছাকাছি অবস্থানে থাকতে পারে। আবার হতে পারে, এরা একে অপরকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এদের বাইনারি স্টার বা জোড়া তারা বলে। আলোচ্য অংশে দ্বি-তারা বলতে আসলে জোড়া তারাকে বোঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুমূর্ষু মহাবিশ্ব

১৮৫৬ সালের কথা। জার্মান পদার্থবিদ হেরম্যান ভন হেলমহল্টজ বিজ্ঞানের ইতিহাসের সম্ভবত সবচেয়ে হতাশাজনক অনুমানটি করেন। হেলমহল্টজ বললেন, মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে মহাবিশ্ব। তাঁর এ অনুমানের ভিত্তি হলো তথাকথিত তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র। সূত্রটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ঊনবিংশ শতকের শুরুর দিকে। উদ্দেশ্য ছিল তাপ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতার (efficiency) সংজ্ঞা দেওয়া। অল্প দিনের মাথায়ই সূত্রটির বিশ্বজনীন গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়ে গেল (অনেক সময় একে সহজ করে দ্য সেকেন্ড ল বা দ্বিতীয় সূত্রও বলা হয়)। প্রকৃতপক্ষে আক্ষরিক অর্থেই এর গুরুত্ব বিশ্বজনীন, তথা মহাবিশ্বজুড়ে।

সবচেয়ে সহজ কথায় দ্বিতীয় সূত্রের বক্তব্য হলো, তাপ প্রবাহিত হয় উত্তপ্ত বস্তু থেকে শীতল বস্তুর দিকে। হ্যাঁ, ভৌত পরিবেশের একটি পরিষ্কার ও পরিচিত বৈশিষ্ট্য এটি। খাবার রান্না করতে গেলে বা গরিম কফি ঠান্ডা করতে গেলেই সূত্রটির দেখা পাই আমরা। উচ্চ তাপমাত্রার এলাকা থেকে তাপ নিম্ন তাপমাত্রার এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। এতে কোনো রহস্য নেই। পদার্থের অণুর জগতের কম্পনের মাধ্যমে তাপ নিজের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। গ্যাসের মধ্যে (যেমন বায়ু) অণুরা এলোমেলোভাবে ছোটাছুটি ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এমনকি কঠিন পদার্থের মধ্যেও পরমাণুরা প্রবলভাবে স্পন্দিত হয়। পদার্থের উষ্ণতা যত বেশি হবে, অণুর কম্পনের প্রাবল্যও তত বেশি হবে। ভিন্ন তাপমাত্রার দুটো বস্তুকে সংস্পর্শে আনা হলে উত্তপ্ত বস্তুটির অধিকতর প্রবল কম্পন অল্প সময়ের মধ্যেই ঠান্ডা বস্তুটিতে ছড়িয়ে পড়বে।

তাপের প্রবাহ যেহেতু একমুখী, তাই প্রক্রিয়াটিতে সময়ের ভারসাম্য নেই। কোনো মুভিতে যদি দেখানো হয়, ঠান্ডা বস্তু থেকে তাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গরম বস্তুতে যাচ্ছে, সেটা খুবই হাস্যকর হবে। একই রকম হাস্যকর হবে নদীর পানি ঢালু বেয়ে উঠে যাচ্ছে বা বৃষ্টির ফোঁটা মেঘে গিয়ে জমা হচ্ছে দেখানোটা।

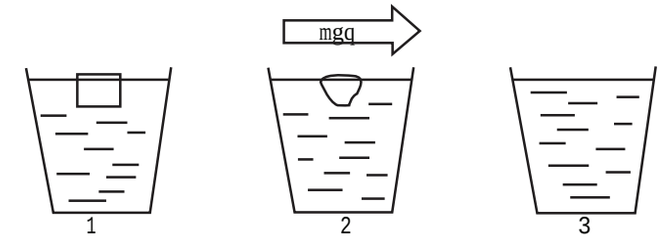

চিত্র ২.১

অ্যারো অব টাইম বা সময়ের তির। বরফের গলন থেকে সময়প্রবাহের দিক সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তাপ গরম পানি থেকে ঠান্ডা বরফের দিকে প্রবাহিত হয়। কোনো মুভিতে যদি ওপরের ছবির ঘটনাটি ৩, ২, ১ আকারে দেখানো হয়, তবে ভুলটি সহজেই সবার চোখে ধরা পড়বে। এনট্রপি নামে একটি রাশি এ অপ্রতিসাম্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। বরফ গললে এর পরিমাণ বাড়ে।

ফলে আমরা তাপপ্রবাহের একটি মৌলিক দিকমুখিতা দেখতে পাচ্ছি। একে অনেক সময় অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে চিহ্নিত একটি তিরের মাধ্যমে দেখানো হয়। সময়ের এই 'তির' তাপগতীয় প্রক্রিয়ার অপ্রত্যাগামী[১] আচরণ প্রকাশ করে। দেড় শ বছর ধরে বিষয়টি পদার্থবিজ্ঞানীদের অভিভূত করেছে চলেছে। (দেখুন চিত্র ২.১)

তাপগতিবিদ্যার অপ্রত্যাগামী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্য এনট্রপি রাশিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টির স্বীকৃতি মেলে হেলমহল্টজ, রুডলফ ক্লসিয়াস ও লর্ড কেলভিনের কাজের মাধ্যমে। একটি সহজ বিষয় চিন্তা করা যাক। একটি উষ্ণ বস্তু একটি ঠান্ডা বস্তুর সংস্পর্শে আছে। এ ক্ষেত্রে তাপশক্তি ও তাপমাত্রা অনুপাতকে এনট্রপির সংজ্ঞা হিসেবে চিন্তা করা যায়। মনে করুন, অল্প পরিমাণ তাপ উষ্ণ বস্তুটি থেকে শীতল বস্তুতে প্রবাহিত হচ্ছে। উষ্ণ বস্তুটি কিছু এনট্রপি হারাবে, আর শীতল বস্তুটি কিছু এনট্রপি লাভ করবে। এখানে তাপশক্তির পরিমাণ একই থাকলেও তাপমাত্রা কিন্তু ভিন্ন ছিল। অতএব, উষ্ণ বস্তুটি যতটুকু এনট্রপি হারিয়েছে, শীতল বস্তুটি তার চেয়ে বেশি এনট্রপি লাভ করেছে। ফলে সিস্টেমের মোট এনট্রপি, মানে উষ্ণ ও বস্তু শীতল বস্তুর এনট্রপির সমষ্টি বেড়েছে। তার মানে, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে আরেকভাবেও বলা যায়। এ ধরনের সিস্টেমের এনট্রপি কখনো হ্রাস পাবে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ তাপকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শীতল বস্তু থেকে উষ্ণ বস্তুতে প্রবাহিত হতে হবে।

আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সূত্রটিকে যেকোনো বদ্ধ সিস্টেমের জন্য প্রয়োগ করা যায়: এনট্রপি কখনোই কমে না। ধরা যাক, সিস্টেমে আছে একটি রেফ্রিজারেটর (ফ্রিজ)। এটি শীতল বস্তু থেকে উত্তপ্ত বস্তুতে তাপ পাঠায়। এনট্রপির মোট পরিমাণ হিসাব করতে হলে ফ্রিজ চালানোর জন্য ব্যয় হওয়া শক্তির কথা মাথায় রাখতে হবে। এই ব্যয়ের প্রক্রিয়ার কারণেই কিছু এনট্রপি বেড়ে যাবে। ফলে সব সময় একই ঘটনা ঘটবে। ফ্রিজ ঠান্ডা বস্তুকে গরম করে কিছু এনট্রপি কমাবে ঠিকই, কিন্তু ফ্রিজ চালু রাখতে গিয়ে যে পরিমাণ এনট্রপি বাড়বে, সেটা এর চেয়ে ঢের বেশি। প্রাকৃতিক সিস্টেমগুলোতেও একই ঘটনা ঘটে। যেমন বিভিন্ন জীবের দেহে বা স্ফটিক তৈরির প্রক্রিয়া। সিস্টেমের এক অংশের এনট্রপি কমে যায়, কিন্তু অপর কোনো অংশে ঠিকই তার চেয়ে বেশি পরিমাণ এনট্রপি বেড়ে যায়। সব মিলিয়ে চিন্তা করলে এনট্রপি কখনোই কমে না।

সামগ্রিকভাবে পুরো মহাবিশ্বকে একটি বদ্ধ সিস্টেম ভাবা যায়। এই অর্থে এর 'বাইরে' কিছুই নেই। তাহলে, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বাভাস প্রদান করে। সেটি হলো মহাবিশ্বের মোট এনট্রপি কখনোই কমে না। এটি অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়েই চলে। আমাদের খুব কাছেই তো এর একটি নমুনা আছে। বলছি সূর্যের কথা। সূর্য অবিরাম মহাশূন্যের শীতল অঞ্চলের দিকে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাপ ছড়িয়ে পড়ছে মহাবিশ্বজুড়ে। ফিরে আসছে না কখনো। একটি স্পষ্ট অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়া।

ভাবনার বিষয় হলো, এটা কি সম্ভব যে মহাবিশ্বের এনট্রপি চিরকাল বাড়তেই থাকবে। মনে করুন, এমন একটি পাত্র নেওয়া হলো, যেখান থেকে কোনো তাপ বের হতে পারে না, আবার কোনো তাপ সেখানে প্রবেশও করতে পারে না। ধরুন, সেখানে একটি উষ্ণ ও একটি শীতল বস্তুকে পাশাপাশি রাখা হলো। তাপশক্তি উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে প্রবাহিত হবে। এনট্রপি বাড়বে। কিন্তু একপর্যায়ে শীতল বস্তুটি গরম হবে এবং উষ্ণ বস্তুটি ঠান্ডা হবে। ফলে দুটোর তাপমাত্রা সমান হয়ে যাবে। এ অবস্থায় পৌঁছার পর আর কোনো তাপ বিনিময় হবে না। পাত্রের ভেতরের সিস্টেম একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছাবে। সর্বোচ্চ এনট্রপির এই সুস্থিত দশাকে তাপগতীয় সাম্যাবস্থা বলে। সিস্টেমটি বিচ্ছিন্ন থাকলে আর কোনো পরিবর্তন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বস্তুগুলোকে কোনোভাবে প্রভাবিত করলে ভিন্ন কথা। যেমন ধরুন, পাত্রের বাইরে থেকে আরও তাপ সরবরাহ করা হলো। সে ক্ষেত্রে তাপীয় ঘটনা আরও ঘটবে এবং এনট্রপির সর্বোচ্চ সীমা আরেকটু বাড়বে।

মহাবিশ্বের পরিবর্তন সম্পর্কে তাপগতিবিদ্যার এ সূত্রগুলোর বক্তব্য কী? সূর্য এবং অধিকাংশ নক্ষত্রের কথা যদি বলি, তাপ নির্গমনের প্রক্রিয়া আরও

বহু বিলিয়ন বছর ধরে চলতে পারে। কিন্তু এর যে শেষ নেই, তা নয়। একটি সাধারণ নক্ষত্রের তাপ উৎপন্ন হয় এর অভ্যন্তরে সংঘটিত নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। পরে আমরা দেখব, সূর্যের জ্বালানি একসময় ফুরিয়ে যাবে এবং সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে একসময় এর তাপমাত্রা এর পার্শ্ববর্তী মহাশূন্যের তাপমাত্রার সমান হয়ে যাবে।

হেরম্যান ভন হেলমহল্টজ অবশ্য নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার কথা জানতেন না। (সূর্য এত বিপুল শক্তি কীভাবে উৎপন্ন করে তা তাঁর সময়ে অজানা ছিল) তবে একটি সার্বিক নীতি তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল। সেটা হলো, মহাবিশ্বের সব ভৌত প্রক্রিয়া একটি চূড়ান্ত তাপগতীয় সাম্যাবস্থা বা সর্বোচ্চ এনট্রপির দিকে এগোচ্ছে। তারপর আর কোনো দিন বলার মতো কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞরা সাম্যাবস্থার দিকের এই একমুখী গতিকে নাম দেন 'তাপীয় মৃত্যু' (heat death)। তবে সবাই মানতেন যে বাইরে থেকে কাজ করে স্বতন্ত্র সিস্টেমকে আবার সক্রিয় করা যেতে পারে। কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারেই মহাবিশ্বের 'বাইরে' কিছুই নেই। ফলে সামগ্রিক সেই তাপীয় মৃত্যু ঠেকানোর মতো কিছুই নেই। অনিবার্য এক পরিণতি।

তাপগতিবিদ্যার সূত্রের কারণে মহাবিশ্ব অপ্রতিরোধ্যভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এ আবিষ্কার বহু প্রজন্মের বিজ্ঞানী ও দার্শনিককে হতাশ করেছে। যেমন বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর *ˆnvqvB AvB AÅvg bU Av wòwøqvb* বইয়ে নিজের বিষণ্ন মনোভাব তুলে ধরতে গিয়ে বলেন,

'যুগের পর যুগ ধরে করে যাওয়া এত সব পরিশ্রম, এত ঐকান্তিকতা, এত সব উৎসাহ-উদ্দীপনা, মানুষের বুদ্ধিমত্তার এত দারুণ সব নিদর্শন সৌরজগতের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাবে, আর মানুষের সব অর্জন অনিবার্যভাবে মহাবিশ্বের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়বে—এ কথাগুলোর সঙ্গে সবাই একমত না হলেও এর বিপক্ষ কোনো দর্শন প্রয়োগ করেও এর থেকে বাঁচার আশা করা যেতে পারে না। শুধু এই সত্যের ওপর ভর করেই, এই কঠিন হতাশার ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই আত্মাকে নিরাপদ করা যেতে পারে।'

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র ও এর মরণোন্মুখ মহাবিশ্ববিষয়ক ফলাফল সম্পর্কে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, মহাবিশ্ব আসলে নিরর্থক জিনিস এবং চূড়ান্তভাবে মানুষের অস্তিত্বও অর্থহীন। এই হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য সম্পর্কে আমি পরের অধ্যায়গুলোতে কথা বলব। এই ধারণা ঠিক কি ভুল, সেটাও আলোচনা করব।

মহাবিশ্বের চূড়ান্ত তাপীয় মৃত্যু যে কেবল ভবিষ্যৎ মহাবিশ্বের কথাই বলছে, তা কিন্তু নয়। অতীতের ওপরও ভূমিকা আছে এর। এটা পরিষ্কার যে

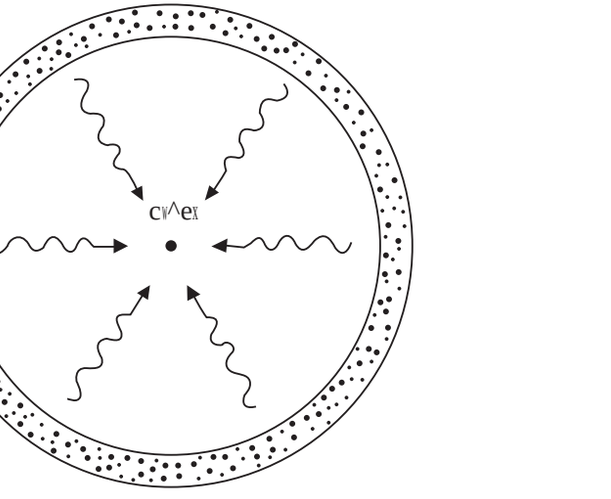

চিত্র ২.২

অলবার্স প্যারাডক্স। মনে করুন, মহাবিশ্ব অপরিবর্তনশীল। নক্ষত্রগুলো নির্দিষ্ট একটি গড় ঘনত্ব নিয়ে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। চিত্রে পৃথিবীর চারদিকের একটি চিকন গোলকীয় খোলসের মধ্যে অবস্থিত নক্ষত্রদের কিছু দেখানো হলো। (খোলসের বাইরের নক্ষত্রগুলোকে চিত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।) এ খোলসের নক্ষত্রগুলো থেকে আসা আলোই পৃথিবীতে পতিত সব নাক্ষত্রিক আলোর জোগান দেয়। একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্র থেকে আসা আলো এর খোলসের ব্যাসার্ধের বর্গ অনুপাতে কমে যায়[২]। আবার, খোলসের ব্যাসার্ধ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রের সংখ্যাও বেড়ে যায় বর্গ অনুপাতেই। ফলে দুটো প্রভাব একে অপরকে বাতিল করে দেয়। তার মানে, খোলসের মোট দীপ্তি[৩] এর ব্যাসার্ধের ওপর নির্ভর করে না। মহাবিশ্ব অসীম হলে এতে এ রকম খোলসের সংখ্যাও অসীম হবে। ফলে পৃথিবীর বুকে এসে পতিত আলোর পরিমাণও অসীম হওয়ার কথা।

মহাবিশ্ব যদি একটি নির্দিষ্ট হারে নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে, তবে এর পক্ষে চিরকাল টিকে থাকা অসম্ভব। কারণটা খুব সোজা। মহাবিশ্বের বয়স যদি অসীম হতো, তবে এত দিনে এর মৃত্যুই হয়ে যেত। যে জিনিস নির্দিষ্ট হারে শেষ হয়ে যেতে থাকে, সেটার পক্ষে চিরকাল টিকে থাকা সম্ভব নয়। অন্য কথায়, অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময় আগে মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে।

একটা বড় বিষয় হলো, উনিশ শতকের বিজ্ঞানীরা এই বড় ফলাফলটি ভালোমতো বুঝতে পারেননি। ১৯২০-এর দশকে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের

মাধ্যমে বোঝা গেল, আকস্মিক এক মহাবিস্ফোরণের (বিগ ব্যাং) মাধ্যমে জন্ম হয়েছে মহাবিশ্বের। তবে দেখা যাচ্ছে, শুধু তাপগতীয় কারণের ওপর ভিত্তি করেই মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরুর বিষয়ে আগে থেকেই দৃঢ় সমর্থন ছিল।

কিন্তু বাস্তবে এমনটা দেখা যায়নি বলে, উনিশ শতকের জ্যোতির্বিদদের মহাবিশ্ববিষয়ক একটি আগ্রহোদ্দীপক প্যারাডক্স হতবুদ্ধিতে ফেলে দেয়। জার্মান জ্যোতির্বিদ অলবার্সের নাম অনুসারে একে অলবার'স প্যারাডক্স বলে ডাকা হয়। তিনিই প্যারাডক্সটির জন্ম দেন। এটি একটি সরল কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। রাতের আকাশ কেন কালো?

প্রথম দৃষ্টিতে একে ছোটখাটো সমস্যা মনে হবে। রাতের আকাশ কালো, কারণ নক্ষত্ররা আমাদের থেকে অনেক অনেক দূরে আছে। তাই এরা অনুজ্জ্বল। (দেখুন চিত্র ২.২) কিন্তু ধরুন, মহাশূন্যের কোনো শেষ নেই। সে ক্ষেত্রে নক্ষত্রের সংখ্যা অসীম হতে তো কোনো বাধা নেই। অসীমসংখ্যক অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো একত্র করলে তো প্রচুর আলো হয়। মহাশূন্যে প্রায় সুষমভাবে (সমান এলাকায় প্রায় সমানসংখ্যক) বিন্যস্ত অসীমসংখ্যক অপরিবর্তনশীল নক্ষত্রের মোট আলোর পরিমাণ সহজেই হিসাব করে বের করা যায়। বিপরীতবর্গীয় সূত্র অনুসারে দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতা কমে আসে। এর মানে হলো, দূরত্ব দ্বিগুণ হলে উজ্জ্বলতা চার ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে। দূরত্ব তিন গুণ হলে উজ্জ্বলতা হবে নয় ভাগের এক ভাগ। এভাবেই চলতে থাকবে। অন্যদিকে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি দেওয়া হবে, নক্ষত্রের সংখ্যা তত বাড়তে থাকবে। এবং সাধারণ জ্যামিতির মাধ্যমেই দেখানো যায়, ১০০ আলোকবর্ষ দূরে যত নক্ষত্র আছে, ২০০ আলোকবর্ষ দূরে তার চার গুণ নক্ষত্র আছে। আবার, ১০০ আলোকবর্ষ দূরে যত নক্ষত্র আছে, ৩০০ আলোকবর্ষ দূরে আছে তার ৯ গুণ নক্ষত্র। তার মানে, দূরত্বের বর্গের সমানুপাতে নক্ষত্রের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, আর উজ্জ্বলতা কমে যাচ্ছে। দুটো প্রভাব একে অপরকে বাতিল করে দিচ্ছে। তার অর্থ হলো, একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত সব নক্ষত্র থেকে মোট কী পরিমাণ আলো আসবে, তা দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। ২০০ আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্ররা যতটুকু আলো দেবে, ১০০ আলোকবর্ষের দূরের নক্ষত্ররাও সেই একই পরিমাণ আলো দেবে।

সমস্যা হয় যখন আমরা সম্ভাব্য সব দূরত্বের সব নক্ষত্রের আলো একত্র করি। মহাবিশ্বের যদি কোনো সীমানা না থাকে, তাহলে তো মনে হয় পৃথিবীতে এসে পড়া আলোর মোট পরিমাণের কোনো সীমা থাকবে না। অন্ধকার হওয়া তো দূরের কথা, রাতের আকাশ তীব্র আলোতে ঝলমল করার কথা।

নক্ষত্রদের সসীম আকারের কথা মাথায় রাখলে সমস্যাটি আরও বড় হয়ে দেখা দেয়। পৃথিবী থেকে কোনো নক্ষত্র যত দূরে থাকবে, এর আপাত-আকারও তত কম হবে। পৃথিবী থেকে দেখতে দুটো নক্ষত্র একই রেখা বরাবর হলে, কাছের কোনো নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত দূরের নক্ষত্রকে এটি আড়াল করে ফেলবে। মহাবিশ্ব অসীম হলে এটা ঘটবে অসীমসংখ্যক বার। এটাকে হিসাবে ধরলে আগের সিদ্ধান্ত কিন্তু পাল্টে যাবে। পৃথিবীতে এসে পৌঁছা আলো অনেক বেশি হবে এটা ঠিক, কিন্তু সেটা অসীম হবে না। পৃথিবী সৌরপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ লাখ মাইল দূরে থাকলে পৃথিবীর আকাশে যে পরিমাণ আলো আসত, এটা প্রায় তার সমান হবে। এ রকম অবস্থান অবশ্যই খুব অস্বস্তিকর হবে। বস্তুত, তীব্র উত্তাপে পৃথিবী নিমেষেই বাষ্পীভূত হয়ে যেত।

অসীম মহাবিশ্ব যে আসলে একটি মহাজাগতিক চুল্লির মতো আচরণ করবে, এ ধারণা নতুন কিছু নয়। এটা আর আগে আলোচিত তাপগতীয় সমস্যা আসলে একই কথা। নক্ষত্ররা মহাশূন্যে তাপ ও আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই বিকিরণ ক্রমেই জমা হচ্ছে মহাশূন্যে। যদি নক্ষত্রগুলো অসীম সময় ধরে জ্বলে, তাহলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বিকিরণের তীব্রতা অসীম হবে। কিন্তু মহাশূন্য দিয়ে সঞ্চালিত হওয়ার সময় কিছু বিকিরণ অন্য নক্ষত্রের ওপর গিয়ে পড়ে পুনঃ শোষিত হবে। (আমরা যে দেখি নিকটবর্তী তারকারা দূরের তারকাদের আলো আড়াল করে রাখে, এটা সেই একই কথা।) ফলে বিকিরণের তীব্রতা বেড়ে চলবে। এটা চলবে একটি সাম্যাবস্থা অর্জিত হওয়া পর্যন্ত। এ অবস্থায় নির্গমন ও শোষণের হার সমান হয়ে যাবে। এই তাপগতীয় সাম্যাবস্থা অর্জিত হবে তখনই, যখন মহাশূন্য বিকিরণের তাপমাত্রা নক্ষত্রের পৃষ্ঠ তাপমাত্রার সমান হয়ে যাবে। এ তাপমাত্রা হলো কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাই সমগ্র মহাবিশ্ব তাপীয় বিকিরণে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত, যার তাপমাত্রা হবে কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং রাতের আকাশ অন্ধকার হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাপমাত্রায় তা জ্বলজ্বল করার কথা।

নিজের প্যারাডক্সের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা হেনরিখ অলবার্স নিজেও করেছিলেন। মহাবিশ্ব বিপুল পরিমাণ ধূলিকণায় ভর্তি। তিনি বললেন, এ পদার্থগুলো নক্ষত্রের বেশির ভাগ আলো শোষণ করে নেয় বলেই (রাতের) আকাশ কালো হয়। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, তাঁর বুদ্ধিটা যথেষ্ট সৃজনশীল হলেও এর মধ্যে ছিল মৌলিক একটি ত্রুটি। ধূলিকণাগুলো শেষ পর্যন্ত উত্তপ্ত হবে এবং জ্বলতে শুরু করবে। যে পরিমাণ বিকিরণ এরা শোষণ করেছিল, ঠিক সে মাত্রার তীব্রতায়ই জ্বলবে এরা।

আরেকটি সম্ভাব্য সমাধান হলো, মহাবিশ্বের আকার অসীম বিবেচনা না করা। মনে করুন, নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও নির্দিষ্ট। তার মানে,

মহাবিশ্বে আছে বিপুল পরিমাণ নক্ষত্র আর অসীম অন্ধকার মহাশূন্য। তাহলে নক্ষত্রের বেশির ভাগ আলোই দূর মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে হারিয়ে যাবে। কিন্তু এই সরল সমাধানেও ছিল মারাত্মক ভুল। সতেরো শতকে আইজ্যাক নিউটনও এ সমস্যার কথা জানতেন। সমস্যাটির সঙ্গে মহাকর্ষ সূত্রের সম্পর্ক আছে। প্রতিটি নক্ষত্রই অন্য নক্ষত্রদের মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে আকর্ষণ করছে। ফলে সব নক্ষত্রই একে অপরের দিকে ধাবিত হবে। শেষ পর্যন্ত এসে জড়ো হবে তাদের মহাকর্ষ কেন্দ্রে। যদি মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও প্রান্ত থাকে, তবে মনে হচ্ছে এটি নিজের ওপরই গুটিয়ে যাবে। একটি অবলম্বনহীন, সসীম ও স্থির মহাবিশ্ব হবে অস্থিতিশীল। মহাকর্ষের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত এটি সংকুচিত হয়ে যাবে।

মহাকর্ষের সমস্যার কথা পরে আরও বলব। এখানে শুধু বলব, নিউটন কী দারুণ উপায়ে এ সমস্যাটি দূর করতে চেয়েছিলেন। নিউটন বললেন, মহাবিশ্বের পক্ষে এর মহাকর্ষ কেন্দ্রের দিকে গুটিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে হলে তো আগে এর মহাকর্ষ কেন্দ্র বলতে কিছু থাকতে হবে। মহাবিশ্বের কেন্দ্র ও প্রান্ত যদি না থাকে, তাহলে একই সঙ্গে দুটো শর্ত পূরণ হতে হয়। মহাবিশ্বকে অসীম হতে হবে এবং নক্ষত্রদের (গড়ে) সুষমভাবে বিন্যস্ত হতে হবে। একটি নক্ষত্র এর প্রতিবেশী নক্ষত্রগুলো দ্বারা সব দিক থেকে আকর্ষণ অনুভব করবে। বিশাল এক দড়ি টানাটানি খেলার মতো, যেখানে দড়ি সব দিকেই টান অনুভব করে। সব দিকের টানগুলো গড়ে একে অপরকে বাতিল করে দেবে। ফলে নক্ষত্রটির কোনো নড়চড় হবে না।

তাই মহাবিশ্বের গুটিয়ে যাওয়ার সমস্যা এড়াতে নিউটনের সমাধান মেনে নিতে গেলে আবারও অসীম মহাবিশ্বের কথা চলে আসে। অলবার্সের প্যারাডক্সও হাজির। দেখা যাচ্ছে, আমাদের যেকোনো একটিকে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু একটু পেছনে ফিরে তাকালে আমরা একটি উপায় খুঁজে পাই। এখানে মহাবিশ্বকে অসীম ধরতে হবে না। ভুল অনুমান এটা নয় যে মহাবিশ্ব স্থানের দিক দিয়ে অসীম, বরং ভুল অনুমান হলো মহাবিশ্ব সময়ের দিক দিয়ে অসীম। জ্বলজ্বলে আকাশের প্যারাডক্স তৈরি হয়েছে, কারণ জ্যোতির্বিদেরা ধরে নিয়েছিলেন, মহাবিশ্ব অপরিবর্তনশীল। ধরে নিয়েছিলেন, নক্ষত্ররা স্থির এবং এদের বিকিরণের তীব্রতায় কখনো ভাটা পড়ে না। কিন্তু এখন আমরা জানি, এ দুটো অনুমানই ভুল ছিল। প্রথমত, মহাবিশ্ব স্থির নয়, বরং প্রসারিত হচ্ছে। একটু পরই এটা আমি ব্যাখ্যা করব। দ্বিতীয়ত, নক্ষত্ররা চিরকাল আলো দিয়ে যেতে পারে না। একসময় এদের জ্বালানি ফুরিয়ে যায়। এখন নক্ষত্ররা জ্বলছে। তার মানে, অতীতের নির্দিষ্ট একটি সময় আগে তাদের জন্ম হয়েছিল।

মহাবিশ্বের বয়স নির্দিষ্ট হলে অলবার্সের প্যারাডক্স সমাধান হয়ে যায়। সেটা কেন হয়, বুঝতে হলে একটি দূরের নক্ষত্রের কথা ভাবুন। আলো চলে নির্দিষ্ট গতিতে (শূন্য মাধ্যমে সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার)। ফলে একটি নক্ষত্র এখন যে অবস্থায় আছে, আমরা সেটা দেখছি না। দেখছি এটি যখন আলো ছেড়েছিল সে সময়কার অবস্থা। যেমন বেটেলজিউস (আর্দ্রা) নক্ষত্রটি আমাদের থেকে ৬৫০ আলোকবর্ষ দূরে আছে। তাই একে আমরা এখন যেমনটা দেখছি, সেটা এর ৬৫০ বছর আগের চেহারা। মনে করুন, মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে ১০ বিলিয়ন বছর আগে। এ ক্ষেত্রে আমরা পৃথিবী থেকে ১০ বিলিয়ন আলোকবর্ষের চেয়ে বেশি দূরের কোনো নক্ষত্র দেখব না। স্থানের হিসাবে মহাবিশ্ব অসীম হতেই পারে। কিন্তু এর বয়স যদি নির্দিষ্ট হয়, তাহলে আমরা কোনোভাবেই একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে দেখতে পাব না। তাই নির্দিষ্ট বয়সের অসীমসংখ্যক নক্ষত্রের মিলিত আলোও নির্দিষ্টই হবে। এবং খুব সম্ভব সেটা হবে অতি নগণ্য।

তাপগতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও একই ফলাফল পাওয়া যায়। মহাশূন্যকে তাপীয় বিকিরণ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়ে একই তাপমাত্রায় নিয়ে আসার জন্য নক্ষত্রদের অসীম সময়ের প্রয়োজন। কারণ, মহাবিশ্বে শূন্য স্থানের পরিমাণ তো বিশাল। তাপগতীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময় মহাবিশ্বের জন্মের পর থেকে এখনো অতিবাহিত হয়নি।

সবকটি প্রমাণ বলছে একটি কথাই। মহাবিশ্বের বয়স নির্দিষ্ট। অতীতের নির্দিষ্ট কোনো সময়ে এর জন্ম হয়েছে। বর্তমানে মহাবিশ্ব খুব সক্রিয় হলেও ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট কোনো দিন অনিবার্যভাবে একে বরণ করতে হবে তাপীয় মৃত্যু। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয় অনেকগুলো প্রশ্ন। কখন ঘটবে শেষ পরিণতি? সেটা কেমন হবে? সেটা কি ধীরে ধীরে হবে, নাকি হঠাৎ করে হবে? এটা ভাবা ঠিক হবে কি না যে তাপীয় মৃত্যু বলতে বিজ্ঞানীরা এখন যা বোঝেন, কোনোভাবে সেটা ভুল হয়ে যাবে?

তথ্যনির্দেশ

১. যে প্রক্রিয়া শুধু একদিকেই চলে, পেছন দিকে ফিরে আসে না, সেটাই অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়া।

২. একে বলে বিপরীত বর্গীয় সূত্র। এর মানে হলো একটি মান দ্বিগুণ হলে অপর মান চার ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে। তিন গুণ হলে হবে নয় ভাগের এক ভাগ।

৩. কোনো বস্তু থেকে নির্গত বিকিরণ শক্তির পরিমাণকে বলে দীপ্তি। আবার একটি বস্তুকে পৃথিবীতে বসে যতটা উজ্জ্বল দেখায় তার নাম আপাত-উজ্জ্বলতা। আপাত-উজ্জ্বলতা দেখে বস্তুর প্রকৃত দীপ্তি বোঝা যায় না। কারণ, বেশি দূরের নক্ষত্র থেকে আসা আলো বিপরীতবর্গীয় সূত্রের কারণে পৃথিবীর কাছে আসতে আসতে ম্লান হয়ে যায়। এ কারণে বাস্তবে বেশি উজ্জ্বল (মানে দীপ্তি বেশি) নক্ষত্রও পৃথিবীর আকাশে কম উজ্জ্বল নক্ষত্রের চেয়ে মৃদু দেখাতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম তিন মিনিট

ইতিহাসবিদদের মতো কসমোলজিস্টরাও জানেন, ভবিষ্যৎ জানতে হলে তাকাতে হয় অতীতের দিকে। আগের অধ্যায়ে আমি ব্যাখ্যা করেছি, কীভাবে তাপগতিবিদ্যার সূত্র মহাবিশ্বের নির্দিষ্ট বয়সের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রায় সব বিজ্ঞানী একমত যে ১০ থেকে ২০ বিলিয়ন বছর আগে একটি বৃহৎ বিস্ফোরণের (বিগ ব্যাং) মাধ্যমে মহাবিশ্বের জন্ম। এবং মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়তি কী হবে, সেটাও ঠিক হয়ে গেছে এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে। মহাবিশ্বের শুরু কী করে হয়েছিল এবং প্রাথমিক দশায় এটি কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, সেটা জেনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির একটি মৌলিক বিশ্বাস হলো, মহাবিশ্বটা সব সময় ছিল না। গ্রিক দার্শনিকেরা চিরন্তন মহাবিশ্বের কথা বললেও পাশ্চাত্যের সব বড় ধর্মই বলেছে, ঈশ্বর অতীতের নির্দিষ্ট কোনো সময়েই মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন।

মহাবিশ্বের আকস্মিক সূচনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অত্যন্ত জোরালো। সবচেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল দূরবর্তী ছায়াপথগুলো থেকে আসা আলোর আচরণ বিশ্লেষণ করে। ১৯২০-এর দশকে আমেরিকান জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, দূরবর্তী ছায়াপথগুলো থেকে আসা আলো নিকটবর্তীদের তুলনায় কিছুটা লাল হয়ে যাচ্ছে। তাঁর আগে ভেস্টো স্লিফার নামের একজন নেবুলা-বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে গিয়েছিলেন। কাজ করতেন অ্যারিজোনার ফ্ল্যাগস্ট্যাফ মানমন্দিরে (observatory)। আর হাবল ব্যবহার করেছিলেন ১০০ ইঞ্চির মাউন্ট উইলসন টেলিস্কোপ। এরপর যত্নের সঙ্গে লাল হয়ে যাওয়ার পরিমাণ পরিমাপ করলেন ও গ্রাফে আঁকলেন। দেখলেন, এখানে একটি নিয়ম কাজ করছে। যে ছায়াপথ আমাদের থেকে যত দূরে আছে, তাকে তত বেশি লাল দেখাচ্ছে।

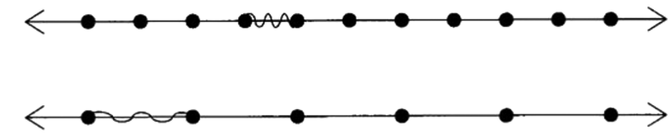

চিত্র ৩.১

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের একটি একমাত্রিক নমুনা। বিন্দুগুলো দ্বারা ছায়াপথপুঞ্জ নির্দেশ করা হচ্ছে। আর স্থিতিস্থাপক সুতা দিয়ে স্থান বোঝানো হয়েছে। সুতাকে লম্বা করা হলে বিন্দুগুলো দূরে সরে যায়। এর ফলে সুতার ওপর দিয়ে চলমান কোনো তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বড় হবে। হাবলের আবিষ্কৃত লোহিত সরণও[১] এভাবেই কাজ করে।

আলোর রং এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাদা আলোর বর্ণালিতে নীল রঙের অবস্থান ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রান্তে, আর লালের অবস্থান হলো লম্বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রান্তে। যেহেতু দূরের ছায়াপথগুলোর আলো লাল হয়ে যাচ্ছে, তার মানে তাদের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কোনোভাবে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। হাবল অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে অনেকগুলো ছায়াপথের বর্ণালির বৈশিষ্ট্যসূচক রেখার অবস্থান চিহ্নিত করে এ আচরণ সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। তিনি বললেন, আলোক তরঙ্গ বড় হয়ে যাওয়ার কারণ হলো মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। অতিগুরুত্বপূর্ণ এ বক্তব্যের মাধ্যমেই হাবল আধুনিক কসমোলজির সূচনা করলেন।

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ধারণা অনেকেই ঠিকভাবে বুঝতে পারেন না। পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয়, দূরের সব ছায়াপথ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আছে। প্রসারণের প্রকৃতি মহাবিশ্বজুড়ে (গড়ে) একই রকম। প্রতিটি ছায়াপথ বা আরও ভালোভাবে বললে প্রতিটি ছায়াপথপুঞ্জ বা স্তবক (cluster of galaxies) একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ চিত্র ভালোভাবে বোঝার জন্য ছায়াপথপুঞ্জগুলো মহাশূন্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে—এভাবে চিন্তা না করে মনে করুন, ছায়াপথপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থান ফুলে উঠছে বা লম্বা হয়ে যাচ্ছে।

স্থান প্রসারিত হচ্ছে—কথাটি বিস্ময়কর শোনাতে পারে। কিন্তু ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশের পর থেকেই বিজ্ঞানীরা এ ধারণার সঙ্গে পরিচিত। এ তত্ত্ব অনুসারে মহাকর্ষ আসলে স্থানের (সঠিক করে বললে স্থানকালের) বক্রতা বা বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ। এক অর্থে স্থান হলো স্থিতিস্থাপক। এটি এর মধ্যে উপস্থিত পদার্থের মহাকর্ষীয় ধর্মের ওপর ভিত্তি করে বেঁকে যেতে বা প্রসারিত হতে পারে। পর্যবেক্ষণ থেকে এ ধারণার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

একটি সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে সম্প্রসারণশীল স্থানের মৌলিক ধারণা বুঝে নেওয়া যায়। মনে করুন, একটি স্থিতিস্থাপক সুতার ওপর অনেকগুলো বিন্দু আছে (দেখুন চিত্র ৩.১)। বিন্দুগুলো দ্বারা ছায়াপথপুঞ্জ নির্দেশ করা হচ্ছে। এবার মনে করুন, আপনি সুতাটিকে দুই প্রান্ত থেকে ধরে টান দিয়ে লম্বা করে ফেললেন। প্রতিটি বিন্দু একে অপরটি থেকে সরে যাচ্ছে। আপনি যে বিন্দুর কথাই চিন্তা করুন না কেন, তার পাশের বিন্দুগুলোকে দূরে সরতে দেখা যাচ্ছে। তার ওপর প্রসারণ সব দিকে একই রকম। কোনো বিশেষ কেন্দ্র বলতে কিছু নেই। অবশ্য আমি এটাকে এখানে যেভাবে এঁকেছি, তাতে একটি বিন্দু কেন্দ্রে আছে। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় এখানে প্রসারণ ঘটছে, তার সঙ্গে এই কেন্দ্রীয় বিন্দুর কোনো সম্পর্ক নেই। বিন্দুসহ সুতাটি যদি অসীম সাইজের হতো অথবা সুতাটি যদি বৃত্তাকার হতো, তবে এই কেন্দ্রটি আর থাকত না।

যেকোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চিন্তা করলে দেখা যায়, তার নিকটতম বিন্দুগুলো পরের নিকট বিন্দুগুলো থেকে অর্ধেক গতিতে দূরে সরছে। এবং তারও পরের নিকট বিন্দুগুলো থেকে আরও অর্ধেক গতিতে সরছে। এভাবেই চলছে। একটি বিন্দু যত দূরে আছে, সেটি তত দ্রুত সরে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রসারণের ক্ষেত্রে দূরে সরে যাওয়া মানে সরণের হার দূরত্বের সমানুপাতিক। সম্পর্কটা বেশ শক্তিশালী। ছবিটি দেখে আমরা সম্প্রসারণশীল স্থানে বিন্দুগুলো, মানে ছায়াপথপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে চলাচলরত আলোক তরঙ্গের কথা কল্পনা করতে পারি। স্থানের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গও প্রসারিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মহাজাগতিক লোহিত সরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হাবল দেখলেন, লোহিত সরণের পরিমাণ দূরত্বের সমানুপাতিক। ঠিক ছবিতে যেমনটা দেখানো হয়েছে সেভাবে।

মহাবিশ্ব যদি সম্প্রসারণশীল হয়েই থাকে, তাহলে অতীতে নিশ্চয়ই এটি আরও জড়সড় ছিল। হাবলের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রসারণের হার পরিমাপ করা যায়। পরবর্তী সময়ে পর্যবেক্ষণের মান আরও অনেক উন্নত হয়। হারও বের করা হয় আরও ভালোভাবে। মহাজাগতিক চিত্রটিকে পেছনের দিকে চালিয়ে দিলে আমরা দেখব, কোনো এক দূর অতীতে সবকটি ছায়াপথ একে অপরের সঙ্গে মিশে ছিল। বর্তমান সময়ের প্রসারণের হার জেনে আমরা অনুমান করতে পারি, এই মিশ্রিত অবস্থা ছিল বহু বিলিয়ন বছর আগে। তবে দুটি কারণে সেই সময়টি সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। প্রথমত, বিভিন্ন কারণে সঠিক করে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। নানাভাবে ভুল হয়েই যায়। অবশ্য আধুনিক টেলিস্কোপের মাধ্যমে আগের চেয়ে বেশিসংখ্যক ছায়াপথ নিয়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এর পরও প্রসারণের হার এখনো অনিশ্চিত। সেটা কমপক্ষে দুই গুণ পর্যন্ত কম-বেশি হতে পারে। এটা এখনো বিতর্কের বড় একটি বিষয়।[২]

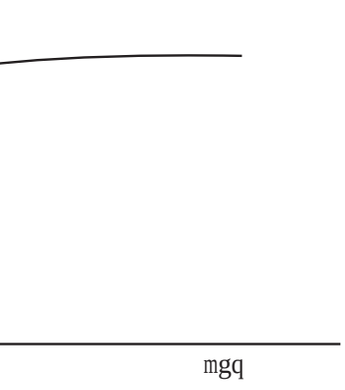

চিত্র ৩.২

চিত্রে যেমনটা দেখানো হলো, অনেকটা সেভাবেই মহাবিশ্বের প্রসারণ হার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ভিত্তিতে কমে আসে। সরল এ নমুনায় সময়ের অক্ষের শূন্য বিন্দুতে প্রসারণ হার অসীম। এ বিন্দুটিই বিগ ব্যাংয়ের সময় নির্দেশ করছে।

দ্বিতীয়ত, মহাবিশ্বের প্রসারণের হার সব সময় একই থাকে না। এর জন্য দায়ী হলো মহাকর্ষ বল। মহাকর্ষ বল ছায়াপথগুলোর মধ্যে তো কাজ করেই, এটা কাজ করে মহাবিশ্বের সব ধরনের পদার্থ এবং শক্তির মধ্যেও। মহাকর্ষ গাড়ির ব্রেকের মতো আচরণ করে। এর কারণে ছায়াপথগুলো বাইরের দিকে ছুটে যেতে বাধা পায়। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রসারণ হার ধীরে ধীরে কমে আসে। তার মানে, অতীতে নিশ্চয়ই মহাবিশ্ব আরও দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল। গ্রাফে যদি সময়ের বিপরীতে মহাবিশ্বের একটি আদর্শ এলাকার আকার দেখানো হয়, তাহলে ৩.২ নম্বর চিত্রের মতো একটি সাধারণ রেখা পাওয়া যায়। গ্রাফে দেখা যাচ্ছে, মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে খুব নিবিড় অবস্থা থেকে। তারপর থেকে প্রসারণ ঘটছে খুব দ্রুত বেগে। এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাবিশ্বের আয়তন যত বেড়েছে, পদার্থের ঘনত্বও নিয়মিত ভিত্তিতে ততই কমে গেছে। রেখাটি ধরে পেছন দিকে এগোতে এগোতে সূচনা পর্যন্ত গেলে (চিত্রের ০ অবস্থানে) দেখা যায়, মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে শূন্য আকার থেকে। আর সে সময় প্রসারণ হার ছিল অসীম। অন্য কথায়, আমরা আজ যেসব ছায়াপথ দেখছি, এগুলো যে পদার্থ দিয়ে তৈরি, সেগুলোর সূচনা হয়েছে তীব্রগতির একটিমাত্র বিন্দু থেকে। তথাকথিত বিগ ব্যাংয়ের এটি একটি আদর্শায়িত বিবরণ।

কিন্তু রেখাটিকে পেছনে শূন্য বিন্দু পর্যন্ত টেনে যাওয়ার চিন্তাটা কতটুকু যৌক্তিক? অনেক কসমোলজিস্ট মনে করেন, কাজটা ঠিকই আছে। যেহেতু আমরা আশাই করছি যে মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে (আগের অধ্যায়ে আলোচিত কারণগুলোর সাহায্যে) অতএব, নিশ্চিতভাবে মনে হচ্ছে সেটা বিগ ব্যাংই হবে। যদি সেটাই হয়, তাহলে রেখার সূচনা বিন্দুটি যেনতেন কোনো বিস্ফোরণ নয়। মনে রাখতে হবে, এখানের গ্রাফটিতে খোদ স্থানেরই প্রসারণ দেখানো হয়েছে। অতএব, শূন্য আয়তনের অর্থ শুধু এটাই নয় যে পদার্থ অসীম ঘনত্বের স্থানে গুটিয়ে আছে। এর আরও অর্থ হলো, স্থান গুটিয়ে আছে শূন্যতার (nothing) মধ্যে। অন্য কথায়, বিগ ব্যাং একই সঙ্গে স্থান এবং পদার্থ ও শক্তির সূচনা। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বুঝতে হবে। এ ধারণা অনুসারে আগে থেকে এমন কোনো শূন্যস্থান ছিল না, যেখানে বিগ ব্যাং ঘটেছিল।

সময় সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। পদার্থের অসীম ঘনত্ব এবং স্থানের অসীম সংকোচন সময়েরও একটি সীমানা বেঁধে দেয়। কারণ, মহাকর্ষ সময় ও স্থান দুটোকেই লম্বা করে দেয়। এটাও আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটি ফলাফল। পরীক্ষামূলকভাবে এর সরাসরি প্রমাণও পাওয়া গেছে। বিগ ব্যাংয়ের পরিবেশ বলছে, স্থানের বিকৃতি ছিল অসীম। ফলে বিগ ব্যাংয়ের আগের সময়ের (এবং স্থানের) ধারণা এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছি যে বিগ ব্যাংই হলো সব ভৌত জিনিস—স্থান, কাল, পদার্থ ও শক্তির চূড়ান্ত সূচনা। 'বিগ ব্যাংয়ের আগে কী ঘটেছিল?' এমন প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই (যদিও অনেকেই প্রশ্নটি করে থাকেন)। অথবা এমন প্রশ্ন—কেনই-বা বিস্ফোরণটি ঘটেছিল? আগে বলতেই কিছু ছিল না। আর যেখানে সময়েরই অস্তিত্ব নেই, সেখানে সাধারণ অর্থে কার্যকারণ বলতেও কিছু থাকে না।

মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে বিগ ব্যাং তত্ত্বের বক্তব্যগুলো অদ্ভুত। তবে বিগ ব্যাংয়ের প্রমাণের জন্য যদি মহাবিশ্বের প্রসারণের ওপরই নির্ভর করা হতো, তাহলে সম্ভবত অনেক কসমোলজিস্টই একে মেনে নিতেন না। কিন্তু ১৯৬৫ সালে তত্ত্বটির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আরও প্রমাণ এল। জানা গেল, পুরো মহাবিশ্ব তাপীয় বিকিরণে পরিপূর্ণ। মহাশূন্য থেকে আসা এ বিকিরণ বিগ ব্যাংয়ের অল্প সময় পরের। আসছে আকাশের সব দিক থেকে একই তীব্রতা নিয়ে। অন্য কিছু দ্বারা এটি বাধাগ্রস্ত হয় না বললেই চলে। ফলে এটি আমাদের সামনে আদিম মহাবিশ্বের অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরছে। এই তাপীয় বিকিরণের বর্ণালির সঙ্গে তাপগতীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছানো একটি চুল্লির উত্তাপের হুবহু মিল রয়েছে। এ ধরনের বিকিরণকে পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ[৩]।

ফলে আমরা বুঝতে পারছি, প্রাথমিক মহাবিশ্ব এমন একটি সাম্যাবস্থায়ই ছিল। সর্বত্র তাপমাত্রা ছিল একই রকম।

এই পটভূমি তাপীয় বিকিরণ পরিমাপ করে জানা গেল, এর তাপমাত্রা হলো পরম শূন্য তাপমাত্রার চেয়ে প্রায় ৩ ডিগ্রি বেশি (পরম শূন্য তাপমাত্রা হলো মাইনাস ২৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে একটি সরল সূত্র মেনে মহাবিশ্ব ঠান্ডা হতে থাকে। ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হলে তাপমাত্রা অর্ধেকে নেমে আসে। এই শীতলীকরণ প্রভাব আর আলোর লোহিত সরণ একই জিনিস। তাপীয় বিকিরণ আর আলো—দুটোই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ দ্বারা গঠিত। এবং মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাপীয় বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বড় হতে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রার চেয়ে নিম্ন তাপমাত্রার বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (গড়ে) অপেক্ষাকৃত বড় হয়। আবার উল্টো করে দেখলে আমরা দেখি, অতীতে মহাবিশ্ব অবশ্যই অনেক বেশি উত্তপ্ত ছিল। এই বিকিরণের সূচনা ঘটেছিল বিগ ব্যাংয়ের তিন লাখ বছর পরে। যে সময় শীতল হতে হতে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা নেমে এসেছিল প্রায় ৩০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই সময়ের আগে মূলত হাইড্রোজেন দিয়ে গঠিত আদিম গ্যাস ছিল আয়নিত প্লাজমা[৪] আকারে। এ কারণে সে সময় এ গ্যাসের ভেতর দিয়ে তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ সঞ্চালিত হতে পারত না। তাপমাত্রা কমলে প্লাজমা সাধারণ (অ-আয়নিত) হাইড্রোজেন গ্যাসে পরণিত হলো। বিকিরণ এর মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হতে পারে। ফলে বিকিরণ এবার মুক্তভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

পটভূমি বিকিরণ একটু আলাদা। সেটা শুধু এর বর্ণালির কৃষ্ণবস্তুর মতো আচরণের জন্যই নয়। আকাশের সব দিকে এটি দারুণভাবে একই রকম। মহাশূন্যের আলাদা দিকে এই বিকিরণের তাপমাত্রার পার্থক্য মাত্র এক লাখ ভাগের এক ভাগ। এটা থেকে বোঝা যায়, বড় মাপকাঠিতে চিন্তা করলে মহাবিশ্ব যোগ্যভাবে সমধর্মী। কারণ, স্থানের কোনো একটি অঞ্চলে বা নির্দিষ্ট কোনো দিকে যদি পদার্থ নিয়মতান্ত্রিকভাবে পুঞ্জীভূত হতো, তাহলে তাপমাত্রার পার্থক্য দেখা যেত। অন্যদিকে আমরা জানি, মহাবিশ্ব পুরোপুরি সুষম নয়। পদার্থ একীভূত হয়ে ছায়াপথ তৈরি হয়ে আছে। বিভিন্ন ছায়াপথ মিলে আবার তৈরি হয় ক্লাস্টার বা স্তবক। এই ক্লাস্টাররা আবার তৈরি করে সুপারক্লাস্টার। বহু মিলিয়ন আলোকবর্ষের মাপকাঠিতে মহাবিশ্বের আকৃতি অনেকটা ফেনার মতো। বিপুল পরিমাণ শূন্যতার মাঝে মাঝে ছায়াপথ তন্তুর উপস্থিতি।

বড় স্কেলে মহাবিশ্বের এই গুচ্ছবদ্ধতা প্রারম্ভিক মসৃণ অবস্থা থেকেই কোনোভাবে জন্ম নিয়েছে। এর পেছনে অনেকগুলো ভৌত কারণ থাকতে

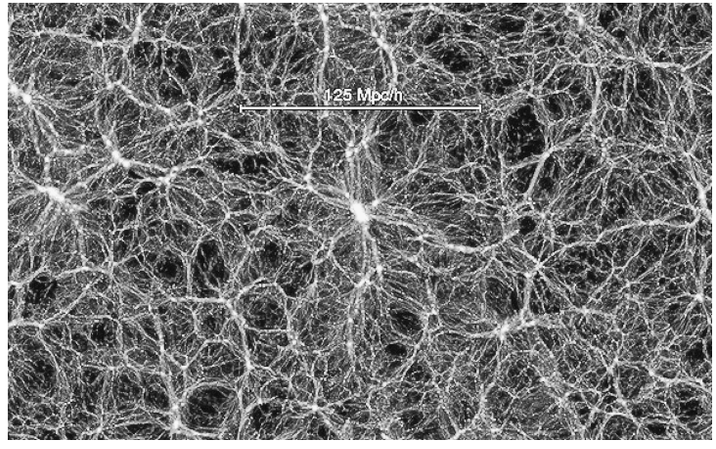

চিত্র : ৩.৩

ছায়াপথ তন্তুর (Galaxy filament) চেহারা বড় মাপকাঠিতে ৩.৩ চিত্রের মতো। এটি হলো মহাবিশ্বের জানা কাঠামোগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। দৈর্ঘ্য হতে পারে ১৬ কোটি থেকে ২৬ কোটি আলোকবর্ষ পর্যন্ত।—অনুবাদক

পারে। তবে সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হলো ধীর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ। বিগ ব্যাং তত্ত্ব সঠিক হয়ে থাকলে গুচ্ছবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ার প্রাথমিক অবস্থার কিছু প্রমাণ মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের মধ্যে থাকার কথা। ১৯৯২ সালে কোব (COBE বা Cosmic Background Explorer) নামে নাসার একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে জানা যায়, বিকিরণ পুরোপুরি মসৃণ নয়। আকাশের এক দিক থেকে আরেক দিকে এতে সুস্পষ্ট ছন্দপতন দেখা যাচ্ছে। অথবা দেখা যাচ্ছে তীব্রতার ওঠানামা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছন্দপতনই সুপারক্লাস্টারদের গঠন প্রক্রিয়ার নির্বিঘ্ন সূচনা করেছিল। এ বিকিরণ আদিম গুচ্ছবদ্ধতার চিহ্ন আস্থার সঙ্গে ধরে রেখেছে। সেটাও আবার বহুকাল ধরে। এর গ্রাফ বলছে, আজ আমরা যে সুশৃঙ্খল স্বতন্ত্র মহাবিশ্ব দেখছি, এটি সব সময় এমন ছিল না। শুরুতে মহাবিশ্ব ছিল প্রায় পুরোপুরি সুষম অবস্থায়। একটি দীর্ঘ ক্রমবিকাশের মাধ্যমে পদার্থ পুঞ্জীভূত হতে হতে পরবর্তী সময়ে ছায়াপথ ও নক্ষত্রের জন্ম হয়।

উত্তপ্ত ঘন অবস্থা থেকে মহাবিশ্বের জন্ম হওয়ার পক্ষে আরেকটি চূড়ান্ত প্রমাণও আছে। আজকের দিনের তাপীয় বিকিরণের তাপমাত্রা জেনে আমরা সহজেই হিসাব করে ফেলতে পারি যে জন্মের প্রায় এক বছর পর মহাবিশ্বের

সবখানে তাপমাত্রা ছিল প্রায় ১ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রা এতটাই বেশি যে এতে যৌগিক পরমাণুর কেন্দ্রের পক্ষেও টিকে থাকা সম্ভব নয়। সেই সময় বস্তু অবশ্যই এর সবচেয়ে মৌলিক উপাদানে বিভক্ত ছিল। ফলে এ সময় প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের মতো মৌলিক[৫] কণিকারা বিচরণ করছিল থরে থরে। কিন্তু তাপমাত্রা একটু কমলে নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটা সম্ভব হলো। বিশেষ করে প্রোটন ও নিউট্রন মুক্তভাবে জোড়ায় জোড়ায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেল। শেষ পর্যন্ত এই জোড়াগুলোই যুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র (নিউক্লিয়াস) গঠন করে। হিসাব করে দেখা গেছে, এই নিউক্লীয় প্রক্রিয়াগুলো চলছিল প্রায় তিন মিনিট ধরে (এর ওপর ভিত্তি করেই স্টিভেন উইনবার্গ বইয়ের নাম দিয়েছিলেন `Å dvÕ| w^ wgwbUm)। এটুকু সময়ের মধ্যে প্রায় চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ পদার্থ হিলিয়ামে পরিণত হয়। এতে করে উপস্থিত সব নিউট্রন কণা শেষ হয়ে যায়। ফলে আর কোনো উপায় না দেখে বাকি সব অযুক্ত প্রোটন হাইড্রোজেন[৬] নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। তার মানে তত্ত্ব বলছে, মহাবিশ্বে প্রায় ৭৫ ভাগ হাইড্রোজেন ও ২৫ ভাগ হিলিয়াম থাকা উচিত। বর্তমান সময়ের হিসাব-নিকাশের সঙ্গে এই বক্তব্যের খুব ভালো মিল পাওয়া গেছে।

আদিম সেই নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় সম্ভবত সামান্য পরিমাণ ডিউটেরিয়াম[৭], হিলিয়াম-৩ এবং লিথিয়ামও তৈরি হয়েছিল। তবে ভারী মৌলগুলো বিগ ব্যাংয়ের সময় তৈরি হয়নি। মহাজাগতিক পদার্থগুলোর মধ্যে এদের পরিমাণ ১ শতাংশেরও কম। এগুলো প্রস্তুত হয়েছিল আরও অনেক পরে। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে। সেটা কীভাবে হয়েছিল, তা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখব।

সব মিলিয়ে মহাবিশ্বের প্রসারণ, মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ এবং রাসায়নিক মৌলের আপেক্ষিক প্রাচুর্য—এই বিষয়গুলো বিগ ব্যাং তত্ত্বের পক্ষে জোরালো প্রমাণ। তবে অনেক প্রশ্নের জবাব এখনো অজানা। যেমন মহাবিশ্ব ঠিক এই হারেই কেন প্রসারিত হচ্ছে? মানে, বিগ ব্যাং কেন এত বিগ (বড়) ছিল? প্রাথমিক মহাবিশ্ব কেন এতটা সুষম (সব দিকে একই রকম) ছিল? এ মহাশূন্যের সব দিকে কেনই-বা প্রসারণ হার এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল? কোব (COBE) যে একটু ব্যতিক্রম ঘনত্বের অঞ্চল খুঁজে পেয়েছে, তারই-বা উৎস কী ছিল? ছায়াপথ ও ছায়াপথগুচ্ছ তৈরিতে কিন্তু এটুকু ব্যতিক্রমের খুব দরকার ছিল।

এই বড় ধাঁধাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বড় বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উচ্চশক্তির কণাপদার্থবিদ্যার সঙ্গে বিগ ব্যাং তত্ত্বকে একীভূত করা হচ্ছে। একটা বিষয় আগেই বলে রাখি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই 'নতুন কসমোলজি' কিন্তু আগে আলোচিত বিষয়গুলোর চেয়ে একটু কম

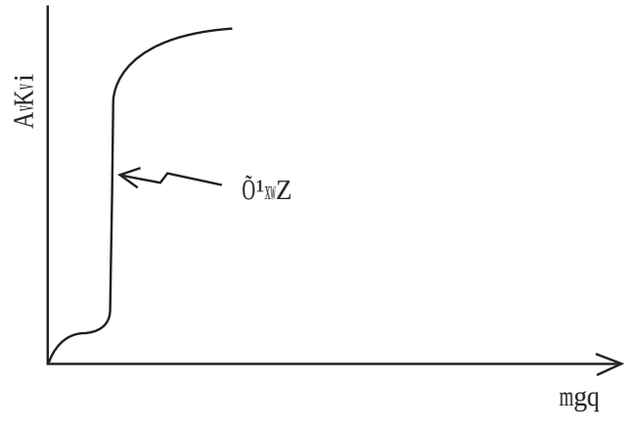

চিত্র ৩.৪

স্ফীতির স্বরূপ। একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে শুরু হওয়ার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহাবিশ্ব হঠাৎ করে বিশাল বড় হয়ে যায়। উলম্ব অক্ষটিকে খুব বেশি সংকুচিত করে দেখানো হয়েছে। স্ফীতি দশার পরে প্রসারণের হার ক্রমেই কমতে থাকে। ৩.২ চিত্রের মতোই।

নির্ভরযোগ্য। বিশেষ করে কণিকার যে পরিমাণ শক্তি প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিতে সংঘটিত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব আমরা। আর এই প্রক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয়েছিল মহাবিশ্বের জন্মের পরের সেকেন্ডের অতিক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে। সেই সময়ের অবস্থা সম্ভবত এতটাই চরম ছিল যে বর্তমানে গাণিতিক নমুনা (model) ছাড়া আমাদের হাতে কিছুই নেই। এই নমুনার ভিত্তি নিছকই তাত্ত্বিক কিছু ধারণা।

এই নতুন কসমোলজির একটি অনুমান হলো ইনফ্লেশন বা স্ফীতি (inflation) নামের একটি প্রক্রিয়া। এটির মূল বক্তব্য হলো, এক সেকেন্ডের প্রথম ভগ্নাংশের কোনো এক সময়ের মধ্যে মহাবিশ্ব হঠাৎ করে বড় হয়ে বিশাল আকার ধারণ করে। বিষয়টি বুঝতে হলে ৩.২ চিত্রটি আবার দেখুন। রেখাটি সব সময় নিচের দিকেই বেঁকে আসে। তার মানে, স্থানের আকার বড় হতে থাকলেও তা হয় ক্রমেই আগের চেয়ে অল্প হারে। অন্যদিকে, স্ফীতির সময় প্রসারণ ঘটেছিল ক্রমেই আগের চেয়ে দ্রুত বেগে। অবস্থাটি দেখানো হয়েছে ৩.৪ নম্বর চিত্রে (সঠিক মাপকাঠিতে নয়)। প্রথমে প্রসারণ থামছিল, কিন্তু স্ফীতি শুরু হতে হতে এটি দ্রুত বেড়ে যায়। কিছু সময়ের জন্য রেখাটি ওপরের দিকে ছুটতে থাকে। শেষে রেখাটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে

আসে। কিন্তু এর মধ্যেই স্থানের আকার ৩.২ চিত্রের অবস্থানের তুলনায় অনেক অনেক বড় হয়ে যায় (এখানে যা দেখানো হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি)।

কিন্তু মহাবিশ্বের আচরণ কেন এমন হলো? এখানে মাথায় রাখতে হবে যে রেখার নিচের দিকের গতিটার পেছনে দায়ী হলো মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল। এটি প্রসারণকে থামিয়ে দিতে চায়। ফলে ওপরের দিকে গতিকে একধরনের অ্যান্টিগ্র্যাভিটি বা বিপরীত মহাকর্ষ তথা বিকর্ষণ বলের প্রভাব ধরে নেওয়া যেতে পারে। যার ফলে মহাবিশ্বের আকার ক্রমেই বড় হচ্ছে। বিপরীত মহাকর্ষের ধারণাকে খুব অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু অনুমাননির্ভর তত্ত্বের মতে, একেবারে প্রাথমিক মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ও ঘনত্বের চরম অবস্থায় এমন কিছু ঘটে থাকতেও পারে।

সেটা কীভাবে, তা বলার আগে আমি বলতে চাই কীভাবে স্ফীতি তত্ত্ব উল্লিখিত কিছু মহাজাগতিক ধাঁধার সমাধান করতে পারে। প্রথমত, ক্রমেই দ্রুত হারের প্রসারণ থেকে বিগ ব্যাং কেন এত বড় ছিল, তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অ্যান্টিগ্র্যাভিটি প্রভাবটি বেশ অস্থিতিশীল ও তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া। তার মানে, মহাবিশ্বের আকার বড় হয় সূচকীয় হারে (exponentially)। গাণিতিকভাবে বললে এ কথার মানে দাঁড়ায়, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থানের আকার দ্বিগুণ হয়। ধরা যাক, সময়টির নাম একটি টিক। তাহলে দুটি টিকের পরে সাইজ হবে চার গুণ। তিন টিকের পরে আট গুণ। দশ টিকের পরে স্থানটি প্রসারিত হবে ১০ হাজার গুণেরও বেশি। হিসাব করে দেখা গেছে, স্ফীতি যুগ-পরবর্তী প্রসারণ হার বর্তমান সময়ে পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত প্রসারণ হারের সঙ্গে মিলে গেছে। (এটা দ্বারা আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছি, তা আমি ষষ্ঠ অধ্যায়ে সবিস্তার বলব)

স্ফীতির কারণে আকার বেড়ে যাওয়া থেকে মহাবিশ্বের সুষম হওয়ার পেছনের কারণটাও সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। স্থানের প্রসারণের কারণে প্রাথমিক যেকোনো বিষমতা উধাও হয়ে যাবে। বেলুনকে ফুলিয়ে বড় করলে যেভাবে এর ভাঁজগুলো উধাও হয়ে যায়, সেভাবেই। একইভাবে, প্রাথমিক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রসারণের যে ভিন্নতা ছিল, তা-ও স্ফীতির প্রভাবে কিছু সময় পরে মিলিয়ে যায়। কারণ, স্ফীতি সব দিকে সমান তেজে কাজ করে। তাহলে কোব যে সামান্য বিষমতা পেল, তার ব্যাখ্যা কী? এর কারণ সম্ভবত স্ফীতি একই সময়ে সব জায়গায় থামেনি (এর কারণও একটু পরে বলছি)। ফলে কিছু অঞ্চল অন্য অঞ্চলের চেয়ে একটু বেশি ফুলে-ফেঁপে গিয়েছিল। ফলে ঘনত্বেও হয়ে গিয়েছিল কিছু তারতম্য।

এবার কিছু সংখ্যা নিয়ে কথা বলি। স্ফীতি তত্ত্বের সবচেয়ে সরল রূপটিতে স্ফীতির (অ্যান্টিগ্র্যাভিটি) শক্তি খুব বেশি শক্তিশালী, যা মহাবিশ্বকে এক

সেকেন্ডের প্রায় ১০ লাখ কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের ১ ভাগ সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ বড় করে ফেলে। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই সময়কেই আমি একটু আগে এক টিক বলেছিলাম। মাত্র ১০০টি টিকের পরই একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের আকারের স্থান ফুলে-ফেঁপে গিয়ে এক লাখ আলোকবর্ষ চওড়া অঞ্চল হয়ে যায়। আগে বলে আসা মহাজাগতিক রহস্যের ব্যাখ্যায় এটা পুরোপুরি যথেষ্ট।

অতিপারমাণবিক কণাপদার্থবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের সাহায্যে স্ফীতির উদ্রেককারী অনেকগুলো সম্ভাব্য প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। সব প্রক্রিয়াই কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম নামে একটি ধারণার ওপর নির্ভরশীল। এটা বুঝতে হলে আগে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে কিছু কথা জেনে আসতে হবে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূচনা ঘটেছিল আলো, তাপ ইত্যাদি তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের ধর্ম সম্পর্কে একটি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এই বিকিরণ স্থানের ভেতর দিয়ে তরঙ্গ আকারে চললেও এটি আবার এমনভাবেও আচরণ করতে পারে, যাতে মনে হয় এটি আসলে কণা দিয়ে গঠিত। আলোর নির্গমন ও শোষণ ঘটে শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেট বা গুচ্ছ (কোয়ান্টা) আকারে। এই গুচ্ছগুলোর নাম ফোটন। তরঙ্গ ও কণাময় আচরণের এই সমাবেশ পারমাণবিক ও অতিপারমাণবিক জগতের সব বস্তুর ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ফলে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি যেসব সত্তাকে সাধরণভাবে কণা মনে করা হয়, তাদের সবাই-ই, এমনকি পুরো পরমাণুও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তরঙ্গের মতো আচরণ করতে পারে।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি প্রধান অংশ হলো ওয়ার্নার হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি। এটি অনুসারে কোয়ান্টাম বস্তুদের সব বৈশিষ্ট্যের জন্য সুসংজ্ঞায়িত মান থাকবে না। যেমন একটি ইলেকট্রনের একই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান ও নির্দিষ্ট ভরবেগ থাকতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে এর শক্তির মানও নির্দিষ্ট থাকতে পারে না। এখানে কাজ করে শক্তির মানের অনিশ্চয়তা। আমাদের চিরচেনা বড় জগতে তো শক্তি সব সময় সংরক্ষিত[৮] থাকে (এর সৃষ্টি বা বিনাশ নেই)। কিন্তু কোয়ান্টাম-জগতে নীতিটিকে স্থগিত করে রাখা যায়। এক মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্ত ও অননুমেয়ভাবে শক্তির পরিমাণ বদলে যেতে পারে। যত অল্প সময় বিবেচনা করা হবে, এই দৈব কোয়ান্টাম বিষমতাও তত বেশি হবে। সত্যি বলতে, কণাটি শূন্য থেকেই শক্তি ধার করতে পারে, যদি কিনা আবার খুব দ্রুতই সেই শক্তি পরিশোধ করে দেওয়া হয়। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতির সূক্ষ্ম গাণিতিক ভাষ্যমতে, বড় আকারে ধার করা শক্তি দ্রুত ফিরিয়ে দিতে হয়। আর ছোট ঋণের মেয়াদ হয় বেশি।

শক্তির এই অনিশ্চয়তা থেকে কিছু দারুণ ফলাফল বেরিয়ে আসে। এমনও সম্ভাবনা আছে, হঠাৎ করে শূন্য থেকে ফোটনের মতো একটি কণা তৈরি হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল খানিক পরেই। এই কণাগুলোর অস্তিত্ব টিকে থাকে ধার

করা শক্তির ওপর নির্ভর করে। এবং সেই কারণে এই অস্তিত্ব নির্ভর করে সময়ের ওপরও। আমরা এদের দেখি না, কারণ এরা হয় খুবই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আমরা যাকে শূন্য স্থান বলে মনে করি, সেটা আসলে এ ধরনের ক্ষণস্থায়ী কণায় পরিপূর্ণ। শুধু ফোটনই নয়, এমন কণার মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও অন্য সবাই। আমাদের পরিচিত ও স্থায়ী কণাগুলো থেকে আলাদা করার জন্য এই ক্ষণস্থায়ী কণাদের বলা হয় ভার্চ্যুয়াল কণা। স্থায়ীদের নাম যেখানে বাস্তব কণা।

অস্থায়িত্বের কথা বাদ দিলে ভার্চ্যুয়াল কণার সঙ্গে বাস্তব কণার কোনো পার্থক্য নেই। এবং বাইরে থেকে শক্তি সরবরাহ করে হাইজেনবার্গ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করলে ভার্চ্যুয়াল কণাদের বাস্তব কণায়ও রূপান্তরিত করা সম্ভব। এবং সত্যি বলতে, একে তখন একই ধরনের অন্য বাস্তব কণা থেকে আলাদা করে চেনাও সম্ভব নয়। যেমন একটি ভার্চ্যুয়াল ইলেকট্রন সাধারণত মাত্র ১০-২১ সেকেন্ড সময় স্থায়ী হয়। স্বল্পায়ুর জীবনে এটি কিন্তু স্থির বসে থাকে না। বিনাশ হওয়ার আগে আগে অতিক্রম করে ফেলতে পারে ১০-১১ সেন্টিমিটার পথ (যেখানে একটি পরমাণু ১০-৮ সেন্টিমিটার চওড়া)। এই সময়ের মধ্যেই যদি ভার্চ্যুয়াল ইলেকট্রনটি কোথাও থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে (যেমন ধরুন তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র থেকে), তাহলে আর একে বিলুপ্ত হতে হবে না। এটি তখন বিলকুল স্বাভাবিক ইলেকট্রন হিসেবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে।

আমরা এই ভার্চ্যুয়াল কণাদের দেখতে না পেলেও জানি যে শূন্যস্থানে এদের অস্তিত্ব আছে। কারণ, এদের শনাক্তযোগ্য লক্ষণ এরা রেখে যায়। যেমন ভার্চ্যুয়াল ফোটনের একটি প্রভাব হলো, এটি পরমাণুর শক্তিস্তরে[৯] শক্তির সামান্য পরিবর্তন তৈরি করে। এ ছাড়া ইলেকট্রনের চৌম্বক ভ্রামকেও সমান পরিমাণ পরিবর্তন ঘটায়। বর্ণালিবীক্ষণ পদ্ধতিতে ইতিমধ্যেই এই ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা হয়েছে।

কিন্তু আরেকটি বিষয় এড়িয়ে গেলে ভুল হয়ে যাবে। কারণ হলো, অতিপারমাণবিক কণিকারা কিন্তু মুক্তভাবে চলাচল করে না। এটা নির্ভর করে অনেকগুলো বলের ওপর। কোন প্রকার বল কাজ করবে, সেটা নির্ভর করবে কণার প্রকৃতির ওপর। এ বলের প্রভাবে কিন্তু ওপরে দেওয়া কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের সরল চিত্রটি একদম পাল্টে যায়। এই বল কণাদের নিজ নিজ ভার্চ্যুয়াল কণাদের মধ্যেও কাজ করে। অতএব, হতে পারে একের বেশি ধরনের ভ্যাকুয়াম অবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে। একাধিক সম্ভাব্য কোয়ান্টাম অবস্থার (স্টেট) অস্তিত্ব কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার একটি পরিচিত দিক। এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হলো পরমাণুর বিভিন্ন শক্তিস্তর। পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রন শুধু নির্দিষ্ট শক্তির কিছু সুসংজ্ঞায়িত অবস্থাতেই অস্তিত্ববান থাকতে পারে। সবচেয়ে নিচের স্তরের নাম গ্রাউন্ড

স্টেট। এটা স্থিতিশীল অবস্থা। উচ্চতর অবস্থাগুলো উত্তেজিত ও অস্থিতিশীল। কোনো ইলেকট্রন উচ্চতর অবস্থায় চলে গেলে এটি এক বা একাধিক ধাপে পুনরায় নিচের স্তরে অবস্থিত গ্রাউন্ড স্টেটে চলে আসবে। সুসংজ্ঞায়িত অর্ধায়ু (half life) বিশিষ্ট উত্তেজিত অবস্থা এভাবেই ক্ষয় হতে থাকে।

ভ্যাকুয়ামের ক্ষেত্রেও একই নীতি কাজ করে। এতে এক বা একাধিক উত্তেজিত অবস্থা থাকতে পারে। এই স্টেটগুলোর শক্তির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। অবশ্য তাদের দেখতে একই রকম দেখাবে। আর যা-ই হোক, সবই তো খালি! সর্বনিম্ন শক্তিস্তর বা গ্রাউন্ড স্টেটকে অনেক সময় বলা হয় প্রকৃত ভ্যাকুয়াম। কারণ, এটাই হলো স্থিতিশীল অবস্থা। এবং এটিই আমাদের বর্তমানের দেখা মহাবিশ্বের শূন্যস্থান হিসেবে কাজ করে। উত্তেজিত ভ্যাকুয়ামকে বলা হয় নকল ভ্যাকুয়াম।

তবে বলে রাখা ভালো, নকল ভ্যাকুয়াম এখন পর্যন্ত নিছকই তাত্ত্বিক একটি ধারণা। এবং এদের বৈশিষ্ট্যও মূলত নির্ভর করে কোন তত্ত্ব দিয়ে এদের বিচার করা হচ্ছে, তার ওপর। তবে সাম্প্রতিক তত্ত্বগুলোতে এদের ধারণা সহজাতভাবেই চলে আসে। এ তত্ত্বগুলোর লক্ষ্য হলো প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলকে একীভূত করা। বলগুলো হলো মহাকর্ষ, আমাদের পরিচিত তড়িৎ-চুম্বকীয় বল এবং স্বল্পপাল্লার দুটি নিউক্লীয় বল, যারা দুর্বল ও সবল বল হিসেবে পরিচিতি। একসময় অবশ্য তালিকাটা আরও লম্বা ছিল। তড়িৎ ও চৌম্বক বলকে একসময় আলাদা ভাবা হতো। একীভূত করার কাজ শুরু হয় উনিশ শতকের শুরুর দিকে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে এ কাজে ভালো অগ্রগতি হয়েছে। এখন জানা হয়ে গেছে যে তড়িৎ-চুম্বকীয় এবং দুর্বল নিউক্লীয় বল একই সুতোয় গাঁথা। একে এক কথায় বলা হচ্ছে তড়িৎ-দুর্বল বল (electroweak force)। বহু পদার্থবিদ বিশ্বাস করেন, সবল বলও তড়িৎ-দুর্বল বলের সঙ্গে মিলে যাবে। এমন মিল তৈরিতে সক্ষম তত্ত্বগুলোকে বলা হয় গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি। এটা হওয়া খুব সম্ভব যে গভীর কোনো পর্যায়ে সব ফোর্স বা বল একটিমাত্র সুপারফোর্সে এসে মিলিত হবে।

স্ফীতি প্রক্রিয়ার সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যাগুলো পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি থেকেই। এ তত্ত্বগুলোর একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো, নকল ভ্যাকুয়াম স্টেটের শক্তি অনেক বেশি। মাত্র ১ ঘনমিটার স্থানের শক্তি $১০^{৮৭}$ জল[১০] এমন অবস্থায় পরমাণুর মতো ছোট্ট আয়তনের জায়গায়ও $১০^{৬২}$ জুল শক্তি থাকবে, যেখানে একটি উত্তেজিত পরমাণুর শক্তি মাত্র $১০^{-১৮}$ জুল। এর ফলে প্রকৃত ভ্যাকুয়ামকে উত্তেজিত হতে অনেক অনেক বেশি শক্তি প্রয়োজন। এবং বর্তমান মহাবিশ্বে নকল ভ্যাকুয়ামের দেখা পাওয়ার আশাও নেই। তবে বিগ ব্যাংয়ের মতো চরম অবস্থায় বিষয়গুলো সম্ভব।

নকল ভ্যাকুয়াম স্টেটে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি থাকে, তার থাকে তীব্র মহাকর্ষীয় প্রভাবও। কারণ, আইনস্টাইন আমাদের দেখিয়েছেন, শক্তিরও ভর আছে। ফলে সাধারণ বস্তুর মতো এরও মহাকর্ষীয় আকর্ষণ থাকবে। কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের তীব্র শক্তি খুব তীব্র আকর্ষণধর্মী। ১ ঘনমিটার নকল ভ্যাকুয়ামের শক্তি $১০^{৬৭}$ টন ভরের সমান। পর্যবেক্ষণযোগ্য পুরো মহাবিশ্বের ভর আরও কম ($১০^{৫০}$ টন)। এই তীব্র মহাকর্ষ স্ফীতির পক্ষে কথা বলে না। স্ফীতির জন্য দরকার কোনো রকম একটি অ্যান্টিগ্র্যাভিটি। কিন্তু নকল ভ্যাকুয়ামের বিশাল শক্তির জন্য দরকার একই রকম বিশাল পরিমাণ নকল ভ্যাকুয়াম চাপ (false-vacuum pressure)। এই চাপটাই কিন্তু আসল বিষয়। আমরা সাধারণত চাপকে মহাকর্ষের উৎস মনে করি না। কিন্তু আসলে সেটি উৎস হিসেবে কাজ করে। বাইরের দিকে যান্ত্রিক বল প্রয়োগ করলেও চাপ আবার ভেতরের দিকেও মহাকর্ষীয় টান তৈরি করে। আমাদের সদা পরিচিত বস্তুদের ক্ষেত্রে তার ভরের তুলনায় চাপের মহাকর্ষীয় প্রভাব খুব নগণ্য। যেমন পৃথিবীতে আপনার ওজনের ১০০ কোটি ভাগের ১ ভাগেরও কমের পেছনে দায়ী হলো পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ চাপ। তবু এটা কিন্তু বাস্তব। এবং কোনো সিস্টেমে চাপ অত্যধিক হলে ভরজনিত মহাকর্ষীয় প্রভাবের চেয়েও এটি বেশি করে অনুভূত হবে।

নকল ভ্যাকুয়ামের ক্ষেত্রে শক্তি[১১] যেমন বিশাল, তেমনি বিশাল তার চাপ। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চাপ এখানে ঋণাত্মক। ফলে নকল ভ্যাকুয়াম ধাক্কা দেয় না, বরং টানে। ঋণাত্মক চাপ তৈরি করে ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় টান। মানে অ্যান্টিগ্র্যাভিটি। ফলে নকল ভ্যাকুয়ামের মহাকর্ষ নিয়ে শক্তির আকর্ষণধর্মী ও চাপের বিকর্ষণধর্মী প্রভাবের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। জিত হয় চাপেরই। এবং বিকর্ষণের নিট প্রভাব এত বেশি যে এটি মুহূর্তের মধ্যে মহাবিশ্বকে উড়িয়ে দিতে পারে। স্ফীতির এমন তীব্র ধাক্কার ফলেই মহাবিশ্ব প্রতি $১০^{-৩৪}$ সেকেন্ডের মতো ক্ষুদ্র সময়ে প্রচণ্ড গতিতে দ্বিগুণ বড় হয়েছিল।

নকল ভ্যাকুয়াম সহজাতভাবে অস্থিতিশীল। সব উত্তেজিত কোয়ান্টাম স্টেটের মতো এটিও ক্ষয় হয়ে গ্রাউন্ড স্টেটে, মানে প্রকৃত ভ্যাকুয়ামে আসতে চায়। সম্ভবত কয়েক ডজন 'টিক' পার হলে এটি এটা করতে সক্ষম হয়। কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া হওয়ার কারণে এর মধ্যে অনিবার্যভাবে কাজ করে অনিশ্চয়তা ও দৈব পরিবর্তন, যেটা একটু আগে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির কথা বলতে গিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার মানে, স্থানের সব দিকে ক্ষয় একই হারে ঘটবে না। বিভিন্ন দিকে তা হবে আলাদাভাবে। কিছু কিছু তাত্ত্বিকের মতে, কোব (COBE) যে ব্যতিক্রম খুঁজে পেয়েছে, তার কারণ এই ভিন্নতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নকল ভ্যাকুয়াম ক্ষয় হয়ে গেলে মহাবিশ্ব তার স্বাভাবিক প্রসারণ শুরু করল। মানে ধীরে ধীরে কমল প্রসারণের হার। নকল ভ্যাকুয়ামে আবদ্ধ শক্তি অবমুক্ত হলো। এটা বের হলো তাপ আকারে। স্ফীতির কারণে যে বিশাল প্রসারণ ঘটল, তাতে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা পরম শূন্যের খুব কাছাকাছি হলো। হঠাৎ স্ফীতি থেমে যাওয়ায় তাপমাত্রা আবার বেড়ে $১০^{২৮}$ ডিগ্রি হয়ে গেল। এই বিপুল তাপ আজও রয়ে গেছে। অবশ্য সেটার তীব্রতা অনেক কমে গেছে। এরই নাম মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণ। ভ্যাকুয়াম এনার্জি অবমুক্ত হওয়ার পাশাপাশি আরেকটি ঘটনাও ঘটল। কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের অনেকগুলো কণা এ থেকে কিছু শক্তি গ্রহণ করে বাস্তব কণায় উন্নীত হলো। আরও কিছু প্রক্রিয়া ও পরিবর্তন শেষে এই আদিম কণাগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে $১০^{৫০}$ টন পদার্থ তৈরি হলো। এই পদার্থ থেকেই আপনি, আমি, ছায়াপথ ও মহাবিশ্বের বাকিটার সৃষ্টি।

বড় বড় অনেক কসমোলজিস্টই মনে করেন, স্ফীতির ধারণাই মহাবিশ্বের ইতিহাসের সত্যিকার চিত্র প্রদান করে। যদি এটি আসলেই সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে মহাবিশ্বের মৌলিক কাঠামো এবং ভৌত উপাদানগুলো কেমন হবে, তা ঠিক হয়ে গিয়েছিল জন্মের মাত্র $১০^{-৩২}$ সেকেন্ড পরই। স্ফীতির পর মহাবিশ্বের অতিপারমাণবিক স্তরে ঘটেছিল আরও নানান পরিবর্তন। প্রাথমিক পদার্থ থেকে তৈরি হলো কণা ও পরমাণু। আমাদের সময়ের মহাজাগতিক বস্তুগুলো এদের দিয়েই গড়া। তবে পদার্থের অধিকাংশ বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছিল মাত্র প্রায় তিন মিনিটের মধ্যে।

প্রথম তিন মিনিটের সঙ্গে শেষ তিন মিনিটের সম্পর্ক কী? একটি বুলেটের ভাগ্য যেমন এর লক্ষ্যমাত্রার ওপর খুব বেশি নির্ভর করে, তেমনি মহাবিশ্বের পরিণতিও এর প্রাথমিক অবস্থার ওপর দারুণভাবে নির্ভরশীল। আমরা সামনে দেখব, প্রাথমিক সূচনা থেকে মহাবিশ্বের প্রসারণ ও বিগ ব্যাং থেকে উদ্ভূত পদার্থের প্রকৃতি মহাবিশ্বের চূড়ান্ত ভবিষ্যৎকে কীভাবে প্রভাবিত করে। মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ একই সুতোয় গেঁথে আছে শক্তভাবে।

তথ্যনির্দেশ

১. কোনো বস্তু দূরে সরে গেলে সেটি থেকে আসা আলোর রং লাল হয়ে যাওয়াকেই লোহিত সরণ বলে। প্রতিটি রঙের আলোর নির্দিষ্ট পাল্লার তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকে। বস্তু দূরে সরে গেলে আসা আলোর কম্পাঙ্ক কমে যায় ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। আর দৃশ্যমান আলোগুলোর মধ্যে লালের

তরঙ্গদৈর্ঘ্যই সবচেয়ে বড়। তাই দূরে যাওয়া বস্তুকে লাল দেখায়। এরই নাম লোহিত সরণ।

২. সর্বশেষ হিসাবমতে, মহাবিশ্বের প্রসারণ হার প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মেগাপারসেকে ৭৪ কিলোমিটার। এক পারসেক হলো ৩.৩ আলোকবর্ষের সমান। আর মেগাপারসেক পারসেকের ১০ লাখ গুণ। অতএব প্রসারণের হারটির অর্থ হলো আমাদের থেকে প্রতি ৩.৩ মেগাপারসেক বা ৩৩ লাখ আলোকবর্ষ দূরের একটি ছায়াপথকে আমরা প্রতি সেকেন্ডে ৭৪ কিলোমিটারের বেশি জোরে সরতে দেখব।

৩. যে বস্তু তার ওপর আসা সব বিকিরণ শোষণ করে নেয়, তাকে কৃষ্ণবস্তু বলে। অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করার জন্য নিছক একটি তাত্ত্বিক নমুনা এটি। প্রকৃতিতে নিখুঁত কৃষ্ণবস্তুর অস্তিত্ব নেই।

৪. পদার্থবিজ্ঞানে প্লাজমাকে বলা হয় পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। এ অবস্থায় গ্যাস থাকে আয়নিত অবস্থায়। মানে পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে না। এ অবস্থায় পদার্থ খুব তড়িৎ সুপরিবাহী হয়। এবং সে কারণে তড়িৎ ও চুম্বকীয় আচরণের প্রাধান্য থাকে।

৫. প্রোটন ও নিউট্রন অবশ্য ঠিক মৌলিক কণিকা নয়, গঠিত কোয়ার্ক দিয়ে।

৬. হাইড্রোজেনের সবচেয়ে সরল রূপটিতে একটিমাত্র প্রোটন থাকে। কোনো নিউট্রন থাকে না।

৭. ২টি প্রোটনসংবলিত হাইড্রোজনের আরেকটি রূপ ডিউটেরিয়াম।

৮. শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট। শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। একে কেবল এক রূপ থেকে অন্য এক বা একাধিক রূপে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

৯. মানে পরমাণুর কক্ষপথে। সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে পরমাণুর কেন্দ্রীয় অবস্থানের নিউক্লিয়াসের চারদিকের বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো বণ্টিত থাকে।

১০. একটি আপেলকে ১ মিটার উচ্চতায় তুললে মোটামুটি ১ জুল পরিমাণ শক্তি খরচ হয়। অন্যভাবে বললে, ১০০ জুল শক্তি দিয়ে ২০ ওয়াটের একটি বাতি ৫ সেকেন্ড চালানো যায়। এবার চিন্তা করুন তাহলে $১০^{৮৭}$ জুল কত বিশাল।

১১. এখানে মনে রাখতে হবে, শক্তি কিন্তু ভরেরই আরেক রূপ। তাই শক্তিরও মহাকর্ষীয় টান থাকবে।

চতুর্থ অধ্যায়

নক্ষত্রের মৃত্যু

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৩ কি ২৪ তারিখ রাতের কথা। কানাডিয়ান জ্যোতির্বিদ ইয়ান শেলটন কাজ করছিলেন লাস ক্যাম্পানাস পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে। জায়গাটা চিলির আন্দিজের চূড়ায়। একজন নৈশ সহকারী কিছু সময়ের জন্য বাইরে এলেন। অলস চোখে তাকালেন আকাশের দিকে। রাতের আকাশ তাঁর নখদর্পণে। ফলে অস্বাভাবিক দৃশ্যটা চোখে পড়তে সময় লাগল না। লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউড গ্যালাক্সির নীহারিকার দাগের প্রান্তে একটি নতুন নক্ষত্র। উজ্জ্বলতা অত বেশি নয়। কালপুরুষের কোমরবন্ধের (Orion belt) তারকাগুলোর কাছাকাছি উজ্জ্বল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আগের দিন নক্ষত্রটা ওখানটায় ছিল না।

সহকারী সাহেব ব্যাপারটা শেলটনকে বললেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। শেলটন আর তাঁর চিলীয় সহকারী একটি সুপারনোভা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ১৬০৪ সালে জোহানেস কেপলারও খালি চোখে একটি সুপারনোভা দেখেছিলেন। তারপরে খালি চোখে এই প্রথম আবার কোনো সুপারনোভা ধরা পড়ল। এর পরপরই বেশ কয়েকটি দেশের জ্যোতির্বিদেরা লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউডের পেছনে যন্ত্রপাতি কাজে লাগাতে শুরু করলেন। পরের মাসগুলোতে '১৯৮৭-এ' নামের সুপারনোভাটির খুঁটিনাটি খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

শেলটনের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কয়েক ঘণ্টা আগে ভিন্ন একটি জায়গায় আরেকটি অস্বাভাবিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হচ্ছিল। জায়গাটা জাপানে। ভূমির অনেকটা গভীরে কামিওকা দস্তার খনি। একবুক স্বপ্ন নিয়ে কিছু পদার্থবিদ এখানে এক দীর্ঘমেয়াদি পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, বস্তুর অন্যতম মৌলিক উপাদান প্রোটন কণিকার চূড়ান্ত স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা। ১৯৭০-এর দশকে রচিত গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি অনুসারে প্রোটন খুব

অস্থিতিশীল হতে পারে, যা একধরনের তেজস্ক্রিয়তার ফলে সময় সময় ক্ষয় হয়ে থাকতে পারে। এটা সত্যি হলে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। এটা আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব।

প্রোটনের ক্ষয় পরীক্ষার জন্য জাপানের পরীক্ষকেরা একটি ট্যাংককে ২০০০ টন অতিবিশুদ্ধ পানি দিয়ে পূর্ণ করলেন। এর চারপাশে রাখলেন উচ্চ সংবেদনশীল ফোটন ডিটেক্টর। ডিটেক্টরের কাজ ছিল আলোর ঝলক খুঁজে বের করা। এখানে এমন আলো শুধু উচ্চগতির প্রোটন ক্ষয়ের মাধ্যমেই আসতে পারে। পরীক্ষার জন্য ভূমির গভীরের স্থান বেছে নেওয়া হয়েছিল মহাজাগতিক বিকিরণের প্রভাব কমানোর জন্য। অন্যথায় অপ্রত্যাশিত সংকেত পেতে পেতে অকার্যকর হয়ে উঠত ডিটেক্টর।

ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখ। হঠাৎ করে কামিওকা ডিটেক্টরগুলো ১১ সেকেন্ডের ব্যবধানে অন্তত সমানসংখ্যক সংকেত দিল। এদিকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ওহাইওর সল্ট মাইনে একই রকম একটি ডিটেক্টরে ধরা পড়ল আটটি সংকেত। একসঙ্গে এতগুলো ক্ষয় হয়ে যাবে, এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। অবশ্যই অন্য কোনো ব্যাখ্যা থাকবে এর। পদার্থবিদেরা শিগগিরই ব্যাখ্যাটা পেয়েও গেলেন। তাঁদের ডিটেক্টরে ধরা পড়া প্রোটন ক্ষয়ের কারণ অন্য একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সেটা হলো নিউট্রিনোর আঘাত।

নিউট্রিনোরা একধরনের অতিপারমাণবিক কণা। সামনে এদের কথা আরও আসবে। তাই এখনই খানিকটা বিস্তারিত জেনে নেওয়া দরকার। ১৯৩১ সালে উলফগ্যাং পাউলি প্রথম এদের অস্তিত্বের ধারণা দেন। এ তাত্ত্বিক পদার্থবিদের জন্ম অস্ট্রিয়ায়। তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ার বেটা ক্ষয় নামের অস্পষ্ট দিকটি ব্যাখ্যার জন্য এ ধারণা দেন তিনি। একটি সাধারণ বেটা ক্ষয় প্রক্রিয়ায় একটি নিউট্রন ভেঙে গিয়ে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়। ইলেকট্রন অপেক্ষাকৃত হালকা কণা হলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শক্তি সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হলো, প্রতিটি ক্ষয় প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রন ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ শক্তি নিয়ে বের হয়। নিউট্রনের ক্ষয় থেকেও প্রাপ্ত মোট শক্তি থেকেও কিছুটা কম। যেহেতু সব ক্ষেত্রেই মোট শক্তির পরিমাণ ধ্রুব, মনে হচ্ছে চূড়ান্ত শক্তি প্রাথমিক শক্তি থেকে আলাদা। এটা হওয়ার কথা নয়। কারণ, শক্তি সংরক্ষিত থাকবে, এটা পদার্থবিদ্যার একটি মৌলিক নীতি। তাই পাউলি প্রস্তাব করলেন, ওই হারানো শক্তিটুকু অন্য কোনো অদৃশ্য কণা নিয়ে চলে যাচ্ছে। কণাটিকে শনাক্তের প্রাথমিক চেষ্টা সফল হয়নি। এটা জানা হয়ে গেল যে এই কণাদের অস্তিত্ব থাকলেও ভেদনক্ষমতা হবে অত্যধিক। আমরা জানি, বৈদ্যুতিকভাবে চার্জযুক্ত যেকোনো কণা বস্তু দ্বারা আবদ্ধ হবে। ফলে পাউলির প্রস্তাবিত কণাটিকে

তড়িৎপ্রশম হতে হবে। কোনো চার্জ থাকবে না। এ জন্যই এর নাম দেওয়া হলো নিউট্রিনো। (নিউট্রাল (neutral) অর্থই প্রশম)

সে সময় কেউ নিউট্রিনোর দেখা না পেলেও তাত্ত্বিকেরা এর আরও অনেক বৈশিষ্ট্য জেনে গেলেন। একটি বৈশিষ্ট্য হলো নিউট্রিনোর ভর নিয়ে।

দ্রুতগামী কণিকাদের ক্ষেত্রে ভর নিয়ে একটু সাবধানে কথা বলতে হয়। কারণ, বস্তুর ভর নির্দিষ্ট নয়। নির্ভর করে বেগের ওপর। যেমন ১ কেজি ওজনের একটি সিসার বলের কথা ভাবা যাক। এটি সেকেন্ডে ২ লাখ ৬০ হাজার কিমি বেগে চললে এর ভর হয়ে যাবে ২ কেজি। এখানে নাটের গুরু আসলে আলোর বেগ। কোনো বস্তুর বেগ আলোর বেগের যত কাছে যাবে, তার ভর তত বেশি হবে। ভরের এই বৃদ্ধির শেষ নেই কোনো। ভর এভাবে বদলে যাচ্ছে বলে বিভ্রান্তি এড়ানোর লক্ষ্যে অতিপারমাণবিক কণাদের ভর বলার সময় পদার্থবিদেরা নিশ্চল ভরের কথা বলেন। কণাটি আলোর কাছাকাছি বেগে ভ্রমণ করলে এর প্রকৃত ভর নিশ্চল ভরের বহুগুণ হয়ে যেতে পারে। কণা ত্বরকযন্ত্রের ভেতর প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভর তাদের নিজ নিজ নিশ্চল ভরের বহুগুণও হতে পারে।

নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর জানার উপায় একটি আছে অবশ্য। অনেক ক্ষেত্রে বেটা ক্ষয় প্রক্রিয়ার সময় ইলেকট্রন নির্গত হতেই পুরো শক্তি ব্যয় হয়ে যায়। নিউট্রিনোর জন্য কিছুই বাকি থাকে না। তার মানে, অনিবার্যভাবেই নিউট্রিনোকে টিকে থাকতে হয় কোনো শক্তি ছাড়াই। এখন, আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E = mc^2$ সূত্র অনুসারে ভর এবং শক্তি সমতুল্য। তার মানে, শক্তি নেই মানে ভরও নেই। তার অর্থ দাঁড়ায়, সম্ভবত নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর খুব অল্প। শূন্যও হতে পারে। নিশ্চল ভর সত্যিই শূন্য হলে নিউট্রিনো চলবে আলোর গতিতে। আর তা না হলেও এর বেগ আলোর বেগের খুব কাছাকাছিই হবে।

অতিপারমাণবিক কণিকাদের ঘূর্ণনের সঙ্গে আরেকটি বিষয়ও জড়িত আছে। নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন সবাইকে সব সময় ঘুরতে দেখা যায়। ঘূর্ণনের মাত্রা নির্দিষ্ট এবং তিনটির ক্ষেত্রেই মাত্রাটা সমপরিমাণ। ঘূর্ণন হলো একধরনের কৌণিক ভরবেগ। কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা নামে একটি সূত্র আছে। শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতির মতোই এটিও একটি মৌলিক সূত্র। একটি নিউট্রন ক্ষয় হলে ক্ষয় হওয়া অংশেও এর ঘূর্ণন অবিকৃত থাকবে। ইলেকট্রন আর প্রোটন যদি একই দিকে ঘোরে, তবে তাদের ঘূর্ণনের যোগফল হবে নিউট্রনের ঘূর্ণনের দ্বিগুণ। তবে তারা যদি ভিন্ন দিকে ঘোরে, সে ক্ষেত্রে যোগফল হবে শূন্য। ঘটনা যা-ই হোক, একটি প্রোটন বা একটি ইলেকট্রন একা নিউট্রনের সমান হতে পারে না। কিন্তু নিউট্রিনোর কথা

হিসাবে ধরলে ভারসাম্য হয়। শুধু ধরে নিতে হবে, নিউট্রিনোর ঘূর্ণনের মাত্রাও অন্যদের মতো। সে ক্ষেত্রে ক্ষয়কৃত তিনটি অংশের দুটো ঘুরবে একই দিকে, আর তৃতীয়টি উল্টো দিকে।

ফলে নিউট্রিনো শনাক্ত হওয়ার আগেই পদার্থবিদেরা বুঝে ফেললেন, এই কণার বৈদ্যুতিক চার্জ থাকবে না। ঘুরবে ইলেকট্রনের মতো একই দিকে। ভর থাকবে না বা থাকলেও সেটা হবে স্বল্প পরিমাণ। সাধারণ বস্তুর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করবে এতই দুর্বলভাবে যে তার কোনো লক্ষণই চোখে পড়বে না। এক কথায়, এটি একধরনের ঘুরন্ত ভূত। ফলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে পাউলির অনুমানের পর পরীক্ষাগারে এর অস্তিত্ব নিশ্চিত করে প্রমাণ করতে প্রায় ২০ বছর লেগে গেছে। বর্তমানে নিউক্লীয় চুল্লিতে এরা সংখ্যায় সংখ্যায় তৈরি হয়। ফলে লুকানো স্বভাবের হলেও মাঝেমধ্যেই এদের শনাক্ত করে ফেলা যায়।

একই সঙ্গে কামিওকা খনিতে নিউট্রিনোর হানা এবং '১৯৮৭এ' সুপারনোভার আবির্ভাব কোনোমতেই কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। বিজ্ঞানীদের মতে, দুটো ঘটনা একই সঙ্গে ঘটার মধ্যে সুপারনোভা তত্ত্বের প্রমাণ রয়েছে। এত দিন ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তো সুপারনোভা থেকেই একঝাঁক নিউট্রিনো আসার প্রত্যাশা করছিলেন।

লাতিন ভাষায় নোভা মানে নতুন। তবে '১৯৮৭এ' নামের সুপারনোভাটি নতুন কোনো নক্ষত্রের জন্ম ছিল না। এটি আসলে ছিল বৃহৎ বিস্ফোরণের মাধ্যমে পুরোনো এক নক্ষত্রের মৃত্যু। সুপারনোভাটির উৎস লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউড একটি ক্ষুদ্র ছায়াপথ। দূরত্ব ১ লাখ ৭০ হাজার আলোকবর্ষ। এটি আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথের এতটাই কাছে যে, এটি অনেকটা মিল্কিওয়ের উপছায়াপথ (satellite gallaxy)। দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে একে খালি চোখেও দেখা যায়। ছোপ ছোপ আলোর একটি দাগ। নক্ষত্রগুলোকে আলাদা করে দেখতে হলে চাই বড় টেলিস্কোপ। শেলটনের আবিষ্কারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অস্ট্রেলীয় জ্যোতির্বিদেরা জেনে ফেললেন, লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউডের কয়েক শ কোটি নক্ষত্রের মধ্যে কোনটি এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এটা করার জন্য তাঁরা আকাশের ওই অংশের আগের কিছু ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করেন। নক্ষত্রটি ছিল বি৩ সুপারজায়ান্ট শ্রেণির[১]। এটি সূর্যের তুলনায় চওড়া ছিল ৪০ গুণ। নামও আছে একটি। স্যান্ডুলিক-৬৯ ২০২ (Sanduleak-69 202)।

নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, এই বিষয় নিয়ে প্রথম গবেষণা চালান জ্যোতিঃপদার্থবিদ ফ্রেড হয়েল, উইলিয়াম ফুলার এবং জেফ্রি ও মারগারেট বারবিজ। এটা ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝির কথা। এমন উত্তাল দশায়

নক্ষত্ররা কী করে পৌঁছায় তা জানতে হলে বুঝতে হবে এদের ভেতরে চলা প্রক্রিয়াগুলো। আমাদের সবচেয়ে চেনা-জানা নক্ষত্র হলো সূর্য। অন্য নক্ষত্রের মতোই দেখে মনে হচ্ছে সূর্যের কোনো পরিবর্তন নেই। আসলে কিন্তু সূর্য প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সব নক্ষত্রই গ্যাস দিয়ে তৈরি। এই গ্যাস জড়সড় থাকে মহাকর্ষের কারণে। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে মহাকর্ষ একা থাকলে নক্ষত্রটি নিজের তীব্র আকর্ষণে নিমেষের মধ্যে গুটিয়ে যেত। উধাও হয়ে যেত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু সেটা হয় না। কারণ, ভেতরের দিকের এই বলের বিপরীতে বাইরের দিকে কাজ করে আরেকটি বল। নক্ষত্রের অভ্যন্তরের সংকুচিত গ্যাসের বহির্মুখী চাপ। দুটোতে তৈরি হয় ভারসাম্য।

গ্যাসের চাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে একটি সরল সম্পর্ক আছে। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট আয়তনের গ্যাসকে উত্তপ্ত করলে তাপমাত্রার অনুপাতে এর চাপ বাড়ে। আবার তাপমাত্রা কমলে কমে যায় চাপও। নক্ষত্রের ভেতরে তীব্র চাপের কারণ এর তীব্র তাপমাত্রা। বহু মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপের উৎস হলো নিউক্লীয় বিক্রিয়া। নক্ষত্রের জীবনের বেশির ভাগ সময়জুড়ে একটি বিক্রিয়াই চলে। সেটা হলো ফিউশন (সংযোজন) বিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তর। পরমাণুগুলোর নিউক্লিয়াসের ইলেকট্রনরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। ফলে এই বিকর্ষণকে পরাভূত করতে বিক্রিয়ার তাপমাত্রা হতে হয় প্রচণ্ড। ফিউশনের শক্তি একটি নক্ষত্রকে কয়েক শ কোটি বছর টিকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু একদিন না একদিন জ্বালানি ঠিকই ফুরিয়ে আসে। দুর্বল হয়ে পড়ে বিক্রিয়ার গতি। এবার বহির্মুখী চাপ দুর্বল হয়ে পড়ে। জিতে যায় মহাকর্ষ। নক্ষত্রটি তার অবশিষ্ট জ্বালানি দিয়ে মহাকর্ষজনিত অন্তঃস্ফোটন (ভেতরের দিকে গুটিয়ে যাওয়া) প্রতিহত করে আরেকটু সময় বেঁচে থাকে। কিন্তু পৃষ্ঠ থেকে প্রতিবার মহাশূন্যে শক্তি নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তিম সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসতে থাকে।

হিসাব করে দেখা গেছে, যে পরিমাণ হাইড্রোজেন নিয়ে সূর্যের পথচলা শুরু হয়েছে, তাতে তার প্রায় এক হাজার কোটি বছর জ্বলার কথা। এখন বয়স ৫০০ কোটি বছর। মানে প্রায় অর্ধেক জ্বালানি শেষ। (এখনো ভয়ের কিছু নেই) একটি নক্ষত্র কী হারে নিউক্লীয় জ্বালানি খরচ করবে, তা নির্ভর করে এর ভরের ওপর। ভারী নক্ষত্ররা জ্বালানি খরচ করে অনেক দ্রুত। তা না করে যে উপায় নেই। এরা বড় এবং উজ্জ্বল। ফলে বিকিরণ করে বেশি পরিমাণ শক্তি। বাড়তি ওজনের কারণে গ্যাসের ঘনত্ব ও তাপমাত্রা যায় বেড়ে। ফলে বেড়ে যায় ফিউশনের হার। যেমন ১০ সৌরভরের একটি নক্ষত্র এর বেশির ভাগ হাইড্রোজেন মাত্র এক কোটি বছরেই শেষ করে ফেলতে পারে।

এমন ভারী একটি নক্ষত্রের ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে, দেখা যাক। বেশির ভাগ নক্ষত্রের জীবন শুরু হয় মূলত হাইড্রোজেন দিয়ে। হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস মানে কেবল একটি প্রোটন। হাইড্রোজেনের 'দহন'[২] প্রক্রিয়ায় দুটো হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে হিলিয়াম মৌলের নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। এর প্রতিটিতে থাকে দুটি করে প্রোটন ও নিউট্রন। (এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা একটু জটিল আর সেটা আমাদের আপাতত দরকারও নেই) নিউক্লীয় শক্তির সবচেয়ে কার্যকর উৎস হলো হাইড্রোজেন 'দহন'। তবে এটাই একমাত্র উৎস নয়। অভ্যন্তরভাগের তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশি হলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে কার্বন গঠন করতে পারে। তারও পরে ফিউশনের মাধ্যমে অক্সিজেন, নিয়ন ও অন্যান্য মৌল তৈরি হয়। একের পর এক নিউক্লীয় বিক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা উৎপন্ন করার কাজ ভারী নক্ষত্রগুলো করতে পারে। মাঝেমধ্যে সে তাপমাত্রা ১০০ কোটির ওপরেও হয়।

কিন্তু শক্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। প্রতিটি নতুন মৌল তৈরির সঙ্গে সঙ্গে নির্গত শক্তির পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। জ্বালানি দ্রুত থেকে দ্রুততর খরচ হতে থাকে। নক্ষত্রের উপাদান বদলে যেতে থাকে। শুরুতে প্রতি মাসে, পরে প্রতিদিন এবং শেষমেশ প্রতি ঘণ্টায়। অভ্যন্তরভাগ দাঁড়ায় পেঁয়াজের মতো, যেখানে উত্তাল প্রক্রিয়ায় ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠা রাসায়নিক মৌলগুলো পেঁয়াজের স্তরের মতো কাজ করে। বাইরের দিকে আবার নক্ষত্রটি ফুলে-ফেঁপে বড় হয়ে যায়। হয়ে যায় আমাদের পুরো সৌরজগতের চেয়েও বড়। একেই জ্যোতির্বিদেরা বলেন, লোহিত অতিদানব (red supergiant)।

নিউক্লীয় দহন প্রক্রিয়ার ইতি ঘটে লোহা তৈরির মাধ্যমে। এর নিউক্লীয় গঠনটা বেশ স্থিতিশীল। নিউক্লীয় ফিউশনের মাধ্যমে লোহার চেয়ে ভারী মৌল গঠিত হতে নক্ষত্রের নিজেরই শক্তি ধার করতে হয়। নির্গত করা তো পরের কথা। ফলে লোহা তৈরি হয়ে গেছে মানে একটি নক্ষত্রের এখানেই সমাপ্তি। কেন্দ্রীয় অঞ্চল যখন আর তাপ উৎপন্ন করতে না পারবে, দাবার ঘুঁটি চলে যাবে মহাকর্ষের হাতে। নক্ষত্রটি হয়ে পড়ে চরমভাবে ভারসাম্যহীন। পতিত হয় নিজস্ব মহাকর্ষীয় গর্তে।

পরের ঘটনা খুব দ্রুত ঘটে। নক্ষত্রের লোহায় গড়া কেন্দ্র নিউক্লীয় দহনের মাধ্যমে আর কোনো তাপ উৎপাদন করতে পারে না। ফলে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় নিজের ওজন। এত দ্রুত গুটিয়ে যায় যে পরমাণুগুলো পর্যন্ত দুমড়েমুচড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের ঘনত্ব এত বেড়ে যায় যে একটি আঙুলের মাথায় যে পরিমাণ পদার্থ আঁটবে, সেটাই প্রায় এক লাখ কোটি টন। এ দশায় নক্ষত্রটির কেন্দ্রমণ্ডলের ব্যাস হয় মাত্র ২০০ কিলোমিটার। নিউক্লীয় পদার্থের

কাঠিন্যের ফলে এটি লাফালাফি করবে। মহাকর্ষ এত শক্তিশালী যে এই বিশাল ঘটনা ঘটতে সময় লাগবে কয়েক মিলিসেকেন্ড। কেন্দ্রে যেন নাটকের কোনো শেষ নেই। আকস্মিকভাবে তীব্র আলোড়নের মাধ্যমে নাক্ষত্রিক পদার্থের আশপাশের স্তরগুলো এসে পতিত হয় কেন্দ্রমণ্ডলে। সেকেন্ডে অযুত অযুত বেগে চলে ভেতরের দিকের এই গতি। ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন[৩] পদার্থ এসে আঘাত হানে তীব্র ঘন কেন্দ্রমণ্ডলে। কেন্দ্রমণ্ডল হয় হীরার দেয়ালের চেয়েও দৃঢ়। এরপর হয় তীব্র সংঘর্ষ। যার ফলে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে একটি শক্তিশালী শকওয়েভ।

শকওয়েভের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণ নিউট্রিনোও নির্গত হয়। নক্ষত্রের সর্বশেষ নিউক্লীয় রূপান্তরের সময় ভেতরের এলাকা থেকে আকস্মিকভাবে বের হয় কণাগুলো। এই রূপান্তরের প্রাক্কালেই নক্ষত্রের পরমাণুর ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলিত হয়ে গঠন করে নিউট্রন। ফলে নক্ষত্রের কেন্দ্রমণ্ডল নিউট্রনের এক বিশাল গোলকে পরিণত হয়। শকওয়েভ ও নিউট্রিনোরা যৌথভাবে নক্ষত্রের বাইরের স্তরগুলোর দিকে বিপুল পরিমাণ শক্তি পরিবহন করে। এই শক্তি শোষণ করে নক্ষত্রের বাইরের স্তর বিস্ফোরিত হয়। এক ভয়াবহ নিউক্লীয় বিস্ফোরণ। কয়েক দিন ধরে নক্ষত্রটি হাজার কোটি সূর্যের আলো বিকিরণ করে। কয়েক সপ্তাহ পর আবার ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে যেতে থাকে।

মিল্কিওয়ের মতো আদর্শ গ্যালাক্সিগুলোতে প্রতি শতাব্দীতে দুই কি তিনটি সুপারনোভা দেখা যায়। জ্যোতির্বিদেরা বিস্ময়ভরা চোখে সেগুলো নথিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে বিখ্যাত একটি দেখা গিয়েছিল ১০৫৪ সালে। চীনা ও আরব জ্যোতির্বিদেরা এটি পর্যবেক্ষণ করেন। অবস্থান ছিল আকাশের কর্কটমণ্ডলীতে। বিদীর্ণ সেই তারকাটিকে আজ প্রসারণশীল গ্যাসের ছেঁড়া মেঘের মতো লাগে। নাম ক্র্যাব নেবুলা বা কাঁকড়া নীহারিকা।

'১৯৮৭এ' সুপারনোভার বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বে বহু অদৃশ্য নিউট্রিনো ছড়িয়ে পড়ে। এই নিঃসরণের তীব্রতা ছিল মারাত্মক। পৃথিবীর প্রতি বর্গসেন্টিমিটার জায়গায় এক অযুত কোটি নিউট্রিনো আঘাত হানে। যদিও বিস্ফোরণস্থল থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১ লাখ ৭০ হাজার আলোকবর্ষ। অন্য একটি ছায়াপথ থেকে আসা বহু ট্রিলিয়ন কণা যে পৃথিবীর মানুষের শরীর ভেদ করে চলে গেছে, তা তারা জানতেও পারেনি। কিন্তু কামিওকাও ওহাইয়ো প্রোটন-ক্ষয় ডিটেক্টরগুলো ১৯টি নিউট্রিনোকে ধরে ফেলে। এই ব্যবস্থা না থাকলে নিউট্রিনোগুলো সবার অজান্তে চলে যেত। যেমনটি গিয়েছিল ১০৫৪ সালে।

সুপারনোভা মানেই একটি নক্ষত্রের মৃত্যু। তবে বিস্ফোরণের একটি ভালো দিকও আছে। বিপুল পরিমাণ শক্তি অবমুক্ত হওয়ার ফলে নক্ষত্রের

বাইরের স্তরগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তাপ এত বেশি হয় যে কিছু সময়ের জন্য আবারও নিউক্লীয় ফিউশন বিক্রিয়া হতে পারে। এ বিক্রিয়া শক্তি নির্গত করার বদলে শোষণ করে। সবচেয়ে উত্তাল এই নাক্ষত্রিক চুল্লিতেই লোহার চেয়ে ভারী মৌলগুলো প্রস্তুত হয়। এই যেমন সোনা, সিসা, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি। কার্বন, অক্সিজেনের মতো নিউক্লীয় সংশ্লেষের প্রাথমিক পর্যায়ে তৈরি হালকা মৌলগুলোর সঙ্গে সঙ্গে এই ভারী মৌলগুলোও মহাকাশে নিক্ষিপ্ত হয়। মিশে যায় অন্য সুপারনোভাদের নিক্ষিপ্ত এমন অসংখ্য পদার্থের সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে এই ভারী পদার্থগুলো নতুন প্রজন্মের নক্ষত্র ও গ্রহে পরিণত হয়। এই মৌলগুলো প্রস্তুত বা নিক্ষিপ্ত না হলে পৃথিবীর মতো কোনো গ্রহ তৈরি হতো না। প্রাণ তৈরির কাঁচামাল কার্বন ও অক্সিজেন, ব্যাংকে রক্ষিত সোনা, ছাদের সিসার আস্তর, নিউক্লীয় চুল্লিতে ইউরেনিয়ামের রড—পৃথিবীর এই সবকিছু হয়েছে নক্ষত্রদের জীবনের বিনিময়ে, আমাদের সূর্যের জন্মের আগেই যাদের জীবনের ইতি ঘটেছিল। ভাবতেই কেমন লাগে, আমাদের শরীর যে উপাদান দিয়ে তৈরি, তা বহুকাল ধরে মৃত নক্ষত্রের নিউক্লীয় ছাই দিয়ে গড়া।

সুপারনোভা বিস্ফোরণে নক্ষত্র সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় না। তুমুল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বেশির ভাগ পদার্থ বেরিয়ে গেলেও সংকুচিত যে কোর বা কেন্দ্রমণ্ডল ওই ঘটনার সূত্রপাত করেছিল, সেটি থেকে যায় নিজের অবস্থানেই। তবে এর নিয়তিও যে কী হবে, সেটা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। কোরের ভর যদি খুব কম হয়, এই ধরুন এক সৌরভর, তাহলে এটি ছোট শহরের আকারের একটি নিউট্রনের গোলকে পরিণত হবে। খুব সম্ভব এই নিউট্রন নক্ষত্রটি উন্মত্তভাবে ঘুরতে থাকবে। সম্ভবত প্রতি সেকেন্ডে ১০০০ বার। মানে এর পৃষ্ঠে ঘূর্ণন বেগ হবে আলোর বেগের ১০ শতাংশ। এর কারণ হলো সংকোচন। যার ফলে অল্প ঘূর্ণন নিয়ে শুরু হওয়া নক্ষত্রটিও জোরে ঘুরতে থাকে। বরফের ওপর স্কেটিং করা অবস্থায় হাত গুটিয়ে নিলেও ঠিক একই কারণে অপেক্ষাকৃত জোরে ঘোরা যায়। এভাবে জোরে আবর্তনশীল বহু নিউট্রন নক্ষত্র জ্যোতির্বিদেরা খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আবর্তন ধীরে ধীরে কমে আসে। কারণ, বস্তুটি শক্তি হারাতে থাকে। যেমন কাঁকড়া নীহারিকার মধ্যখানে অবস্থিত নিউট্রন নক্ষত্রটি এখন সেকেন্ডে মাত্র ৩৩ বার ঘোরে।

তবে কোরের ভর যদি আরেকটু বেশি হয়, এই ধরুন কয়েক সৌরভর, তাহলে এটি নিউট্রন হয়েই হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। মহাকর্ষ এ ক্ষেত্রে অনেক শক্তিশালী। নিউট্রন দিয়ে গড়া বস্তু বর্তমানে জানা সবচেয়ে দৃঢ় বস্তু। কিন্তু এই নিউট্রনও বাড়তি সংকোচন ঠেকাতে পারে না। ঘটনা গড়াতে

থাকে আরও দারুণ পরিণতির দিকে। সুপারনোভার চেয়েও উত্তাল। নক্ষত্রের কোর গুটিয়ে যেতেই থাকে। এক মিলিসেকেন্ডেরও কম সময়ে এটি একটি ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর বানিয়ে ফেলে। হারিয়ে যায় দৃশ্যমান জগৎ থেকে।

তার মানে, ভারী নক্ষত্রদের নিয়তি হলো ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যাওয়া। আর ধ্বংসাবশেষ হিসেবে থেকে যায় একটি নিউট্রন নক্ষত্র বা একটি ব্ল্যাকহোল। চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে নিক্ষিপ্ত গ্যাসের দল। কে জানে, কত কত নক্ষত্র এখন পর্যন্ত এই পরিণতি বরণ করেছে। কিন্তু শুধু মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই এমন বিলিয়ন বিলিয়ন নাক্ষত্রিক ধ্বংসাবশেষ পড়ে থাকতে পারে।

ছোটবেলায় আমি খুব ভয় পেতাম যে সূর্য হয়তো বিস্ফোরিত হয়ে যেতে পারে। আসলে কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। এটি কখনো সুপারনোভা হবে না। এর ভর অত বেশি নয়। ভারী নক্ষত্রের তুলনায় হালকাগুলোর নিয়তি এত উত্তাল নয়। প্রথম কথা হলো, এ ক্ষেত্রে নিউক্লীয় প্রক্রিয়ায় জ্বালানি ব্যয় হয় অনেক কম গতিতে। ন্যূনতম নাক্ষত্রিক ভরের একটি বামন নক্ষত্র এক ট্রিলিয়ন বছর ধরে একই হারে আলো দিয়ে যেতে থাকতে পারে। তার ওপর একটি হালকা নক্ষত্রের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা এত বেশি হওয়া সম্ভব নয় যে এটি লোহাও সংশ্লেষ করবে। ফলে এতে উত্তাল অন্তঃস্ফোটন ঘটতে পারে না।

সূর্য স্বল্প ভরের নক্ষত্রের একটি আদর্শ উদাহরণ। হাইড্রোজেন জ্বালানি খরচ ও হিলিয়ামে রূপান্তর হচ্ছে খুব ধীরেসুস্থে। হিলিয়াম মূলত থাকে কেন্দ্রীয় কোরের দিকে। নিউক্লীয় বিক্রিয়ার কথা বললে কোরকে নিষ্ক্রিয়ই বলতে হবে। ফিউশন সংঘটিত হয় কোরের পৃষ্ঠে। ফলে মহাকর্ষীয় বলের সংকোচন রোধ করার জন্য সূর্যের যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন, কোর তা তৈরিতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। সংকোচন ঠেকাতে নতুন হাইড্রোজেনের সন্ধানে সূর্যকে এর নিউক্লীয় কর্মকাণ্ড বাইরের দিকে ছড়িয়ে দিতে হয়। এদিকে হিলিয়াম কোর ক্রমেই ছোট হতে থাকে। অভ্যন্তরীণ এসব পরিবর্তনের ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের চেহারা ক্রমেই বদলে যাবে। এটি ফুলে-ফেঁপে উঠবে। কিন্তু পৃষ্ঠ কিঞ্চিৎ ঠান্ডা হবে। দেখা যাবে হালকা লাল আভা। এ অবস্থা চলতে থাকবে যত দিন না সূর্য লোহিত দানবে (red giant) পরিণত হয়। এ সময় সম্ভবত এটি বর্তমান সময়ের ৫০০ গুণ বড় হবে। জ্যোতির্বিদদের কাছে লোহিত দানব একটি পরিচিত নাম। আকাশের বেশ কটি পরিচিত উজ্জ্বল নক্ষত্রই এই শ্রেণির নক্ষত্র। যেমন আলদাবেরান (Aldebaran), আদ্রা (Betelgeuse) ও স্বাতী (Arcturus)। স্বল্প ভরের নক্ষত্রদের সমাপ্তির শুরু হয় লোহিত দানব দশার মাধ্যমে।

লোহিত দানবেরা অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। তবে আকার বড় হওয়ার কারণে এদের বিকিরণপৃষ্ঠ হয় বিশাল। তার মানে সার্বিক দীপ্তি

(luminosity) বা ঔজ্জ্বল্যও বেশি। এ সময় কপাল পুড়বে সূর্যের গ্রহগুলোর। আরও প্রায় ৪০০ কোটি বছর পর বর্ধিত তাপপ্রবাহ আঘাত হানবে এদের ওপর। তার অনেক আগেই পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। সাগর শুকিয়ে যাবে আর উড়ে যাবে বায়ুমণ্ডল। এরপর সূর্য আরও বিস্তৃত হবে। গ্রাস করবে বুধ গ্রহকে। তারপর শুক্র। পরিশেষে পৃথিবীকেও নিয়ে নেবে আগ্রাসী পেটের ভেতর। আমাদের গ্রহখানি পরিণত হবে অঙ্গারে। এত দহন সহ্য করেও কিন্তু যাবে না কক্ষপথ ছেড়ে। সূর্যের লাল-উষ্ণ গ্যাসের ঘনত্ব এত কমে যাবে যে সেটা শূন্যস্থানের কাছাকাছি হবে। ফলে পৃথিবীর গতি হবে প্রায় মসৃণ।

মহাবিশ্বে আমাদের অস্তিত্বের কারণ সূর্যের মতো এমন অসাধারণ স্থিতিশীল নক্ষত্র। যেটি কয়েক বিলিয়ন বছর ধরে অবিরত জ্বলতে পারে। যে সময়টা জীবনের স্পন্দন তৈরি ও বিকাশের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু লোহিত দানব দশায় এই স্থিতিশীলতার ইতি ঘটবে। সূর্যের মতো নক্ষত্রের জীবনের পরের ধাপগুলো জটিল, অনির্দিষ্ট ও উত্তাল। হঠাৎ করে বদলে যায় আচরণ ও চেহারা। বয়স্ক নক্ষত্ররা স্পন্দিত হতে হতে বা গ্যাসের খোলস ছাড়াতে ছাড়াতে নিযুত নিযুত বছর পার করে দিতে পারে। নক্ষত্রের কোরের হিলিয়াম দহন সংঘটিত করে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন তৈরি করতে পারে। ফলে নক্ষত্রটি আরও কিছুদিন বেঁচে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে যায়। বাইরের স্তরটিকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করার পর নক্ষত্রটির কাছে কার্বন-অক্সিজেনে গড়া কোর ছাড়া আর কিছু থাকে না।

জটিল কার্যক্রমের এই যুগ শেষ হলে স্বল্প ও মাঝারি ভরের নক্ষত্ররা শেষ পর্যন্ত মহাকর্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। হয় সংকুচিত। এই সংকোচন অপ্রতিরোধ্য। শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রের আকার গ্রহের সমান করে তবে ছাড়ে। এ অবস্থায় বস্তুটিকে জ্যোতির্বিদেরা বলেন শ্বেত বামন (white dwarf)। আকার ছোট হওয়ার কারণে শ্বেত বামনরা খুব অনুজ্জ্বলও। যদিও তাদের পৃষ্ঠ তাপমাত্রা হতে পারে সূর্যের চেয়েও বেশি। কোনোটিকেই টেলিস্কোপ ছাড়া পৃথিবী থেকে দেখা যায় না।

দূর ভবিষ্যতে শ্বেত বামনে পরিণত হওয়াটাই লেখা আছে আমাদের ভাগ্যে। এ অবস্থায় পৌঁছানোর পর বহু বিলিয়ন বছর ধরে উত্তপ্ত থাকবে সূর্য। এর বিশাল অবয়ব এত শক্ত হবে যে এটি এর অভ্যন্তরীণ তাপ খুব দক্ষতার সঙ্গে আটকে রাখবে। আমাদের জানা সেরা তাপরোধকের চেয়েও ভালোভাবে। কিন্তু ভেতরের নিউক্লীয় চুল্লিতে যেহেতু চিরদিনের জন্য লালবাতি জ্বলে গেছে, তাই ভেতরে আর কোনো বাড়তি জ্বালানি অবশিষ্ট নেই। ফলে তারকাটি থেকে ধীরে ধীরে শীতল মহাশূন্যের গভীরের দিকে

যে তাপীয় বিকিরণ নির্গত হচ্ছে, সেটা পূরণ করা সম্ভব নয়। খুব ধীরে বামন ধ্বংসাবশেষটি শীতল ও অনুজ্জ্বল হয়ে যাবে। যদিও একসময় তা ছিল আমাদের তেজস্বী সূর্য। আর একটি পরিবর্তন বাকি। এবার এটি ক্রমেই একটি কঠিন স্ফটিকে (crystal) পরিণত হবে। দৃঢ়তা হবে অসামান্য। শেষে এটি একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। নীরবে মিশে যাবে মহাশূন্যের অন্ধকারে।

তথ্যনির্দেশ

১. তাপমাত্রার ভিত্তিতে নক্ষত্রের শ্রেণিবিভাগে O, B, A, F, G, K I M বর্ণগুলো ব্যবহার করা হয়। এ ক্রমানুসারে O শ্রেণির নক্ষত্র সবচেয়ে উষ্ণ। আর M শ্রেণির নক্ষত্র সবচেয়ে কম উষ্ণ।
২. সাধারণ অর্থে দহন বলতে বোঝায় কোনো মৌলের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ার মাধ্যমে পুড়ে যাওয়া। তবে সেটা হলো একধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া। এখানে কথা হচ্ছে নিউক্লীয় বিক্রিয়া নিয়ে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নতুন কোনো মৌল উৎপন্ন হতে পারে না। কিন্তু নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় এ কাজই হয়।
৩. ১ ট্রিলিয়ন সমান ১ লাখ কোটি, মানে ১,০০০,০০০,০০০,০০০।

পঞ্চম অধ্যায়

অন্ধকার অমানিশা

অযুত নক্ষত্রের আলো নিয়ে জ্বলে আকাশগঙ্গা ছায়াপথ (Milky Way galaxy)। প্রতিটি নক্ষত্রের গলায় ঝুলছে মৃত্যুর পরোয়ানা। আজ আমরা যাদের দেখছি, এক হাজার কোটি বছরের মধ্যে তাদের বেশির ভাগই দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাবে। মারা যাবে জ্বালানির অভাবে। কারণ, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র।

আকাশগঙ্গায় তবু নক্ষত্রের আলো থাকবে। কারণ, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবার তাদের জায়গায় নতুন নক্ষত্রেরও জন্ম হয়। ছায়াপথের সর্পিল বাহুতে থাকা গ্যাসীয় মেঘ সংকুচিত হয়, মহাকর্ষের প্রভাবে গুটিয়ে আসে ও আলাদা একগুচ্ছ নক্ষত্রের জন্ম দেয়। আমাদের সূর্যও এমন একটি বাহুতেই অবস্থিত। কালপুরুষ তারামণ্ডলের দিকে একনজর তাকালেও এমন একটি নাক্ষত্রিক কারখানা খুঁজে পাওয়া যায়। কালপুরুষের তলোয়ারের কেন্দ্রের ঘোলাটে আলোখানা কোনো তারকা নয়। এটি একটি নেবুলা বা নীহারিকা। বিশাল এক গ্যাসীয় মেঘ। সঙ্গে আছে উজ্জ্বল নতুন নতুন নক্ষত্র। দৃশ্যমান আলোর বদলে অবলোহিত বিকিরণ দিয়ে জ্যোতির্বিদেরা এই নীহারিকায় কিছু নক্ষত্রকে তাদের জন্মের একেবারে শুরুর দশাগুলোতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এরা এখনো গ্যাস ও ধুলায় ঢেকে আছে।

যত দিন যথেষ্ট গ্যাস আছে, আমাদের ছায়াপথের সর্পিল বাহুগুলোতে নক্ষত্রের জন্ম হতেই থাকবে। ছায়াপথের গ্যাসগুলোর কিছু অংশ প্রারম্ভিক দশায় আছে, এখনো যেগুলো নক্ষত্রে পরিণত হতে পারেনি। কিছু অংশ আবার সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে এসেছে। অথবা এসেছে নাক্ষত্রিক বায়ু, ছোট ছোট ঝড় ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি অনির্দিষ্ট সময় ধরে চলতে পারে। পুরোনো নক্ষত্ররা মারা গিয়ে ও সংকুচিত হয়ে শ্বেত বামন, নিউট্রন নক্ষত্র

ব্ল্যাকহোল হয়ে গেলে আর আন্তনাক্ষত্রিক স্থানে নতুন পদার্থ সরবরাহ করতে পারবে না। ধীরে ধীরে প্রারম্ভিক গ্যাসগুলো সব নক্ষত্র হতে থাকবে। একসময় তা-ও শেষ হয়ে যাবে। শেষের দিকের এই নক্ষত্রগুলোও জীবনের পাট চুকিয়ে মারা গেলে ছায়াপথ খুব অনুজ্জ্বল হয়ে যাবে। তবে কাজটা হুট করে হয়ে যাবে না। ছোট ও নতুন নক্ষত্ররা তাদের নিউক্লীয় দহন সম্পন্ন করে গুটিয়ে শ্বেত বামন হতে বহু বিলিয়ন বছর সময় লাগবে। কিন্তু প্রক্রিয়া ধীর হলেও বিভীষিকাময় অনন্ত রাত একদিন নেমে আসবেই।

চিরপ্রসারণশীল মহাশূন্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাকি সব ছায়াপথের কপালেও ওই একই জিনিস লেখা আছে। নিউক্লীয় শক্তির কল্যাণে বর্তমান মহাবিশ্ব জ্বলজ্বল করে আলো দিচ্ছে। কিন্তু একদিন আলোর এই মূল্যবান উৎস ফুরিয়ে যাবে। আলোর যুগ চিরদিনের জন্য বিদায় হবে।

তবে মহাজাগতিক আলো ফুরিয়ে গেলেই মহাবিশ্ব মারা যাবে না। কারণ, শক্তির উৎস আছে আরেকটি, যা নিউক্লীয় বিক্রিয়ার চেয়েও শক্তিশালী। পারমাণবিক স্তরে চিন্তা করলে প্রকৃতির দুর্বলতম বল মহাকর্ষ। কিন্তু মহাজাগতিক মাপকাঠিতে এই বলটিই আবার রাজা। এর প্রভাব হতে পারে খুব মৃদু। কিন্তু সেটা নাছোড়বান্দার মতো কাজ করে যেতে থাকে। বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে নক্ষত্ররা নিউক্লীয় দহনের মাধ্যমে নিজেদের ওজনকে ধরে রেখেছে। কিন্তু মহাকর্ষ এত দিন শুধু ওত পেতে ছিল।

একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের দুটি প্রোটনের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল সবল নিউক্লীয় বলের ১০০ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের ১ ভাগ ($১০^{-৩৭}$)। কিন্তু মহাকর্ষ বলটি ক্রমবর্ধমান। প্রতিটি বাড়তি প্রোটন বাড়তি ওজনের জোগান দেয়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত মহাকর্ষ বল আগ্রাসী হয়ে দাঁড়ায়। প্রবল শক্তির পেছনে এই তীব্র বলই মূল ভূমিকা রাখে।

মহাকর্ষের ক্ষমতা সবচেয়ে ভালোভাবে প্রদর্শন করে ব্ল্যাকহোল। এখানে জয় হয়েছে ব্ল্যাকহোলের। সংকোচনের ফলে নক্ষত্রের আয়তন হয়ে গেছে শূন্য। সময়ের অসীম বিকৃতির আকারে আশপাশের স্থানকালে সে ঘটনার একটি ছাপ পড়েছে। ব্ল্যাকহোল নিয়ে একটি দারুণ মানস পরীক্ষা (thought experiment) আছে। মনে করুন, অনেক দূর থেকে একটি ছোট, যেমন ১০০ গ্রাম ভরের বস্তুকে ব্ল্যাকহোলে ফেলে দেওয়া হলো। বস্তুটি দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবে এবং চিরতরে নাগালের বাইরে চলে যাবে। তবে ব্ল্যাকহোলের কাঠামো এ ঘটনার একটি সাক্ষ্য বহন করবে। বস্তুটিকে খেয়ে ব্ল্যাকহোলের আকৃতি খুব সামান্য পরিমাণ বড় হবে। হিসাব করে দেখা গেছে, বস্তুটিকে অনেক দূর থেকে ফেলা হলে ব্ল্যাকহোলের ভর যতটুকু বাড়বে, তা বস্তুটির মূল ভরের সমপরিমাণ। তার মানে, ভর বা শক্তির এতটুকুও অন্য কোনো দিকে যাবে না।

এবার অন্য একটি পরীক্ষা। ভরটিকে এবার ধীরে ধীরে ব্ল্যাকহোলের দিকে নামানো হচ্ছে। এটা করার জন্য বস্তুটির সঙ্গে একটি রশি লাগাতে হবে। এরপর সেটাকে পুলির ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ড্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। ড্রামের মাধ্যমে আস্তে আস্তে রশির প্যাঁচ খোলা হবে। (চিত্র ৫.১ দেখুন : আমরা ধরে নিচ্ছি রশিটি প্রসারিত হবে না। কোনো ওজনও থাকবে না। বাস্তবে এ দুটোর কোনোটিই সম্ভব নয়, কিন্তু জটিলতা এড়ানোর জন্য ধরে নিতে হচ্ছে।) ভরটিকে নিচে নামানো হলে এটি শক্তি সরবরাহ করতে পারবে। যেমন ড্রামের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক জেনারেটর চালু করে এটা করা যেতে পারে। বস্তুটি ব্ল্যাকহোলের পৃষ্ঠের যত বেশি নিকটবর্তী হবে, তার ওপর হোলের মহাকর্ষীয় টান তত শক্তিশালী হবে। নিচের দিকে টান যত বাড়বে, বস্তুটি জেনারেটর দিয়ে ততই বেশি কাজ করাতে পারবে। বস্তুটি ব্ল্যাকহোলের পৃষ্ঠে পৌঁছাতে পৌঁছাতে জেনারেটরকে কী পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করবে, তা সহজেই হিসাব করে বের করা যায়। আদর্শ ক্ষেত্রে এর উত্তর হবে, বস্তুটির সমগ্র নিশ্চল ভর-শক্তি। (নিশ্চল ভর সম্পর্কে জানতে পরিশিষ্ট দেখুন।)

আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E=mc^2$ সূত্রটি মনে আছে নিশ্চয়ই। m ভরের একটি বস্তু থেকে mc^2 পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। তত্ত্ব বলছে, ব্ল্যাকহোল ব্যবহার করে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব। ১০০ গ্রাম ভরের বস্তু থেকেই পাওয়া যাবে ৩০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা (মানে ৩০০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ—অনুবাদক) বিদ্যুৎ। তুলনার জন্য বলে রাখি, সূর্য যখন ১০০ গ্রাম জ্বালানি ফিউশনের মাধ্যমে পুড়িয়ে এর এক ভাগেরও কম শক্তি সরবরাহ করে। মানে তত্ত্ব অনুসারে, মহাকর্ষীয় উপায়ে যে শক্তি পাওয়া যাবে, তা নক্ষত্রের শক্তি জোগানো তাপ-নিউক্লীয় ফিউশনের ১০০ গুণ।

এখানে যে দুটো কৌশলের কথা বলা হলো তার দুটোই একেবারে অবাস্তব। নিঃসন্দেহে ব্ল্যাকহোলে বস্তুরা পড়ে বিরতিহীনভাবে। শক্তি উদ্ধার করার মতো করে সুন্দর উপায়ে পুলি থেকে ঝুলে থাকে না। বাস্তবে নিশ্চল ভরের শূন্য ও ১০০ ভাগের মাঝামাঝি মানের কোনো একটি শক্তি পাওয়া যাবে। প্রকৃত মানটা নির্ভর করবে ভৌত পরিস্থিতির ওপর। গত কয়েক দশকে জ্যোতিঃপদার্থবিদেরা বিভিন্ন রকম কম্পিউটার সিমুলেশন[১] ও গাণিতিক মডেল বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। উদ্দেশ্য হলো পেঁচিয়ে ব্ল্যাকহোলের ভেতরে চলে যাওয়ার সময় গ্যাসের অবস্থা কেমন হয় এবং কী পরিমাণ ও কীভাবে শক্তি বিমুক্ত হয়, তা জানা। এখানে যে ভৌত প্রক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয় সেগুলো বেশ জটিল। তবুও এটা বোঝা যাচ্ছে যে এসব জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ মহাকর্ষীয় শক্তি বেরিয়ে আসতে পারে।

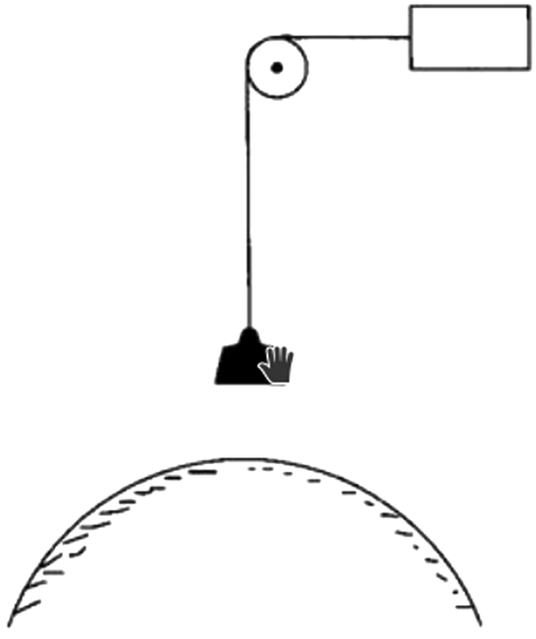

চিত্র ৫.১

আদর্শ এই মানস পরীক্ষায় একটি রশির সাহায্যে একটি বস্তুকে ধীরে ধীরে ব্ল্যাকহোলের পৃষ্ঠের দিকে নামানো হয়। ব্যবহার করা হয় একটি পুলি ব্যবস্থা (ছবিতে দেখানো হয়নি)। ফলে, নিচের নামা বস্তুটি কাজ করতে থাকে আর বক্সে শক্তি পাঠাতে থাকে। বস্তুটি ব্ল্যাকহোলে পৃষ্ঠের যতই কাছাকাছি হতে থাকে, পাঠানো মোট শক্তির পরিমাণ ততই বস্তুটির সমগ্র ভর-শক্তির পরিমাণের সমান হতে থাকে।

একটি পর্যবেক্ষণ থেকে করা সম্ভব হাজার হাজার হিসাব-নিকাশ। এভাবে বস্তু গিলে খাওয়ার সময় সম্ভাব্য ব্ল্যাকহোল খুঁজে পাওয়ার জন্য জ্যোতির্বিদেরা বড় আকারে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এখন পর্যন্ত অকাট্যভাবে কোনো ব্ল্যাকহোল পাওয়া যায়নি। তবে সিগনাস বা বকমণ্ডলীতে অবস্থিত একটি সিস্টেমকে বেশ সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখা যাচ্ছে। নাম সিগনাস এক্স-১। অপটিক্যাল টেলিস্কোপের মাধ্যমে একটি বৃহৎ ও উত্তপ্ত নীল দানব (blue giant) শ্রেণির তারকা দেখা গেছে। রং নীল বলেই নাম নীল দানব হয়েছে। বর্ণালি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, তারকাটি একা নয়। নিয়ম মেনে

মোচড় খাচ্ছে এটি। তার মানে, আশপাশের কোনো বস্তুর মহাকর্ষ একে সময় সময় আকর্ষণ করছে। এর অর্থ, নিশ্চিত করেই বলা চলে, এই নক্ষত্রটি এবং অপর বস্তুটি একে অপরকে খুব কাছ থেকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু অপটিক্যাল টেলিস্কোপে অপর নক্ষত্রটিকে দেখা যাচ্ছে না। হয় এটি কোনো ব্ল্যাকহোল, নয়তো খুব অনুজ্জ্বল কোনো ক্ষুদ্র তারা। ফলে মনে হচ্ছে এটি ব্ল্যাকহোল হতে পারে। তবে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না[২]।

অদৃশ্য বস্তুটির ভর থেকে পাওয়া যায় আরেকটি ইঙ্গিত। এটা নিউটনের সূত্র থেকেই বলে দেওয়া সম্ভব। এর জন্য দরকার শুধু নীল দানব তারাটির ভর জানা। নক্ষত্রের ভর ও রঙের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে সেটাও সহজেই বের করে ফেলা যায়। নীল তারাদের উত্তাপ খুব বেশি। ফলে তাদের ভরও বেশি। হিসাব থেকে ধারণা করা যায়, অদৃশ্য সঙ্গী তারকাটির ভর কয়েক সৌরভরের সমতুল্য। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এটি সাধারণ ছোট ও অনুজ্জ্বল কোনো তারা নয়। তার মানে, এটি কোনো সংকুচিত ভারী নক্ষত্রই হবে। শ্বেত বামন, নিউট্রন নক্ষত্র বা ব্ল্যাকহোল। কিন্তু কিছু মৌলিক ভৌত কারণে এত ভারী ক্ষুদ্র কোনো বস্তু শ্বেত বামন বা নিউট্রন নক্ষত্র হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে থাকার কথা তীব্র মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র, যা বস্তুটিকে গুটিয়ে ফেলতে চাইবে। সম্পূর্ণ সংকুচিত হয়ে ব্ল্যাকহোল হয়ে যাওয়া ঠেকানো যাবে, যদি কোনো প্রকার অভ্যন্তরীণ চাপ কাজ করে, যেটা মহাকর্ষের সংকোচনের বিপরীত দিকে কাজ করবে। কিন্তু সংকুচিত বস্তুটির ভর যদি হয় কয়েক সৌরভরের সমান, তবে কোনো বলের পক্ষেই এর দুমড়ে যাওয়া ঠেকানো সম্ভব নয়। এবং নক্ষত্রটির অভ্যন্তরভাগ যদি দোমড়ানো ঠেকানোর মতো দৃঢ় হতো, তাহলে বস্তুটিতে শব্দের বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশি হয়ে যেত। কিন্তু এটা বিশেষ আপেক্ষিকতার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। ফলে বেশির ভাগ পদার্থ ও জ্যোতির্বিদের মতে, এসব পরিস্থিতিতে ব্ল্যাকহোলের জন্ম অনিবার্য।

সিগনাস এক্স-১ সিস্টেমে ব্ল্যাকহোল থাকার সপক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ এসেছে আরেকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে। এর নাম এক্স-১ দেওয়ার কারণ সিস্টেম এক্স-রের (রঞ্জন রশ্মি) একটি শক্তিশালী উৎস। কৃত্রিম উপগ্রহে থাকা সেন্সরের মাধ্যমে শনাক্ত করা যায় সেই রশ্মি। সিগনাস এক্স-১-এর অদৃশ্য বস্তুটিকে ব্ল্যাকহোল ধরে নিলে তাত্ত্বিক নমুনা এই এক্স-রেকে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। ব্ল্যাকহোলের পরিমাপকৃত মহাকর্ষ ক্ষেত্র এতই শক্তিশালী যে এটি নীল দানব তারাটি থেকে পদার্থ খুবলে নিতে পারে। ছিনতাই করা গ্যাস চলে যায় ব্ল্যাকহোলের দিকে। চিরকালের জন্য বিস্মৃতির অতলে। সিস্টেমের ঘূর্ণনের কারণে পতনশীল পদার্থগুলো ব্ল্যাকহোলের চারপাশে পাক খাবে। তৈরি হবে চাকতির মতো একটি আকৃতি। এমন একটি

চাকতির পক্ষে পুরোপুরি স্থিতিশীল হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, কেন্দ্রের দিকে থাকা পদার্থ প্রান্তের দিকে অবস্থিত পদার্থের তুলনায় অনেক দ্রুত প্রদক্ষিণ করবে। সান্দ্র বল[৩] এই বিষম ঘূর্ণনকে মসৃণ করার চেষ্টা করবে। ফলে গ্যাসের উত্তাপ বেড়ে যাবে। এত বেশি যে সেটা সাধারণ আলোর বদলে এক্স-রে নির্গত করবে। এতে করে গ্যাসের যে কক্ষীয় শক্তি ব্যয় হবে, তার ফলে তা ধীরে ধীরে সর্পিল পথে ব্ল্যাকহোলের দিকে প্রবেশ করবে।

ফলে সিগনাস এক্স-১ সিস্টেমে ব্ল্যাকহোল থাকার প্রমাণ বেশ কিছু যুক্তির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। কাজে লাগছে পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্ব দুটোই। জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণা বর্তমান সময়ে এমনই হয়। একটিমাত্র প্রমাণ জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে না। সিগনাস এক্স-১ ও একই রকম আরও অনেকগুলো সিস্টেম নিয়ে যাচাই-বাছাই করে মনে হচ্ছে ব্ল্যাকহোল আছে। নিঃসন্দেহে ব্ল্যাকহোলের উপস্থিতির ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নির্ভেজাল।

আরও বড় ব্ল্যাকহোলরা এর চেয়েও দারুণ কর্মকাণ্ড করতে পারে। বর্তমানে বেশির ভাগ ছায়াপথের কেন্দ্রেই সুপারম্যাসিভ বা অতিভারী ব্ল্যাকহোল থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। এর প্রমাণ হলো, এসব ছায়াপথের কেন্দ্রমণ্ডলের তারাগুলোর দ্রুত চলাচল। দেখে মনে হচ্ছে, তারাগুলো একটি তীব্র আকর্ষণধর্মী ও খুব ক্ষুদ্র বস্তুর দিকে চলে যাচ্ছে। হিসাব-নিকাশ থেকে এ রকম সম্ভাব্য বস্তুদের ভর এক কোটি থেকে এক শ কোটি পর্যন্ত পাওয়া গেছে। ফলে আশপাশের যেকোনো বিচ্ছিন্ন বস্তুকে গোগ্রাসে গিলবে এরা। সম্ভবত নক্ষত্র, গ্রহ, গ্যাস, ধুলা কেউই এ দানবদের থাবা থেকে বাঁচতে পারে না। এই পতন প্রক্রিয়ার উন্মাদনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরো ছায়াপথের কাঠামোই বদলে দেয়। সক্রিয় ছায়াপথ কেন্দ্রের (active galactic nuclei) বহু রূপভেদের সঙ্গে পরিচয় আছে জ্যোতির্বিদদের। কোনো কোনো ছায়াপথের চেহারা দেখে তো মনে হয় মাত্র বিস্ফোরণ ঘটল। কিছু কিছু আবার বেতার তরঙ্গ, এক্স-রে বা শক্তির অন্য রূপের শক্তিশালী উৎস। তবে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো ঘটনা হলো, কিছু কিছু গ্যালাক্সি আবার গ্যাসের তীব্র জেট বা ফোয়ারা নিক্ষেপ করে। এবং এই ফোয়ারার দৈর্ঘ্য হাজার হাজার এমনকি মিলিয়ন মিলিয়ন মাইলজুড়েও বিস্তৃত থাকে। এদের কোনো কোনোটির শক্তির উদ্‌গিরণ খুবই বিস্ময়কর। যেমন বহু দূরের কোনো কোনো কোয়াসার মাত্র এক আলোকবর্ষ চওড়া এলাকা থেকে হাজার হাজার গ্যালাক্সির সমান শক্তি উদ্‌গিরণ করতে পারে। ফলে দূর থেকে দেখে এদের নক্ষত্রের মতো লাগে। কোয়াসার নামটাই কোয়াসি-স্টেলার কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। মানে নক্ষত্রের মতো বস্তু।

বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, তীব্রভাবে আলোড়িত এসব বস্তুর কেন্দ্রে পরিচালকের আসনে বসে আছে আবর্তনশীল বড় বড় ব্ল্যাকহোল, যারা তাদের আশপাশ থেকে পদার্থ ছিনতাই করে চলেছে। ব্ল্যাকহোলের কাছে আসা যেকোনো তারা হয় ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষের প্রভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, অথবা অন্য তারার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে তছনছ হয়ে যাবে। ছিন্নভিন্ন পদার্থগুলো সম্ভবত উত্তপ্ত গ্যাসের একটি চাকতি গঠন করবে, যা ব্ল্যাকহোলকে কেন্দ্র করে ঘুরবে ও ক্রমেই ভেতরের দিকে প্রবেশ করবে। যেমনটা হয়েছে সিগনাস এক্স-১-এর ক্ষেত্রে। তবে এখানে চাকতির আকৃতিটা হবে আরও অনেক বেশি বড়। ১৯৯৪ সালের মে মাসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, হাবল স্পেস টেলিস্কোপ এম৮৭ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে খুব দ্রুত ঘূর্ণনশীল গ্যাসের একটি চাকতি দেখতে পেয়েছে। পর্যবেক্ষণের শক্ত ইঙ্গিত হলো, ওখানে আছে একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল।

সম্ভবত ব্ল্যাকহোলে পতনশীল গ্যাসের চাকতি থেকে নির্গত বিপুল পরিমাণ শক্তি হোলের ঘূর্ণন অক্ষ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ফলে প্রায়ই দুই বিপরীত দিকে দুটি ভিন্ন জেট তৈরি হতে দেখা যায়। এই শক্তি নির্গমন ও জেট তৈরির প্রক্রিয়া সম্ভবত খুব জটিল। এতে তড়িৎ-চুম্বকত্ব, সান্দ্র, মহাকর্ষসহ অন্যান্য বল কাজ করে। বিষয়টিতে ব্যাপক তাত্ত্বিক ও পর্যবেক্ষণগত গবেষণার অবকাশ আছে।

মিল্কিওয়ের কী অবস্থা তাহলে? আমাদের ছায়াপথটিও কি একইভাবে আলোড়িত হতে পারে? মিল্কিওয়ের কেন্দ্র প্রায় ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে আছে। অবস্থান আকাশের ধনুমণ্ডলীতে (Sagittarius)। এর ভেতরের এলাকাগুলো বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও ধুলা দ্বারা ঢেকে আছে। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কাজে লাগিয়েছেন এক্স-রে, গামা রশ্মি ও অবলোহিত আলোর যন্ত্র। এভাবে একটি নিবিড় ঘন ও তেজস্বী বস্তু খুঁজে পাওয়া গেল—নাম স্যাজাইটেরিয়াস এ স্টার। ব্যস, কয়েক শ কোটি কিলোমিটারের বেশি নয় (মহাজাগতিক মাপকাঠিতে ছোটই খুব)। তবু এটিই ছায়াপথের সবচেয়ে শক্তিশালী বেতার উৎস। একই জায়গায় আবার আছে একটি শক্তিশালী অবলোহিত উৎসও। পাশেই আছে একটি ভিন্নধর্মী এক্স-রে বস্তু। পরিস্থিতি খুব জটিল হলেও মনে হচ্ছে এখানে অন্তত একটি ভারী ব্ল্যাকহোল আছে, যেটি পর্যবেক্ষণে পাওয়া কিছু ঘটনার পেছনে দায়ী।

তবে ব্ল্যাকহোলটির ভর সম্ভবত বড়জোর এক কোটি সৌরভরের সমান। তার মানে, সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলদের মধ্যে অবস্থান একেবারে নিচের দিকে। কিছু কিছু গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে তীব্র শক্তি ও পদার্থ নির্গমনের এমন কোনো প্রমাণ নেই। তবে হতে পারে সেখানকার ব্ল্যাকহোল এখন সুপ্ত

অবস্থায় আছে। ভবিষ্যতের কোনো একসময় যদি এটি আরও বেশি পরিমাণ গ্যাসের সরবরাহ পায়, তাহলে হয়তো জ্বলে উঠবে। অন্যদের মতো এতটা আলোড়ন হয়তো এটি না-ও তুলতে পারে। সর্পিল বাহুতে থাকা গ্রহ ও নক্ষত্রের ওপর এই প্রজ্বলনের কী প্রতিক্রিয়া হবে, তা স্পষ্ট নয়।

আশপাশের অঞ্চলের পদার্থ ফুরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ব্ল্যাকহোল গিলে নেওয়া খাবারের নিশ্চল ভরের শক্তি নির্গত করতে থাকবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি বেশি পদার্থ পেটে যাবে ব্ল্যাকহোলের। ফলে ব্ল্যাকহোল ক্রমেই বড় হবে। খিদেও বাড়বে সঙ্গে সঙ্গে। এমনকি বহু দূরের কক্ষপথের নক্ষত্ররাও শেষ পর্যন্ত এর শিকারে পরিণত হবে। এর কারণ মহাকর্ষীয় বিকিরণ। এই প্রতিক্রিয়া খুব দুর্বল হলেও মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি এর ওপরই নির্ভর করে।

১৯১৫ সালে সার্বিক আপেক্ষিকতা দাঁড় করানোর ঠিক পরপরই আইনস্টাইন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলেন। তত্ত্বের ক্ষেত্র সমীকরণগুলো বিশ্লেষণ করে তিনি দেখলেন, তরঙ্গের মতো একধরনের মহাকর্ষীয় আলোড়নের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে, শূন্যস্থানে যেটি আলোর বেগে ছড়িয়ে পড়ে। এই মহাকর্ষীয় বিকিরণ মনে করিয়ে দেয় আলো ও বেতারতরঙ্গের মতো তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের কথা। তবে বিপুল পরিমাণ শক্তি বহন করলেও তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। মহাকর্ষীয় বিকিরণ পদার্থকে আলোড়িত করে তুলনামূলক কম তীব্রতায়। যেখানে তারের জালের মতো নাজুক বস্তুও বেতার তরঙ্গকে শোষণ করে নিতে পারে, সেখানে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এত দুর্বল প্রতিক্রিয়া করে যে পৃথিবী ভেদ করেও চলে যেতে পারে। এবং বলতে গেলে একটুও তীব্রতা না কমিয়েই। আপনি যদি কোনো মহাকর্ষীয় লেজার বানান, তাহলে ১ কিলোওয়াটের একটি বৈদ্যুতিক কুণ্ডলীর সমান কর্মদক্ষতায় এক কেটলি পানি গরম করতে হলে ১ লাখ কোটি কিলোওয়াট শক্তির রশ্মি লাগবে। প্রকৃতির জানা বলগুলোর মধ্যে মহাকর্ষীয় অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল বলেই এখানেও ঘটছে তার প্রতিফলন। যেমন একটি পরমাণুর বৈদ্যুতিক শক্তি ও মহাকর্ষীয় শক্তির অনুপাত প্রায় $১০^{-৪০}$। আমরা যে মহাকর্ষ অনুভব করছি তার একমাত্র কারণ হলো বলটির প্রভাব ক্রমবর্ধমান। ফলে গ্রহদের মতো বস্তুর ক্ষেত্রে এর ভূমিকাই প্রকট হয়ে ওঠে।

মহাকর্ষ তরঙ্গের প্রতিক্রিয়া যে শুধু অতিমাত্রায় দুর্বল, এমন নয়। এর উৎপত্তিও ঘটে নীরবে নীরবে। তত্ত্ব বলছে, এ বিকিরণ উৎপন্ন হয় ভর আলোড়িত হলে। যেমন সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর গতি অবিরত সারি সারি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ উৎপন্ন করছে। কিন্তু মোট উৎপন্নক্ষমতা মাত্র এক মিলিওয়াট। এই শক্তি হ্রাসের ফলে পৃথিবীর কক্ষপথ একটু একটু করে ছোট

হয়ে যাচ্ছে। তবে সেটা হচ্ছে ধীরে। প্রতি ১০ বছরে ১ সেন্টিমিটারের ১ কোটি কোটি ভাগ হারে।

তবে যেসব ভারী বস্তু আলোর খুব কাছাকাছি বেগে চলাচল করে, তাদের কথা আলাদা। মহাকর্ষীয় বিকিরণের প্রতিক্রিয়ার পেছনে দুটি বিষয় কাজ করতে পারে। একটি হলো আকস্মিক ও উত্তাল ঘটনা। সুপারনোভা বিস্ফোরণ। যার মাধ্যমে একটি নক্ষত্র গুটিয়ে ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়। এমন ঘটনার ফলে অল্প সময়ের জন্য মহাকর্ষীয় বিকিরণের সংকেত তৈরি হতে পারে। স্থায়িত্ব হতে পারে মাত্র কয়েক মিলিসেকেন্ড এবং সাধারণত $১০^{৪৪}$ জুল শক্তি নির্গত হতে পারে। (এর সঙ্গে সূর্যের তাপ উৎপাদনের তুলনা করে দেখতে পারেন। সেটা হলো সেকেন্ডে ৩×১০^{২৬} জুল।)

আরেকটি ঘটনা হলো, উচ্চগতির ভারী বস্তুদের একে অপরের চারপাশে প্রদক্ষিণ। যেমন কাছাকাছি অবস্থানে থাকা দুটি নক্ষত্রের বাইনারি সিস্টেম থেকে অনবরত বিপুল মাত্রায় মহাকর্ষ বিকিরণ নির্গত হবে। এ প্রক্রিয়া ভালো কাজ করবে যদি দুটি প্রদক্ষিণরত নক্ষত্র সংকুচিত বস্তু হয়। এই যেমন নিউট্রন নক্ষত্র বা ব্ল্যাকহোল। ইগলমণ্ডলীর (Aquila) দুটি নিউট্রন নক্ষত্র মাত্র কয়েক মিলিয়ন কিলোমিটার দূর থেকে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত শক্তিশালী যে আট ঘণ্টার মধ্যেই একটি ঘূর্ণন সম্পন্ন হয়। ফলে নক্ষত্রগুলো মোটামুটি আলোর কাছাকাছি বেগ নিয়েই চলছে। এই দ্রুতগতির কারণে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ নির্গমনের হারও বেশি। ফলে প্রতিবছর তাদের কক্ষপথ উল্লেখযোগ্য হারে (প্রায় ৭৫ মাইক্রোসেকেন্ড) ছোট হচ্ছে। এই হার ক্রমেই বাড়তে থাকবে। এখন থেকে ৩০ কোটি বছর পর তারা একে অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

জ্যোতির্বিদদের হিসাবমতে, প্রতি ছায়াপথে প্রায় প্রতি এক লাখ বছরে একটি বাইনারি জগৎ এভাবে মিশে যায়। এরা এতটা নিবিড় ও এদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এতটা শক্তিশালী যে এরা শেষ মুহূর্তে মিশে যাওয়ার আগের মুহূর্তে প্রতি সেকেন্ডে একে অপরকে হাজার হাজারবার ঘুরে আসবে। মহাকর্ষ তরঙ্গের নির্গমনও হুট করে বেড়ে যাবে। আইনস্টাইনের সূত্র বলছে, এই শেষ অবস্থায় মহাকর্ষীয় শক্তির উৎপাদন হবে অনেক বেশি। কক্ষপথ খুব দ্রুত ছোট হয়ে যাবে। পারস্পরিক মহাকর্ষীয় টানের ফলে নক্ষত্রের চেহারা একদম বদলে যাবে। ফলে একে অপরকে স্পর্শ করার সময় তাদেও ঘূর্ণমান অতিকায় চুরুটের মতো দেখাবে। দুটোর একীভবন হবে এক উত্তাল ঘটনা। দুটো নক্ষত্র জোড়া লেগে একটি জটিল ও উন্মত্ত ভরে পরিণত হবে। এ থেকেও নির্গত হবে কাঁড়ি কাঁড়ি মহাকর্ষ তরঙ্গ। শেষ পর্যন্ত এটি প্রায় গোলকের রূপ ধারণ করবে। একটি বড় ঘণ্টার মতো করে নির্দিষ্ট নকশার কম্পন নিয়ে

বাজবে ও আন্দোলিত হবে। এই স্পন্দন থেকেও কিছু মহাকর্ষ বিকিরণ বের হবে। ফলে বস্তুটি আরও কিছু শক্তি হারাবে। আস্তে আস্তে এটি শান্ত হয়ে আসবে। আর শেষে নীরব হয়ে যাবে।

শক্তি ক্ষয়ের হার তুলনামূলক ধীর হলেও মহাবিশ্বের কাঠামোর ওপর মহাকর্ষীয় বিকিরণ নির্গমনের বড় দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কাজ করে। ফলে বিজ্ঞানীদের জন্য বড় একটি কাজ হলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহাকর্ষীয় বিকিরণের ধারণাগুলোর সত্যতা যাচাই করা। ইগলমণ্ডলীর বাইনারি নিউট্রন নক্ষত্র ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্লেষণ চালিয়ে দেখা গেছে, কক্ষপথ ছোট হচ্ছে আইনস্টাইনের তত্ত্ব মেনেই। ফলে মহাকর্ষীয় বিকিরণ নির্গমনের ক্ষেত্রে এটি একটি সরাসরি প্রমাণ। তবে আরও নিশ্চিত হতে হলে পৃথিবীর কোনো পরীক্ষাগারে একে শনাক্ত করতে পারতে হবে। মহাকর্ষ তরঙ্গ ধরার জন্য বহু গবেষক দল যন্ত্র বানিয়েছে। তবে আজ পর্যন্ত কোনো যন্ত্রই এ তরঙ্গ ধরার মতো সংবেদনশীল হতে পারেনি। মহাকর্ষীয় বিকিরণের নিশ্চিত প্রমাণ পেতে হলে আমাদের সম্ভবত নতুন প্রজন্মের ডিটেক্টরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে[৪]।

দুটো নিউট্রন নক্ষত্রের মিলনে একটি বড় নিউট্রন নক্ষত্র বা ব্ল্যাকহোল তৈরি হতে পারে। একটি নিউট্রন নক্ষত্র ও একটি ব্ল্যাকহোল বা দুটি ব্ল্যাকহোল মিলে অবশ্যই একটি ব্ল্যাকহোল তৈরি করবে। বাইনারি নিউট্রন নক্ষত্রদের মতোই এ ক্ষেত্রেও কিছু মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শক্তি ক্ষয় হবে। সঙ্গে থাকবে বাজনা ও কম্পন। মহাকর্ষ তরঙ্গের ক্ষমতা কমার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রক্রিয়াও ধীর হয়ে আসবে।

ব্ল্যাকহোলের মিলন থেকে যে মহাকর্ষীয় শক্তি সংগ্রহ করা যাবে, তার তাত্ত্বিক আলোচনা বেশ আকর্ষণীয়। ১৯৭০-এর দশকে এই তাত্ত্বিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন রজার পেনরোজ, স্টিফেন হকিং, ব্র্যান্ডন কার্টার, রেমো রাফিনি, ল্যারি স্মার প্রমুখ। যদি ব্ল্যাকহোল দুটি অঘূর্ণনশীল ও একই ভরের হয়, তাহলে মোট ভর-শক্তির প্রায় ২৯ শতাংশ সংগ্রহ করা যাবে। আধুনিক প্রযুক্তি বা অন্য কোনো কৌশল কাজে লাগাতে পারলে হয়তো ওই শক্তিটুকু শুধু মহাকর্ষীয় বিকিরণ হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তবে প্রাকৃতিকভাবে ব্ল্যাকহোলের মিলন ঘটে গেলে বেশির ভাগ শক্তিই কিন্তু এই প্রায় অদৃশ্য রূপ ধরেই আসবে। ব্ল্যাকহোলরা যদি পদার্থবিদ্যার আইনে অনুমোদিত সর্বোচ্চ হারে (প্রায় আলোর বেগে) একে অপরের উল্টো দিকে ঘুরে মিলিত হয়, তাহলে ৫০ ভাগ ভর-শক্তি নির্গত হবে।

অবশ্য তাত্ত্বিকভাবে এত বেশি পরিমাণটাও সর্বোচ্চ সীমা নয়। ব্ল্যাকহোলের আবার বৈদ্যুতিক চার্জও থাকতে পারে। একটি চার্জিত ব্ল্যাকহোলের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র যেমন থাকে, তেমনি থাকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। দুটি ক্ষেত্রই শক্তি ধারণ

করতে পারে। ধনাত্মক চার্জধারী একটি ব্ল্যাকহোল ঋণাত্মক চার্জধারী অপর একটি ব্ল্যাকহোলের সঙ্গে মিলিত হলে কিছু শক্তি নির্গত হয়। এই প্রক্রিয়ায় তড়িৎ-চুম্বকীয় এবং মহাকর্ষীয়—দুই রকম শক্তিই বেরিয়ে আসে।

এই নির্গমনের একটি সীমা আছে। কারণ, একটি নির্দিষ্ট ভরের একটি ব্ল্যাকহোল কেবল একটি সর্বোচ্চ সীমার বৈদ্যুতিক চার্জ বহন করতে পারে। একটি অঘূর্ণনশীল ব্ল্যাকহোলের জন্য সেই সীমা নির্ধারিত হয় এভাবে : দুটো অবিকল একই রকম ব্ল্যাকহোলের কথা ভাবুন। এদের চার্জ একই। কৃষ্ণগহ্বরদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ফলে এদের মধ্যে আকর্ষণ কাজ করবে। অন্যদিকে, তড়িৎ বলের কারণে কাজ করবে বিকর্ষণ (সমধর্মী চার্জ বিকর্ষণ করে)। চার্জ ও ভরের অনুপাত একটি সংকট মানে পৌঁছালে এই দুই বিপরীতধর্মী বল একে অপরের সমান হয়ে যায়। ফলে কৃষ্ণগহ্বরদের মধ্যে কোনো নেট বল থাকবে না। একটি কৃষ্ণগহ্বরের সর্বোচ্চ কী পরিমাণ বৈদ্যুতিক চার্জ থাকতে পারবে, তা এই শর্তের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। হয়তো ভাবছেন, কৃষ্ণগহ্বরের চার্জ এর চেয়ে বেশি করার চেষ্টা করলে কী ঘটবে? এটা করার একটি উপায় হলো কৃষ্ণগহ্বরে আরও বেশি চার্জ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক চার্জ বাড়বে। কিন্তু বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ ঠেকাতে যে কাজ সম্পন্ন হবে, তাতে কিছু শক্তি ব্যয় হবে। এই শক্তিটুকুও কৃষ্ণগহ্বরে প্রবেশ করবে। যেহেতু শক্তিও ভরের আরেক রূপ ($E=mc^2$ সূত্রটি মনে আছে নিশ্চয়ই), ফলে কৃষ্ণহ্বর ভারী ও বড় হয়ে যাবে। সহজেই হিসাব করে দেখানো যায়, এই প্রক্রিয়ায় ভর চার্জের চেয়ে বেশি বাড়ে। ফলে চার্জ ও ভরের অনুপাত আসলে কমে যায়। আর এই সীমা অতিক্রম করার প্রচেষ্টাও হয় ব্যর্থ।

একটি চার্জিত কৃষ্ণগহ্বরের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র এর মোট ভরের কিছু অংশের জোগান দেয়। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ চার্জ ধারণকারী কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র থেকে আসে অর্ধেক ভর। যদি দুটি আবর্তনহীন কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে বিপরীত চিহ্নের সর্বোচ্চ চার্জ থাকে, তাহলে তারা একে অপরকে মহাকর্ষীয় বল দ্বারা আকর্ষণ করবে, আবার বৈদ্যুতিক বল দ্বারাও আকর্ষণ করবে। তারা মিলিত হয়ে গেলে ঈবদ্যুতিক চার্জ প্রশমিত হয়ে যাবে। বৈদ্যুতিক চার্জ বেরও করে নেওয়া যাবে। তাত্ত্বিকভাবে এটা ওই সিস্টেমের মোট ভরের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

শক্তি সংগ্রহের পরম সর্বোচ্চ সীমা অর্জন করা সম্ভব হবে, যদি দুটি ব্ল্যাকহোলই আবর্তন করতে থাকে আর যদি তাদের বৈদ্যুতিক চার্জ হয় বিপরীতধর্মী। তাহলে মোট ভরশক্তির দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নির্গত হবে। এটা ঠিক যে এই মানগুলোর গুরুত্ব আছে শুধু তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই। কারণ, বাস্তব একটি ব্ল্যাকহোলের অনেক বেশি বৈদ্যুতিক চার্জ থাকার সম্ভাবনা খুব

কম। তা ছাড়া দুটি ব্ল্যাকহোল যে আদর্শ উপায়েই মিলিত হবে, সে সম্ভাবনাও কম; যদি না কোনো উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী জাতি সেটা ঘটাতে সক্ষম হয়। তবে দুটি ব্ল্যাকহোল যদি খুব বেশি আদর্শ উপায়ে মিলিত না-ও হয়, তবুও সম্ভবত প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে শক্তি নির্গত হবে। দুটি বস্তুর মিলিত ভরশক্তির উল্লেখযোগ্য একটি অংশ শক্তিই এভাবে নির্গত হবে। এটাকে বহু বছর ধরে চলতে থাকা নক্ষত্রের নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে নক্ষত্র মাত্র ১ শতাংশ শক্তি নির্গত করে।

এই মহাকর্ষীয় ঘটনা একটি দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফিউশন বিক্রিয়ার জ্বালানি শেষ হয়ে গেলেই যে একটি নক্ষত্র একেবারে মারা যায়, তা কিন্তু নয়। একটি সংকুচিত অঙ্গারে পরিণত হওয়ার পর একটি উজ্জ্বল গ্যাসীয় গোলক আকারে নক্ষত্রটি ফিউশন বিক্রিয়ার চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণ শক্তি নির্গত করার ক্ষমতা রাখে। বিষয়টি ভালো করে বোঝা গেছে প্রায় ২০ বছর আগে। এ ধারণা কাজে লাগিয়ে পদার্থবিদ ও ব্ল্যাকহোল শব্দের জনক জন হুইলার একটি সভ্যতার কথা কল্পনা করেছেন, যারা তাদের উত্তরোত্তর শক্তির চাহিদার কথা বিবেচনা করে নিজেদের নক্ষত্রের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে একটি ঘূর্ণনশীল ব্ল্যাকহোলের পাশে বাড়ি বানিয়েছে। প্রতিদিন তারা তাদের বর্জ্যগুলো ট্রাকে ভর্তি করে খুব হিসাব করে বানানো পথে ব্ল্যাকহোলের দিকে পাঠিয়ে দেয়। ব্ল্যাকহোলের কাছে এসে ট্রাকের পদার্থগুলো ঢেলে দেওয়া হয়। এভাবে চিরকালের জন্যে বর্জ্যগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়।

পতনশীল বস্তুগুলো ব্ল্যাকহোলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় হোলের উল্টো দিকে আবর্তন করে। ফলে ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণন কিঞ্চিত বাধাগ্রস্ত হয়। আর তার ফলে ব্ল্যাকহোলের এই ঘূর্ণনশক্তিটুকু বেরিয়ে আসে। ফলে উন্নত সভ্যতার মানুষেরা তাঁদের শিল্পকারখানায় সেই শক্তি ব্যবহার করতে পারেন[৫]। ফলে এই পদ্ধতির দুটো লাভ। সব বর্জ্য চিরতরে বিদায় হলো। কিন্তু বিদায় হওয়ার সময় দিয়ে গেল মূল্যবান অনেকখানি শক্তি। এভাবে ওই সভ্যতার মানুষেরা প্রয়োজনের আলোকে একটি মৃত নক্ষত্র থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন। যতটা শক্তি নক্ষত্রটি তার পুরো আলোকোজ্জ্বল[৬] জীবনেও নির্গত করেনি।

এটা ঠিক যে ব্ল্যাকহোল থেকে শক্তি সঞ্চয়ের বিষয়টাকে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি মনে হচ্ছে। তবে প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর পরিমাণ পদার্থের অনিবার্য ঠিকানা কিন্তু ব্ল্যাকহোল। সেটা হতে পারে দুভাবে। হয় পদার্থগুলো এমন এক নক্ষত্রের উপাদান, যেটি সংকুচিত হয়ে ব্ল্যাকহোলে পরিণত হতে যাচ্ছে। অথবা পদার্থগুলো কোনোভাবে ব্ল্যাকহোলের মধ্যে চলে যাবে। ব্ল্যাকহোল নিয়ে লেকচার দিতে গেলেই মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে, কোনো কিছু ব্ল্যাকহোলে চলে গেলে তার কী ঘটে? অল্প কথায় উত্তর হলো, আমরা জানি

না। বলা চলে, ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে আমাদের জানার একমাত্র উপায় তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও গাণিতিক মডেলিং। একটু আগে যেটা বললাম, এটাও।

ব্ল্যাকহোলের সংজ্ঞা অনুসারেই কিন্তু আমরা বাইরে থেকে এর ভেতরের কিছু দেখতে পাই না। অতএব, আমাদের ব্ল্যাকহোল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের সুযোগ থাকলেও (যেটা আসলে আমাদের নেই) এর ভেতরটায় কী চলছে, সেটা আমরা কখনো জানব না। তবে এ ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আমাদের আশার আলো দেখায়। ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বের কথাও জানিয়েছিল এই তত্ত্বই। কোনো নভোচারী ব্ল্যাকহোলের ভেতরে চলে গেলে কী ঘটবে, তত্ত্বটির মাধ্যমে আমরা সেটা অনুমান করতে পারি। এখন আমরা এই তাত্ত্বিক ফলাফলগুলোর সারমর্মই দেখব।

ব্ল্যাকহোলের পৃষ্ঠ আসলে নিছকই একটি গাণিতিক কাঠামো। সত্যিকার কোনো পৃষ্ঠের কিন্তু কোনো অস্তিত্ব নেই। আছে শুধুই ফাঁকা স্থান। পতনশীল নভোচারী ভেতরে প্রবেশের সময় বিশেষ কিছুই দেখবেন না। তারপরও পৃষ্ঠের কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ও কিছুটা চমকপ্রদ ভৌত (physical) তাৎপর্য আছে। হোলের ভেতরে মহাকর্ষ এত শক্তিশালী যে আলোও সেখানে আটকে আছে। বের হতে ইচ্ছুক আলোর ফোটন কণা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তার মানে, ব্ল্যাকহোল থেকে আলো বেরিয়ে আসতে পারে না। আর এ কারণেই বাইরে থেকে ব্ল্যাকহোলকে দেখা যায় না। আর কোনো বস্তু বা তথ্য আলোর চেয়ে জোরে ছুটতে পারে না বলে একবার এর সীমানায় প্রবেশ করে ফেললে কোনো কিছুই আর সেখান থেকে বের হতে পারে না। যেসব ঘটনা ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরে ঘটবে, তা চিরকালই বাইরের দর্শকের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যাবে। এ কারণে ব্ল্যাকহোলের পৃষ্ঠকে[৭] বলা হয় ঘটনা দিগন্ত (event horizon)। কারণ, এই দিগন্ত ব্ল্যাকহোলের ভেতরে ও বাইরে ঘটা ঘটনাকে আলাদা করে দেয়। দিগন্তের ভেতরের ঘটনা আমরা দেখি না। দেখি বাইরের ঘটনা। তবে দৃষ্টির আড়াল হওয়ার বিষয়টি কিন্তু একমুখী। ব্ল্যাকহোলের ভেতরের নভোচারীকে আমরা না দেখলেও নভোচারী কিন্তু ভেতর থেকে বাইরের মহাবিশ্ব দেখতে পাবেন।

নভোচারী যতই ভেতরে যাবেন, মহাকর্ষের থাবা ততই বাড়বে। এর একটি প্রভাব হলো শারীরিক বিকৃতি। নভোচারীর পা প্রথমে ব্ল্যাকহোলে প্রবেশ করলে মাথার চেয়ে পা এর কেন্দ্রের বেশি কাছে থাকবে। ফলে মহাকর্ষের শক্তি পায়ে বেশি অনুভূত হবে। ফলে, পায়ে নিচের দিকে তীব্র টান অনুভূত হবে। এ কারণে নভোচারীর শরীর দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয়ে যাবে। একই সঙ্গে এবং একই দিকে কিন্তু নভোচারীর ঘাড়েও টান পড়বে। ফলে ভদ্রলোক চিকনও হয়ে যাবেন। এই যে লম্বা ও চিকন হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া, একে অনেক সময় বলা হয় স্প্যাঘেটিফিকেশন বা সেমাই প্রভাব (spaghettification)।

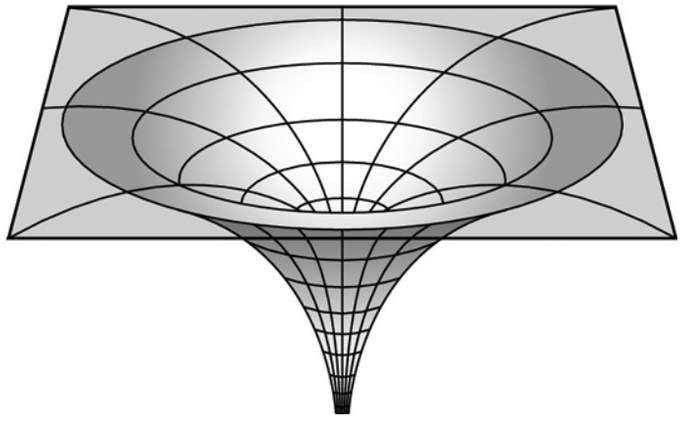

চিত্র ৫.২

বক্রতার একেবারে কেন্দ্রে আছে ব্ল্যাকহোলের সিঙ্গুলারিটি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ব্ল্যাকহোল স্থান-কালকে যেভাবে বাঁকিয়ে দেয়, তার ফলে বাইরে থেকে ভেতরে যাওয়া যায়, কিন্তু ভেতর থেকে বাইরে নয়।

তত্ত্ব বলছে, ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রে মহাকর্ষ হয়ে যায় সীমাহীন। আর মহাকর্ষের বহিঃপ্রকাশ তো ঘটে স্থান-কালের বক্রতার মাধ্যমে। ফলে মহাকর্ষ শক্তিশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থান-কালের বক্রতাও হয়ে যায় সীমাহীন। গণিতের ভাষায় এ অবস্থার নাম স্পেসটাইম সিঙ্গুলারিটি। এটা হলো স্থান-কালের এমন একটি সীমানা বা প্রান্ত, যাতে স্থান-কালের সাধারণ ধারণার কোনো স্থান নেই। বহু পদার্থবিদের বিশ্বাস, ব্ল্যাকহোলের ভেতরের সিঙ্গুলারিটি সত্যিকার অর্থেই স্থান-কালের কবর রচনা করে। কোনো বস্তু এখানে পৌঁছে গেলে ধ্বংস অনিবার্য। আসলেই যদি সেটা হয়, তাহলে নভোচারীর শরীর চলে যাবে সিঙ্গুলারিটিতে। তীব্র সেই প্রভাবের কাজটিতে সময় লাগবে মাত্র এক ন্যানোসেকেন্ড[৮]।

আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথে থাকা সম্ভাব্য ব্ল্যাকহোলের ভর এক কোটি সৌরভরের সমান। এমন ভরের ও অঘূর্ণনশীল কোনো ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রে ঘটনা দিগন্ত থেকে সিঙ্গুলারিটিতে গিয়ে পটল তুলতে সময় লাগবে প্রায় তিন মিনিট। এই শেষ তিন মিনিট (লাস্ট থ্রি মিনিটস) মোটেও আরামদায়ক হবে না। বাস্তবে আসলে সিঙ্গুলারিটিতে যাওয়ার বহু আগেই সেমাই প্রভাবের কারণে বেচারা মারা পড়বেন। এই শেষ সময়ে নভোচারী মহাশয়

কোনোভাবেই প্রাণঘাতী সিঙ্গুলারিটিকে চোখে দেখতে পারবেন না। কারণ, এই বিন্দুটি থেকে কোনো আলো আসতে পারে না। ব্ল্যাকহোলটির ভর যদি মাত্র এক সৌরভরের সমান হয়, তাহলে এর ব্যাসার্ধ হবে প্রায় তিন কিলোমিটার। এ ক্ষেত্রে ঘটনা দিগন্ত থেকে সিঙ্গুলারিটিতে পৌঁছাতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড[৯]।

পতনশীল নভোচারীর প্রসঙ্গ কাঠামো থেকে ধ্বংস হতে সময় লাগে খুব কম সময়। তবে ব্ল্যাকহোলের সময়ের বিকৃতিটা এমনভাবে ঘটে যে দূর থেকে দেখলে নভোচারীর শেষের দিকের ভ্রমণ খুব ধীরে চলছে বলে মনে হবে। নভোচারী ঘটনা দিগন্তের যত কাছে যাবেন, দূরের দর্শকের কাছে নভোচারীর আশপাশের ঘটনাগুলো তত বেশি ধীরে চলছে বলে মনে হতে থাকবে। এবং আসলে মনে হবে, নভোচারীর ঘটনা দিগন্তে পৌঁছাতে অসীম পরিমাণ সময় লাগছে। ফলে বাইরের দুনিয়ায় যেটাকে অসীম সময় মনে হচ্ছে, নভোচারী সেটার শিকার হচ্ছেন মুহূর্তের মধ্যেই। এই দিক থেকে ভাবলে ব্ল্যাকহোল আসলে মহাবিশ্বের শেষ প্রান্তের একটি দরজা। একটি মহাজাগতিক অন্ধগলি। বের হওয়ার এমন এক পথ, যে পথ নিয়ে যাবে না কোনো ঠিকানায়। ব্ল্যাকহোল স্থানের খুব ছোট্ট একটি অঞ্চল, যেখানে সময়ের ইতি ঘটে। যাঁরা মহাবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক, একটি ব্ল্যাকহোলে ঝাঁপ দিয়ে সেটা তাঁরা নিজেরাই জেনে নিতে পারবেন।

এটা ঠিক যে মহাকর্ষই প্রকৃতির সবচেয়ে দুর্বল বল। কিন্তু এর তীক্ষ্ণভেদী ও সম্মিলিত ক্রিয়ার ওপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ। বিচ্ছিন্ন মহাজাগতিক বস্তু কিংবা সমগ্র মহাবিশ্ব দুটোর জন্যই এই কথা প্রযোজ্য। যে তীব্র মহাকর্ষীয় আকর্ষণ একটি নক্ষত্রে গুটিয়ে ফেলে, সেই একই মহাকর্ষ কাজ করে সার্বিকভাবে মহাবিশ্বের আরও বড় মাপকাঠিতেও। এই আকর্ষণের ফল খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ভর করে আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য উপস্থিত বস্তুর পরিমাণের ওপর। সেটা জানতে হলে আমাদের মহাবিশ্বের ওজন পরিমাপ করতে হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. বাস্তবে করা অসম্ভব বা কঠিন, এমন ক্ষেত্রে বিশেষত কম্পিউটারের সাহায্যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করার নাম সিমুলেশন। যেমন কম্পিউটার প্রোগ্রামে ব্ল্যাকহোলের নমুনা বানানো। কোনো তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করার জন্য অনেক সময় কম্পিউটার সিমুলেশন করে ডেটা তৈরি করা হয়। গণিত ও পরিসংখ্যানে এর ব্যবহার খুব বেশি। তবে

কম্পিউটার ছাড়াও সিমুলেশন হয়। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের অনুশীলন করানোর জন্য কাঠের নকল ঘোড়ার প্রচলন ছিল। আজকাল বাসায় দৌড়ানোর জন্যে ট্রেডমিল খুব জনপ্রিয়। নকল দৌড়ের এ পদ্ধতিও কিন্তু একধরনের সিমুলেশন।

২. বর্তমানে সিগনাস এক্স-১-এর ব্ল্যাকহোল হওয়ার ব্যাপারে ব্যাপক স্বীকৃতি রয়েছে।
৩. প্রবাহীর (তরল বা গ্যাস) বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে উদ্ভূত বল।
৪. ২০১৫ সালে মহাকর্ষ তরঙ্গ প্রথম সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। নিশ্চিত হয়ে ঘোষণা দেওয়া হয় ২০১৬ সালে। ২০১৭ সালে এ বিষয়ে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কিপ থর্নসহ তিনজন বিজ্ঞানী।
৫. এটার সঙ্গে মিল আছে বাস্তবে প্রয়োগ করা একটি কৌশলের। নাম গ্র্যাভিটেশনাল স্লিংশট। পৃথিবী থেকে দূর মহাকাশে যান প্রেরণের সময় একে এক বা একাধিক গ্রহের কক্ষপথের খুব কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আগে থেকে থাকা নিজস্ব বেগের কারণে গ্রহটির মহাকর্ষ মহাকাশযানকে পুরোপুরি আটকে ফেলতে পারে না। মহাকাশযান পরে আবার সংশ্লিষ্ট বস্তুর মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে আসে বস্তুটির মহাকর্ষীয় শক্তির একটা অংশ। এভাবে নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেয় যান। তবে সংশ্লিষ্ট গ্রহের শক্তি ক্ষয় হয় খুব নগণ্য পরিমাণ।
৬. অর্থাৎ, নক্ষত্রটি যখন ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আলো দিত।
৭. মনে রাখতে হবে, এই পৃষ্ঠ কিন্তু নিছক গাণিতিক একটা সীমা। বাস্তব কোনো পৃষ্ঠ নয়।
৮. এক ন্যানোসেকেন্ড হলো ১ সেকেন্ডের ১০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ।
৯. এক মাইক্রোসেকেন্ড হলো ১ সেকেন্ডের ১০ লাখ ভাগের ১ ভাগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাবিশ্বের ওজন পরিমাপ

প্রায়ই বলা হয়, ওপরে যে যায়, তাকে নিচে নামতেই হবে। আকাশের দিকে ছুড়ে মারা কোনো বস্তু মহাকর্ষের টানে আটকা পড়ে। বাধ্য হয় নিচে নেমে আসতে। কিন্তু সব সময় তা হয় না। যথেষ্ট জোরে চললে বস্তুটির পক্ষে পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে চিরতরে মুক্তি পেয়ে মহাশূন্যে চলে যাওয়া সম্ভব। ফিরে আসতে হবে না আর কখনো। যেসব রকেটের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রহে যান পাঠানো হয়, সেগুলো এই বেগ (মুক্তি বেগ) অর্জন করে।

পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই মুক্তি বেগের মান সেকেন্ডে প্রায় ১১ কিলোমিটার। ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল। এই বেগ কনকর্ড বিমানের ২০ গুণের বেশি। এই সংকট মান পৃথিবীর ভর (এতে যতটুকু পদার্থ আছে) ও ব্যাসার্ধ দুটোর ওপরই নির্ভর করছে। একটি নির্দিষ্ট ভরের বস্তু যত ছোট হবে, এর পৃষ্ঠে মহাকর্ষ তত বেশি শক্তিশালী হবে। সৌরজগৎ থেকে বের হতে পারার অর্থ হলো, সূর্যের মহাকর্ষকে জয় করা। এ ক্ষেত্রে মুক্তি বেগের মান সেকেন্ডে ৬১৮ কিলোমিটার। আমাদের মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা ছায়াপথ থেকে বের হতেও সেকেন্ডে কয়েক শ কিলোমিটার বেগ লাগবে। অন্যদিকে, একটি নিউট্রন নক্ষত্রের মতো ঘনবস্তু থেকে বের হয়ে যেতে সেকেন্ডে কয়েক অযুত কিলোমিটার বেগ প্রয়োজন। আর ব্ল্যাকহোল থেকে বের হতে তো লাগবে আলোর চেয়ে (সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার) বেশি বেগ।

আর মহাবিশ্ব থেকে বের হতে চাইলে? দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি বলেছি, মহাবিশ্বের কোনো প্রান্ত আছে বলে মনে হয় না। ফলে বের হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমরা যদি ধরে নিই প্রান্ত আছে এবং আরও ধরা যাক, এই প্রান্ত হলো আমাদের দৃষ্টিসীমার শেষ বিন্দুতে (প্রায় দেড় হাজার আলোকবর্ষ দূরে), তাহলে মুক্তি বেগ হবে প্রায় আলোর বেগে সমান। এই ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, দেখে মনে হচ্ছে, সবচেয়ে দূরের

ছায়াপথগুলো আমাদের থেকে প্রায় আলোর বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। দেখে তো মনে হয়, ছায়াপথগুলো এত দূরে সরছে যে তারা হয়তো মহাবিশ্ব থেকে বেরই হয়ে যাবে। সেটা না হলেও একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন যেন হবেই। ফিরে আসবে না কখনো।

দেখা যাচ্ছে, প্রসারণশীল মহাবিশ্ব আসলে অনেকটাই পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত বস্তুর মতোই আচরণ করছে। যদিও মহাবিশ্বের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রান্ত নেই। প্রসারণের গতি খুব বেশি হলে সরতে থাকা ছায়াপথগুলো মহাবিশ্বের সব পদার্থের সম্মিলিত মহাকর্ষীয় বন্ধন থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আর এতে করে প্রসারণ চলবে চিরকাল। অন্যদিকে, প্রসারণ ধীর হলে একসময় মহাবিশ্বের প্রসারণ থেমে যাবে। মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে শুরু করবে। ছায়াপথগুলো তখন আবার 'নিচের দিকে' নামতে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত ঘটবে চূড়ান্ত মহাজাগতিক বিপর্যয়। পতন হবে মহাবিশ্বের।

এর মধ্যে কোনটি ঘটবে? দুটি সংখ্যার তুলনার মধ্যে এর উত্তরটি নির্ভর করছে। একটি হলো প্রসারণের গতি। আরেকটি হলো মহাবিশ্বের মোট মহাকর্ষীয় টান, যাকে আসলে মহাবিশ্বের ওজন বলা চলে। মহাকর্ষীয় টান যত বেশি হবে, সে টান অগ্রাহ্য করতে হলে মহাবিশ্বকে তত বেশি দ্রুত প্রসারিত হতে হবে। জ্যোতির্বিদেরা লোহিত সরণ প্রভাব[১] পর্যবেক্ষণ করে সরাসরি প্রসারণ হার বের করতে পারেন। কিন্তু মহাবিশ্বের ভাগ্যে কী ঘটবে, সে প্রশ্নের সমাধান হয়নি। দ্বিতীয় রাশিটি, মানে মহাবিশ্বের ওজন নিয়ে সমস্যাটা এখনো রয়ে গেছে।

মহাবিশ্বের ওজন কীভাবে জানা সম্ভব? কাজটি যথেষ্ট কঠিন মনে হতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে, এটা সরাসরি জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু মহাকর্ষ তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে আমরা এর ওজন সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। ওজনের একটি নিম্নসীমা সহজেই পাওয়া যায়। গ্রহদের ওপর সূর্যের মহাকর্ষীয় টান পরিমাপ করে সূর্যের ওজন (ভর) জানা যায়। আমরা জানি, আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে প্রায় ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি) নক্ষত্র আছে। এদের গড় ভর আমাদের সূর্যের ভরের সমান। ফলে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্যালাক্সির ন্যূনতম ভরের একটি প্রাথমিক হিসাব পাই। এবার আমাদের দেখতে হবে মহাবিশ্বে কতগুলো গ্যালাক্সি আছে। এরা সংখ্যায় এত বেশি যে এদের এক এক করে গোনা যাবে না। তবে অনুমাননির্ভর বেশ ভালো একটি হিসাব হলো ১০ বিলিয়ন (১ হাজার কোটি)। তাহলে সব মিলিয়ে দাঁড়ায় $১০^{২১}$ সৌরভর। অন্য কথায় $১০^{৪৮}$ টন। এই গ্যালাক্সিগুলোর সমাবেশের ব্যাসার্ধ ১৫ বিলিয়ন আলোকবর্ষ ধরে নিলে মহাবিশ্বের মুক্তি বেগের ন্যূনতম একটি মান পাওয়া যাবে। এই মান দাঁড়ায়

আলোর বেগের ১ শতাংশ। আমরা যদি ধরে নিই যে মহাবিশ্বের ভর শুধু নক্ষত্রের ভর হিসাব করেই পাওয়া যাবে, তাহলে মহাবিশ্ব নিজের মহাকর্ষীয় টান অগ্রাহ্য করে চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে[২]।

অনেক বিজ্ঞানীরই বিশ্বাস, মহাবিশ্বের ভাগ্যে ঠিক এটাই ঘটবে। তবে কিছু কিছু জ্যোতির্বিদ ও কসমোলজিস্ট বলছেন, ভরের সমষ্টি হয়তো সঠিকভাবে হিসাব করা হয়নি। আমরা যেসব বস্তু দেখতে পাচ্ছি, বাস্তবে বস্তু আছে তার চেয়ে বেশি। মহাবিশ্বের সব বস্তু তো আর উজ্জ্বল নয়। নক্ষত্র, গ্রহ[৩] ও ব্ল্যাকহোলের মতো অনুজ্জ্বল বস্তুরা আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। এ ছাড়া রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ধূলি ও গ্যাস, যাদের বেশির ভাগই সহজে চোখে পড়ে না। আরও কথা আছে। গ্যালাক্সির মাঝখানের স্থানও কিন্তু একেবারেই ফাঁকা নয়। পদার্থ আছে এখানটায়ও। খুব সম্ভব এখানে আছে বিপুল পরিমাণ হালকা গ্যাস।

তবে আরেকটি চমকপ্রদ সম্ভাবনাও কয়েক বছর ধরে জ্যোতির্বিদদের নজর কেড়ে রেখেছে। যে বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সূচনা, সেই বিস্ফোরণটিই আমাদের দেখা সব বস্তুর উৎস। কিন্তু আমরা দেখি না এমন কিছু বস্তুরও উৎস সেই একই বিস্ফোরণ। মহাবিশ্ব যদি অতিপারমাণবিক কণার এক উত্তপ্ত আধার হিসেবেই শুরু হয়ে থাকে, তবে সাধারণ বস্তুর উপাদান আমাদের পরিচিত ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন ছাড়া অন্য সব কণাও বিপুল পরিমাণ তৈরি হয়ে থাকবে। কণাপদার্থবিদেরা সম্প্রতি পরীক্ষাগারে এই কণাগুলো শনাক্ত করেছেন। এই কণাগুলো খুবই অস্থিতিশীল। ফলে এদের খুব দ্রুতই ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কথা। তবে এদের কিছু কিছু হয়তো আজও অবশিষ্ট আছে মহাবিশ্বের সূচনার ধ্বংসাবশেষ হিসেবে।

এই ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্যে নিউট্রিনো সবচেয়ে আকর্ষণীয়। সেই ভুতুড়ে কণাগুলো, যাদের সুপারনোভায় খুব সক্রিয় দেখা যায় (দেখুন চতুর্থ অধ্যায়)। আমরা যতটুকু জানি, তাতে নিউট্রিনোরা ক্ষয় হয়ে অন্য কিছুতে পরিণত হতে পারে না। (আসলে নিউট্রিনো আছে তিন রকমের। এক ধরনের নিউট্রিনো অন্য নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হতে পারে। এই দিকটা আপাতত আমরা বিবেচনা থেকে বাদ দিচ্ছি) ফলে বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া মহাজাগতিক নিউট্রিনো দিয়ে মহাবিশ্ব ভরপুর থাকার কথা। আদিম মহাবিশ্বে সব ধরনের অতিপারমাণবিক কণা সমানভাবে তৈরি হয়েছিল ধরে নিলে হিসাব করে জানা সম্ভব, কতগুলো মহাজাগতিক নিউট্রিনো থাকা উচিত। হিসাব করে দেখা গেল, প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে নিউট্রিনোর পরিমাণ হওয়া উচিত ১০ লাখ। অন্য কথায়, সাধারণ বস্তুর প্রতিটি কণার বিপরীতে নিউট্রিনোর সংখ্যা হওয়া উচিত প্রায় ১০০ কোটি।

দারুণ এই ফলাফলটি আমাকে সব সময় মুগ্ধ করেছে। প্রতিমুহূর্তে আপনার দেহের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন নিউট্রিনো উপস্থিত আছে, যার প্রায় সবই বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ। অস্তিত্বের একদম শুরু থেকে এরা এখনো মোটামুটি একই অবস্থায় আছে। নিউট্রিনোরা আলোর সমান বা কাছাকাছি গতিতে চলে। এ কারণে এরা মুহূর্তের মধ্যে আপনার শরীরের ভেতর দিয়ে চলে যায়। প্রতি সেকেন্ডে ১০০ বিলিয়ন নিউট্রিনো এই কাজ করে। এই অবিরাম চলাচল আমরা খেয়াল করি না, কারণ নিউট্রিনোরা সাধারণ বস্তুর সঙ্গে খুব দুর্বলভাবে ক্রিয়া করে। ফলে এদের কোনো একটি কণা আপনার দেহের মধ্যে আটকে যাবে, সেই সম্ভাবনা খুব সামান্য। কিন্তু আপাতদৃষ্টে শূন্যস্থানে এত নিউট্রিনোর উপস্থিতি মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতিতে বড় প্রভাব রাখতে পারে।

নিউট্রিনোরা খুব দুর্বলভাবে ক্রিয়া করলেও অন্য সব কণার সঙ্গে তাদের মহাকর্ষীয় বল কিন্তু কাজ করে। তারা হয়তো আশপাশের অন্য কণাকে খুব বেশি ঠেলা-ধাক্কা দিতে পারে না, কিন্তু তাদের পরোক্ষ মহাকর্ষীয় প্রতিক্রিয়া মহাবিশ্বের ওজন মাপতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাদের ভূমিকা কতটুকু, সেটা জানতে হলে জানতে হবে তাদের ভর।

মহাকর্ষ নিয়ে হিসাব করতে গেলে দরকার হয় প্রকৃত ভর, নিশ্চল ভর নয়। নিউট্রিনোদের নিশ্চল ভর যদি কমও হয়, আলোর কাছাকাছি বেগে চলার কারণে এদের ভর কিন্তু উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠবে। আবার এদের ভর শূন্যও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এরা চলবে আলোর বেগে। তাহলে তাদের শক্তির সঙ্গে তুলনা করে প্রকৃত ভর জানা যাবে। আর মহাজাগতিক ধ্বংসাবশেষ হিসেবে পাওয়া নিউট্রিনোর ক্ষেত্রে এই শক্তির হিসাব পাওয়া যাবে বিগ ব্যাং থেকে পাওয়া শক্তির অনুমিত পরিমাণ থেকে। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে শক্তি একটু দুর্বল হচ্ছে। এ কারণে মূল শক্তির পরিমাণকে সংশোধন করে নিতে হবে। তবে এই সংশোধন করে নেওয়ার পরও দেখা যাচ্ছে, শূন্য নিশ্চল ভরের নিউট্রিনোরা মহাবিশ্বের মোট ওজনে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

অন্যদিকে, নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর শূন্য কি না, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। আবার সব ধরনের নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর সমান কি না, সেটাও জানা নেই আমাদের। নিউট্রিনো সম্পর্কে বর্তমানে আমরা যা জানি তাতে এদের সসীম একটি নিশ্চল ভর থাকা অসম্ভব নয়। অতএব, পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে হবে আসলে কোনটি সঠিক। চতুর্থ অধ্যায়েও আমরা বলেছি, নিউট্রিনোর ভর থাকলেও সেটা অবশ্যই খুব সামান্য হবে। ভর হবে পরিচিত অন্য যেকোনো কণার চেয়ে কম। কিন্তু মহাবিশ্বে নিউট্রিনোর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার কারণে খুব সামান্য নিশ্চল ভরও মহাবিশ্বের মোট ওজনে বড় ভূমিকা রাখবে।

বিষয়টি খুব সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্য মেনে চলে। ইলেকট্রনের (পরিচিত কণিকাদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা) ভরের ১০ হাজার ভাগের মাত্র ১ ভাগ পরিমাণ ভরও বড় প্রভাব রাখতে সক্ষম[৪]। সে ক্ষেত্রে নিউট্রিনোদের ভর নক্ষত্রের ভরকেও ছাড়িয়ে যাবে।

এত ছোট নিশ্চল ভর শনাক্ত করা খুব কঠিন কাজ। এ-বিষয়ক বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলগুলোও ছিল বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী। তবে একটি বিষয় খুব কৌতূহলের জন্ম দেয়। '১৯৮৭এ' সুপারনোভা থেকে পাওয়া গেছে গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র। আগেই বলেছি, নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর শূন্য হলে তারা অবশ্যই সবাই আলোর সমান গতিতে চলাচল করবে। সবার গতিই কিন্তু সমান হবে এ ক্ষেত্রে। কিন্তু এদের যদি অল্প হলেও কিছু নিশ্চল ভর থাকে, তাহলে ভর নানান রকম হতে পারে। সুপারনোভা থেকে বের হওয়া নিউট্রিনোরা হবে খুব তেজস্বী। তাই এদের নিশ্চল ভর কিছুটা থাকলেও এরা চলবে আলোর খুব কাছাকাছি গতিতে। কিন্তু পৃথিবীতে এসে পৌঁছানোর আগে এরা অনেক দীর্ঘ সময় ধরে চলাচল করার কারণে পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে সময় খানিকটা কম-বেশি লাগতে পারে। '১৯৮৭এ' সুপারনোভা থেকে আসা নিউট্রিনোদের পৌঁছানোর সময়ের তারতম্য বিশ্লেষণ করে বলা যাবে নিউট্রিনোর সর্বোচ্চ নিশ্চল ভর কত হতে পারে। এবং এভাবে এটা পাওয়া গেছে ইলেকট্রনের ভরের ৩০ হাজার ভাগের প্রায় ১ ভাগ।

তবে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, বিষয়টায় জটিলতা আরও আছে। কারণ, নিউট্রিনোর প্রকারভেদ আছে একের বেশি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিশ্চল ভর বের করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী পাউলির প্রস্তাবিত নিউট্রিনো নিয়ে হিসাব করা হয়। কিন্তু পরের দ্বিতীয় আরেক ধরনের নিউট্রিনো পাওয়া গেছে। তৃতীয় আরেক ধরনের নিউট্রিনোর কথা বিগ ব্যাংয়ের সময়ের। এই তিন রকমের নিউট্রিনোই ব্যাপক আকারে তৈরি হয়ে থাকবে। এর মধ্যে বাকি দুই ধরনের নিউট্রিনোর ভরের সীমা কত হবে, তা সরাসরি বলা খুব কঠিন। পরীক্ষামূলকভাবে মানের সীমার পাল্লা অনেক বড়। তবে তাত্ত্বিকরা বলছেন, মহাবিশ্বের ভরে নিউট্রিনোর ভর সম্ভবত বড় কোনো ভূমিকা রাখছে না। নিউট্রিনোর ভর বের করার নতুন পরীক্ষামূলক পদ্ধতির আলোকে এই ধারণা বদলেও যেতে পারে।

আবার মহাবিশ্বের ওজন মাপতে গেলে আরও মাথায় রাখতে হবে, নিউট্রিনো ছাড়াও সম্ভাব্য অন্য আরও মহাজাগতিক ধ্বংসাবশেষও থাকতে পারে। বিগ ব্যাংয়ের সময় অন্যান্য স্থিতিশীল ও দুর্বলভাবে ক্রিয়া করা কণাও তৈরি হয়ে থাকতে পারে। হতে পারে সেগুলোর ভর আরও বেশি। (তবে ভর আবার বেশি হলে অপেক্ষাকৃত অল্প ভরের কণার তুলনায় এরা কম তৈরি হবে। কারণ, বেশি ভরের কণা তৈরিতে বেশি ভর লাগে) এদের সাধারণভাবে

বলা হয় উইম্প (WIMP)। কথাটার পূর্ণরূপ হলো দুর্বল মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নেওয়া ভারী কণা (Weakly Interacting Massive Particles)। বিজ্ঞানীদের প্রস্তাবিত উইম্প কণার সংখ্যা অনেক। এদের গালভরা নামও আছে। এই যেমন গ্র্যাভিটন, হিগসিনো, ফোটিনো। এরা আসলেই আছে কি না, তা কেউ জানে না। তবে আসলেই থাকলে মহাবিশ্বের ওজন মাপতে এদের ভূমিকা মাথায় রাখতেই হবে।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, উইম্প কণাদের অস্তিত্ব আছে কি না, তা সরাসরিই পরীক্ষা করে ফেলা যায়। সাধারণ পদার্থের সঙ্গে এদের মিথস্ক্রিয়ার ধরন থেকে এটা অনুমান করা যাবে। এই মিথস্ক্রিয়া খুব দুর্বল, তা সত্য। তবে বিপুল পরিমাণ উইম্প কণার ভর উল্লেখযোগ্যই হবে। চলন্ত উইম্প কণা শনাক্ত করতে উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডের একটি লবণের খনি ও সান ফ্রান্সিসকোর একটি বাঁধের কাছে এলাকাকে পরীক্ষার স্থান হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। মহাবিশ্বে এদের উপস্থিতি অনেক বেশি ধরে নিলে সব সময় এরা বিপুল সংখ্যায় আমাদের শরীর (এবং পৃথিবী) ভেদ করে চলে যাচ্ছে। এই পরীক্ষার মূলনীতি খুব দারুণ। উইম্প কণা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ধাক্কা খেলে যে শব্দ হবে, শনাক্ত করা হবে সেই শব্দ।

এর জন্য যন্ত্র বানানো হবে জার্মেনিয়াম বা সিলিকনের একটি স্ফটিক দিয়ে, যা একটি শীতলীকরণ ব্যবস্থা দিয়ে আবৃত থাকবে। উইম্প কণা স্ফটিকের নিউক্লিয়াসে আঘাত করলে এর ভরবেগের কারণে নিউক্লিয়াস পেছন দিকে ধাক্কা অনুভব করবে। এ ধাক্কার ফলে স্ফটিক ল্যাটিসে ছোট্ট একটি শব্দ তরঙ্গ বা কম্পন তৈরি হবে। তরঙ্গ প্রসারিত হতে থাকলে এর তীব্রতা একটু কমে আসবে। পরিণত হবে তাপশক্তিতে। ক্রমেই দুর্বল হতে থাকা শব্দ তরঙ্গ থেকে উৎপন্ন তাপের সূক্ষ্ম সংকেত শনাক্ত করার জন্য এ পরীক্ষার নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে। স্ফটিকের তাপমাত্রা কমিয়ে প্রায় পরম শূন্য পর্যন্ত আনা হয় বলে যেকোনো তাপশক্তির আবির্ভাবকেই ডিটেক্টর দারুণ দক্ষতার সঙ্গে শনাক্ত করে ফেলবে।

তাত্ত্বিকেরা ধারণা করছেন, কিছুটা ধীরগতিতে ছোটা ফোঁটা বা বিন্দুর মতো আকৃতির উইম্পদের ঝাঁকের মধ্যে ডুবে আছে ছায়াপথগুলো। এই উইম্পদের ভর হয়তো একটি থেকে এক হাজার প্রোটনের ভরের মাঝামাঝি। আর গড় ভর সেকেন্ডে কয়েক হাজার কিলোমিটার। আমাদের সৌরজগৎ আমাদের ছায়াপথ ঘিরে পাক খাওয়ার সময় এই অদৃশ্য জায়গা অতিক্রম করে। আর পৃথিবীর প্রতি কেজি পদার্থ প্রতিদিন এক হাজারটি পর্যন্ত উইম্প কণা বিক্ষেপ করতে পারে। এই হারে বিক্ষিপ্ত হলে উইম্প কণাকে সরাসরি খুঁজে পাওয়া কঠিন হওয়ার কথা নয়।

একদিকে উইম্প কণার খোঁজ চলছে। অন্যদিকে জ্যোতির্বিদেরা মহাবিশ্বের ভর জানার চেষ্টাও করে যাচ্ছেন। একটি বস্তুকে দেখা (বা শোনা না গেলেও) এর মহাকর্ষীয় টান কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। নেপচুন গ্রহের আবিষ্কারের কথাই ধরুন না। জ্যোতির্বিদেরা খেয়াল করলেন, অচেনা একটি বস্তুর মহাকর্ষীয় টানে ইউরেনাসের কক্ষপথে নড়চড় ঘটছে। লুব্ধক বি একটি অনুজ্জ্বল শ্বেত বামন নক্ষত্র। উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধককে কেন্দ্র করে ঘোরে সেটি। এই বি লুব্ধককেও কিন্তু এভাবেই পাওয়া গেছে। তার মানে, বস্তুর পর্যবেক্ষণযোগ্য গতি খেয়াল করে জ্যোতির্বিদেরা অদেখা বস্তুরও চিত্র আঁকতে পারেন। (আমি আগেই বলেছি, কীভাবে এই পদ্ধতিতে সিগনাস-১ বস্তুটিকে ব্ল্যাকহোল হিসেবে অনুমান করা হয়েছিল।)

আমাদের ছায়াপথে নক্ষত্ররা কীভাবে চলছে, সে বিষয়ে গত এক বা দুই দশকে খুব নিবিড়ভাবে গবেষণা হয়েছে। সাধারণত নক্ষত্ররা মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রকে ২০ কোটি বছরের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে প্রদক্ষিণ করে। ছায়াপথের আকৃতি কিছুটা চাকতির মতো। কেন্দ্রের দিকে নক্ষত্রের ঘনত্বটা একটু বেশি। ফলে সৌরজগতের সূর্য ও গ্রহের সম্পর্কের মতো প্রায় একই রকম একটি ব্যাপার আছে এখানে। তবে সৌরজগতে বুধ ও শুক্রের মতো পৃথিবী থেকেও ভেতরের দিকের গ্রহগুলো ইউরেনাস বা নেপচুনের মতো বাইরের দিকের গ্রহদের চেয়ে জোরে চলে। এর কারণ হলো, ভেতরের দিকের গ্রহগুলো সূর্যের মহাকর্ষীয় টান বেশি অনুভব করে। আমরা হয়তো আশা করব, ছায়াপথের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি এমনই হবে। চাকতির বাইরের দিকের নক্ষত্রগুলো কেন্দ্রের দিকের নক্ষত্রদের তুলনায় অনেক ধীরে ঘোরা উচিত।

কিন্তু পর্যবেক্ষণ বলছে ভিন্ন কথা। চাকতিজুড়েই নক্ষত্রদের বেগ প্রায় সমান। ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যেতে পারে, ছায়াপথের ভর হয়তো কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত নয়, বরং ছায়াপথজুড়ে সমভাবে বিস্তৃত। ছায়াপথের চেহারা দেখে মনে হয়, ভর কেন্দ্রেই পুঞ্জীভূত। তবে আলোকোজ্জ্বল অংশ হয়তো পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখাচ্ছে না। এটা স্পষ্ট যে প্রচুর পরিমাণ অন্ধকার বা অদৃশ্য বস্তু রয়েছে। এর বড় একটি অংশের অবস্থান চাকতির বাইরের দিকে। আর এটাই সেদিকের নক্ষত্রের বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার চাকতির উজ্জ্বল তলের বাইরে খালি চোখে অদৃশ্য ডার্ক ম্যাটারও থাকতে পারে প্রচুর। এটা হলে আকাশগঙ্গা ঢাকা থাকে বিশাল ভারী এক অদৃশ্য বলয় দিয়ে। এই বলয় আন্তছায়াপথীয় স্থানের অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্য ছায়াপথেও একই রকম বিন্যাস চোখে পড়ে। হিসাব বলছে, (সূর্যের তুলনায়) উজ্জ্বলতা দেখে যতটা মনে হয় ছায়াপথের দৃশ্যমান অংশ গড়ে তার ১০ গুণের বেশি অঞ্চলজুড়ে

বিস্তৃত। সবচেয়ে বাইরের দিকে অঞ্চলে আবার এই বিস্তৃতি পাঁচ হাজার গুণ পর্যন্তও হতে পারে।

ছায়াপথগুচ্ছের মধ্যে ছায়াপথের চলাচলের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। পরিষ্কার কথা : কোনো ছায়াপথ যথেষ্ট বেগে চললে সেটি ছায়াপথ গুচ্ছের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। গুচ্ছের সব ছায়াপথ এই বেগে ঘুরলে গুচ্ছ ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসবে। কোমামণ্ডলে আছে কয়েক শ ছায়াপথ নিয়ে গড়া একটি আদর্শ ছায়াপথ পুঞ্জ। এটি নিয়ে অনেক বেশি গবেষণা হয়েছে। এই গুচ্ছে ছায়াপথগুলোর গড় গতিবেগ এতটা বেশি যে এদের পক্ষে এক অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার কথা নয়। এটা একমাত্র সম্ভব যদি ছায়াপথে উজ্জ্বল বস্তুদের ভরের চেয়ে অন্তত কয়েক শ গুণ ভর বেশি উপস্থিত থাকে। কোমা গুচ্ছকে অতিক্রম করতে একটি সাধারণ ছায়াপথের মাত্র প্রায় ১০০ কোটি বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে এত দিনে গুচ্ছটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। সেটা কিন্তু ঘটেনি। উপরন্তু, গুচ্ছে কাঠামো দেখে খুব ভালোভাবে মনে হচ্ছে, এটি মহাকর্ষের বন্ধনে আবদ্ধ আছে। কোনো এক ধরনের ডার্ক ম্যাটার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উপস্থিত আছে হয়তো, যা ছায়াপথের গতিকে প্রভাবিত করছে।

মহাবিশ্বের বড় পরিসরের গঠন থেকে অদেখা বস্তু সম্পর্কে আরও একটি ধারণা পাওয়া যায়। বড় পরিসর বলতে আমরা বুঝি ছায়াপথের ক্লাস্টার (গুচ্ছ) ও সুপারক্লাস্টারদের গুচ্ছবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বলেছি, ছায়াপথের বিস্তৃতি অনেকটা ফেনার মতো। ছড়িয়ে পড়া আঁশের মতো। কিংবা বিশাল শূন্যতাকে ঘিরে থাকা চাদরের মতো। বিগ ব্যাংয়ের এরপর যতটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে তাতে এমন গুচ্ছবদ্ধ ও ফেনিল কাঠামো গড়ে ওঠার কথা নয়। তবে এটা হতে পারে, যদি কোনো অনুজ্জ্বল বস্তু বাড়তি মহাকর্ষ সরবরাহ করে। কম্পিউটার সিমুলেশনের সাহায্যে এখন পর্যন্ত সরল কোনো ডার্ক ম্যাটারের বা গুপ্তবস্তুর ধারণা ব্যবহার করে এ রকম ফেনিল কোনো কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয়নি। হতে পারে আরও কোনো জটিল উপাদান রয়েছে মহাবিশ্বে।

ডার্ক ম্যাটারের রহস্য বুঝতে বিজ্ঞানীরা এখন ব্যতিক্রমী কিছু কণার খোঁজ করছেন। তবে ডার্ক ম্যাটার পরিচিতি বস্তুর আকারেও থাকতে পারে। সেটা হতে পারে গ্রহের আকারের অনুজ্জ্বল নক্ষত্র। এমন অন্ধকার বস্তু হয়তো আমাদের অজান্তেই ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের চারপাশের মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি জ্যোতির্বিদেরা দৃশ্যমান বস্তুদের সঙ্গে মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ অন্ধকার বস্তুদের খুঁজে পাওয়ার একটি উপায় বের করেছেন। এ কৌশলে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতার একটি ফলাফল ব্যবহার করা হয়। নাম গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং (Gravitational lensing) বা মহাকর্ষীয় বক্রতা।

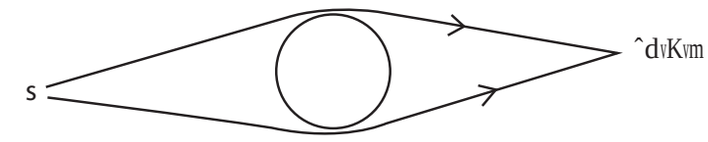

চিত্র ৬.১

মহাকর্ষীয় লেন্স। দূরবর্তী উৎস S থেকে আসা আলো ভারী বস্তুর প্রভাবে বেঁকে যায়। অনুকূল ক্ষেত্রে এটি আলোকে কেন্দ্রীভূত করে। ফোকাস বিন্দুতে থাকা পর্যবেক্ষক বস্তুর চারপাশে আলোর একটি বলয় দেখতে পাবেন।

আমরা জানি, মহাকর্ষ আলোকে বাঁকিয়ে দিতে পারে। আইনস্টাইন বলেছিলেন, দূরের নক্ষত্রের আলো সূর্যের কাছ দিয়ে আসার সময় কিছুটা বেঁকে যাবে। এর ফলে আকাশে নক্ষত্রটির আপাত-অবস্থান একটু পাল্টে যাবে। আশপাশে সূর্যের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির প্রভাব লক্ষ করে এই পূর্বাভাস যাচাই করে দেখা যায়। কাজটি প্রথম করেন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ আর্থার এডিংটন। ১৯১৯ সালে। দারুণভাবে তিনি আইনস্টাইনের বক্তব্যটি প্রমাণ করেন।

লেন্সও আলোকরশ্মিকে বাঁকিয়ে দেয়। এর ফলে এরা আলোকে কেন্দ্রীভূত করে বিম্ব (ছবি) তৈরি করতে পারে। একটি ভারী বস্তু যথেষ্ট প্রতিসম হলে লেন্সের মতোই আচরণ করবে। কেন্দ্রীভূত করবে দূরের উৎস থেকে আসা আলোকে। এমন একটি ঘটনা ৬.১ চিত্রে দেখানো হয়েছে। উৎস S থেকে আলো একটি গোলকীয় বস্তুর কাছে এসে পড়লে বস্তুর মহাকর্ষ এর পাশের আলোকে বাঁকিয়ে দিচ্ছে। ফলে আলোকরশ্মিগুলো দূরের আরেকটি বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হচ্ছে। বেশির ভাগ বস্তুর ক্ষেত্রেই লেন্সিং বা বক্রতার প্রভাব খুব সামান্য। তবে বিশাল দূরত্বের ক্ষেত্রে আলোর চলার পথের সামান্যটুকু বক্রতাও উল্লেখযোগ্য ফোকাস তৈরি করবে। বস্তুটা যদি পৃথিবী ও দূরবর্তী উৎসের মাঝখানে থাকে, তাহলে উৎসের খুব উজ্জ্বল একটি ছবি দেখা যাবে। আবার কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে দৃষ্টিরেখা জায়গামতো পড়লে আলোর উজ্জ্বল বৃত্তও দেখা যেতে পারে। একে বলা হয় আইনস্টাইন বলয় (Einstein ring)। আরও জটিল বস্তুর ক্ষেত্রে লেন্সিংয়ের ফলে একটির বদলে অনেকগুলো ছবি তৈরি হবে। মহাজাগতিক মাপকাঠিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষীয় বক্রতার অনেকগুলো উদাহরণ খুঁজে পেয়েছেন। পৃথিবী ও দূরবর্তী কোয়াসারের প্রায় নিখুঁত অবস্থানে কোয়াসারের

অনেকগুলো ছবি তৈরি হয়। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বৃত্তচাপ। কিছু ক্ষেত্রে আবার কোয়াসারের পুরো বৃত্তও দেখা যায়।

অদৃশ্য গ্রহ ও অনুজ্জ্বল বামন নক্ষত্র খুঁজতে গিয়ে জ্যোতির্বিদেরা এমন বক্রতার সন্ধান করেন। বস্তুটা পৃথিবী ও দূরের কোনো নক্ষত্রের মাঝে থাকলে বক্রতা সেই খবর বলে দেবে। দৃষ্টিরেখা থেকে অদেখা বস্তুটির নড়াচড়ার কারণে নক্ষত্রের উজ্জ্বলতায় দৃশ্যমান ওঠানামা চোখে পড়বে। বস্তুটা নিজে অদৃশ্য হলেও লেন্সিংয়ের মাধ্যমে এর প্রভাব বোঝা যাবে। এই কৌশল কাজে লাগিয়ে কিছু বিজ্ঞানী আকাশগঙ্গা ছায়াপথের হ্যালোতে (halo) অদৃশ্য বস্তুর খোঁজ করছেন। অবশ্য দূরবর্তী নক্ষত্রের সঙ্গে অবস্থান একই রেখায় না হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম হলেও অদৃশ্য বস্তুর সংখ্যা বেশি হলে মহাকর্ষীয় বক্রতা দেখা যাবেই। ১৯৯৩ সালের কথা। অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের একটি দল নিউ সাউথ ওয়েলসের মাউন্ট স্ট্রোমলো পর্যবেক্ষণকেন্দ্র থেকে লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউড ছায়াপথের নক্ষত্রদের দেখছিলেন। মহাকর্ষীয় বক্রতার প্রথম সত্যিকার নিদর্শন তাঁরাই খুঁজে পান। এটা ছিল আমাদের ছায়াপথের হ্যালোতে থাকা একটি বামন নক্ষত্রের লেন্সিং।

ব্ল্যাকহোলরাও মহাকর্ষীয় লেন্স হিসেবে কাজ করে। ছায়াপথের বাইরের বেতার উৎস ব্যবহার করে এমন ব্ল্যাকহোলকে ব্যাপকভাবে খোঁজা হয়েছে। (আলোক তরঙ্গের মতো একইভাবে বেতার তরঙ্গও বেঁকে যায়।) অবশ্য সম্ভাব্য বস্তু পাওয়া গেছে খুব কমই। এটা থেকে মনে হচ্ছে, নাক্ষত্রিক বা অতিভারী ব্ল্যাকহোলরা হয়তো ডার্ক ম্যাটারের জন্য খুব বেশি দায়ী নয়।

তবে সব লেন্সিংয়ের জরিপে সব ব্ল্যাকহোল কিন্তু দেখাও যাবে না। আবার এটাও সম্ভব যে বিগ ব্যাং-পরবর্তী চরম অবস্থায় আণুবীক্ষণিক (microscopic) ব্ল্যাকহোলের জন্ম হয়ে থাকবে। এদের আকার হবে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চেয়ে ছোট। এ ক্ষেত্রে এদের ভর হবে একটি সাধারণ গ্রহাণুর ভরের সমান। এভাবেও প্রচুর পরিমাণ ভর অদৃশ্য থাকতে পারে। এই ভর ছড়িয়েও থাকবে পুরো মহাবিশ্বে। শুনতে অবাক লাগলেও এই অদ্ভুত বস্তুগুলোর ভরেরও একটি নির্দিষ্ট সীমা বের করা সম্ভব। কৌশলটার নাম হলো হকিং প্রভাব (Hawking effect)। ৭ম অধ্যায়ে আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত জানব। সংক্ষেপে বলা যায়, আণুবীক্ষণিক ব্ল্যাকহোলরা বিস্ফোরিত হয়ে একঝাঁক বৈদ্যুতিক চার্জগ্রস্ত কণা তৈরি করতে পারে। এই বিস্ফোরণ ঘটে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর। এটা নির্ভর করে ব্ল্যাকহোলের সাইজের ওপর। ছোট ব্ল্যাকহোলরা বিস্ফোরিত হয় দ্রুত। একটি গ্রহাণুর সমান ভরের ব্ল্যাকহোল বিস্ফোরিত হয় এক হাজার কোটি বছর পার হলে। তার মানে, বর্তমান সময়ের কাছাকাছি সময়। এই বিস্ফোরণের একটি প্রভাব হবে হঠাৎ করে বেতার তরঙ্গের সৃষ্টি। বেতার

জ্যোতির্বিদেরা বিষয়টি যাচাইও করে দেখেছেন। তবে এমন সম্ভাব্য কোনো সংকেত পাওয়া যায়নি। হিসাব করে দেখা গেছে, প্রতি ৩০ বছরে প্রতি ঘন আলোকবর্ষ জায়গায় এমন বিস্ফোরণ একটির বেশি ঘটা সম্ভব নয়[৫]। এর অর্থ হলো, মহাবিশ্বের মোট ভরের খুব সামান্য একটি অংশই আণুবীক্ষণিক ব্ল্যাকহোলগুলো থেকে পাওয়া যাবে।

আরেকটি কথা হলো, মহাবিশ্বে ডার্ক ম্যাটারের পরিমাণ নিয়েও একেক জ্যোতির্বিদের একেক মত। মহাবিশ্বের প্রসারণ ঠেকাতে যতটুকু ঘনত্ব প্রয়োজন, ঠিক তার চেয়ে কম ন্যূনতম ভরকে বলা হয় সংকট ঘনত্ব (critical density)। হিসাব করে এর ভর পাওয়া গেছে দৃশ্যমান ভরের প্রায় ১০০ গুণ। টেনেটুনে হলেও এ পরিমাণ ভরের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। আশা করতে হবে, ডার্ক ম্যাটারের অনুসন্ধান থেকে শিগগির নির্দিষ্ট ইতিবাচক বা নেতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। আর যা-ই হোক, মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে এর ওপর।

আমাদের বর্তমান জ্ঞানের আলোকে আমরা বলতে পারি না মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হবে কি না। যদি একসময় এটি সংকুচিত হতে শুরু করে, তবে প্রশ্ন দাঁড়াবে, সেটা কখন? এটা বলতে হলে জানতে হবে মহাবিশ্বের ভর সংকট-ভরের চেয়ে কতটা বেশি। যদি এটা শতকরা ১ ভাগ বেশি হয়, তাহলে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন (বা এক লাখ কোটি) বছর পর মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে শুরু করবে। আবার যদি সেটা শতকরা ১০ ভাগ বেশি হয়, তাহলে সংকোচন শুরু হয়ে যাবে এখন থেকে ১০ হাজার কোটি বছর পরই[৬]।

তবে কোনো কোনো তাত্ত্বিক আবার মনে করেন, শুধু হিসাব-নিকাশ করেই মহাবিশ্বের ভর বের করে ফেলা সম্ভব। তাঁদের মতে, কষ্ট করে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের কোনো প্রয়োজন নেই। নিছক যুক্তির ক্ষমতা ব্যবহার করেই যে মানুষ মহাজাগতিক জ্ঞানও আহরণ করে ফেলতে পারে, এমন বিশ্বাস গ্রিক দার্শনিকদেরও ছিল। আধুনিক যুগেও কিছু কসমোলজিস্ট মহাবিশ্বের ভরকে গণিতের ছকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে, গভীর কোনো নীতিমালা মহাবিশ্বের ভরের একটি নির্দিষ্ট মান সরবরাহ করবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে তাক লেগে যায় সেই সিস্টেমগুলো দেখে, যেগুলো দিয়ে মহাবিশ্বের কণার সংখ্যার সঠিক পরিমাণ সাংখ্যিক সূত্র দিয়ে বের করা যায়।

বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এমন চিন্তাগুলো দেখতে-শুনতে দারুণ হলেও বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই এগুলো পছন্দ করেন না। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আরেকটি জোরালো তত্ত্ব একটু জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এটি মহাবিশ্বের ভর সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট পূর্বাভাস দিতে পারছে। তত্ত্বটি হলো তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত স্ফীতি তত্ত্ব।

স্ফীতি তত্ত্বের একটি পূর্বাভাস হলো মহাবিশ্বে উপস্থিত বস্তুর পরিমাণ নিয়ে। ধরা যাক, মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে সংকট-ভর ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশি বা অনেক কম মান নিয়ে। স্ফীতি যুগ শুরু হলে ঘনত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। তত্ত্বের ভাষ্যমতে, ঘনত্ব সংকট ঘনত্বের মানের খুব কাছে চলে আসে। মহাবিশ্ব যত বেশি সময় ধরে স্ফীত হতে থাকে, ঘনত্ব ততই সংকট মানের কাছাকাছি হতে থাকে। তত্ত্বটির আদর্শ নমুনা অনুসারে, স্ফীতি যুগের মেয়াদ ছিল খুব সামান্য। তাই অলৌকিক কিছু না ঘটে থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় মহাবিশ্বের ঘনত্ব সংকট ঘনত্বের ঠিক সমান হওয়ার কথা নয়। সামান্য কম-বেশি হবেই।

তবে স্ফীতির সময় ঘনত্বের মান সংকট মানের দিকে যেতে থাকে সূচকীয় হারে[৭]। ফলে ঘনত্বের চূড়ান্ত মান সংকট মানের চেয়ে একটু বেশি হতে পারে। স্ফীতি যুগ যদি সেকেন্ডের খুব সামান্য এক ভগ্নাংশ সময় পরিমাণও টিকে থাকে, তবুও এটাই হওয়ার কথা। এখানে সূচকীয় বলতে বোঝানো হচ্ছে, স্ফীতির প্রায় প্রতি একক বাড়তি সময়ের জন্যে বিগ ব্যাং ও মহাবিশ্বের সংকোচন পর্যায়ের মধ্যে সময় দ্বিগুণ হবে। ফলে ১০০ একক স্ফীতি সংকোচনে ১০ হাজার কোটি বছর দেরি হবে। আবার ১০১টি একক স্ফীতির জন্য সংকোচন শুরু হবে ২০ হাজার কোটি বছর পরে। এবং ১১০ একক স্ফীতির জন্য সংকোচন শুরু হবে এক লাখ কোটি বছর পর।

স্ফীতি যুগ কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল? কেউ সেটা জানে না। তবে যেসব মহাজাগতিক ধাঁধার কথা আমি বলেছি, সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে স্ফীতির সময় ন্যূনতম কয়েক একক (প্রায় ১০০, যদিও মানটি এদিক-সেদিক হতে পারে) হতেই হয়। তবে কোনো ঊর্ধ্ব সীমা নেই। ধরুন, কাকতালীয়ভাবে এমন ঘটেছে যে আমাদের বর্তমান পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করার জন্যে স্ফীতির যে ন্যূনতম একক দরকার, ঠিক ততটাই হয়েছিল। সে ক্ষেত্রেও স্ফীতির পরও ঘনত্ব সংকট ভরের চেয়ে অনেক বেশি (বা কম) হবে। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণ থেকে সংকোচন যুগ বের করতে পারার কথা। অথবা সংকোচন না হয়ে থাকার কথা থাকলে সেটাও বোঝা যাবে। তবে স্ফীতি ন্যূনতম সময়ের চেয়ে আরও অনেক বেশি সময় ধরে চলার সম্ভাবনাই অনেক বেশি। এর ফলে ঘনত্বের মান হবে সংকট মানের খুব কাছাকাছি। তার মানে, মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে থাকলেও সেটা আরও বহুকাল পরের কথা। মহাবিশ্বের বর্তমান বয়সের চেয়েও বেশি সময় লাগবে তাতে। সেটাই হয়ে থাকলে মানুষ কখনোই নিজের মহাবিশ্বের ভবিষ্যতটাই জানবে না।

তথ্যনির্দেশ

১. ক্রমেই দূরে সরতে থাকা বস্তুর একটি ফলাফল হলো লোহিত সরণ প্রভাব (red shift)। মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সব গ্যালাক্সি আমাদের থেকে দূরে সরে যায়। এ কারণে এদের থেকে আসা দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় হয়ে যায়। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়। আর সবচেয়ে কম নীল আলোর। গ্যালাক্সিরা দূরে সরতে সরতে এদের থেকে আসা আলো বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রে লাল দিকে চলে আসে। এটারই নাম লোহিত সরণ। আবার উল্টো দিকে কোনো গ্যালাক্সি বা অন্য কোনো বস্তু কাছে এলে তার আলো চলে যায় নীল দিকে। স্বাভাবিকভাবেই একে বলা হয় নীল সরণ (blue shift)।

২. কারণ, মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে বহু গ্যালাক্সি এখনই আলোর কাছাকাছি, এমনকি বেশি বেগেও ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে। মুক্তি বেগ আলোর মাত্র ১ শতাংশ হলে সে প্রসারণ থামার কোনো কারণ নেই। মহাকর্ষের টানকে অগ্রাহ্য করে পিছিয়ে না এসে দূরে চলে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বেগকেই কিন্তু মুক্তি বেগ বলা হয়।

৩. রাতের আকাশে হাজার হাজার নক্ষত্র দেখলেও খালি চোখে কিন্তু আমরা মাত্র পাঁচটি গ্রহ দেখতে পাই। মানে, সৌরজগতের সব গ্রহই কিন্তু খালি চোখে দেখা সম্ভব হয় না। মনে হতে পারে, টেলিস্কোপ দিয়েও অনেক গ্রহ দেখতে পাই। আসলে টেলিস্কোপ দিয়েও নক্ষত্রদের তুলনায় গ্রহ ঢের কম দেখা যায়। আকারে ছোট হওয়ার কারণে ও নিজস্ব আলো না থাকায় দূরের গ্রহদেরকে টেলিস্কোপে পেতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়। ২০২০ সালের ১ অক্টোবর পর্যন্ত মাত্র ৪ হাজার ৩৫৪টি বহির্গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। যেখানে নক্ষত্রের অবস্থান উল্লেখ করা বিভিন্ন তালিকায়ই লাখো নক্ষত্রের নাম আছে।

৪. ইলেকট্রনের প্রকৃত ভর ৯.১০৯ × ১০$^{-৩১}$ কেজি। মানে দশমিকের পর ৩০টি শূন্য দিয়ে ৯১০৯ লিখলে যে সংখ্যাটি হবে।

৫. ঘনমিটার যেমন বস্তু বা স্থানের আয়তন পরিমাপে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি ঘন আলোকবর্ষ একক দিয়েও স্থানের আয়তন পরিমাপ করা যায়। আলো এক বছরে যতটুকু যায়, সেটা হলো এক আলোকবর্ষ। তার মানে, আলোকবর্ষ সময়ের একক নয়, বরং দূরত্বের একক। এবার ঘনকের মতো একটি কক্ষের কথা চিন্তা করুন। এবার এই কক্ষের দৈর্ঘ্যকে এক আলোকবর্ষ ভাবুন। তাহলে এই কক্ষটির আয়তনই হবে এক ঘন আলোকবর্ষ।

৬. সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ বলছে, মহাবিশ্ব আবার গুটিয়ে যাবে, সে সম্ভাবনা খুব কম। তবে গুটিয়ে যাবেই না, সেটা বলা যাচ্ছে না।

৭. আমরা গাণিতিক ও জ্যামিতিক হারের সঙ্গে পরিচিতি। সূচকীয় হার জ্যামিতিক হারেরই একটি রূপ। গাণিতিক হার বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। জ্যামিতিক হার মানে প্রতিবার বাড়ার পর যে মান দাঁড়াবে তার ভিত্তিতে বাড়া। আর সূচকীয় হারও জ্যামিতিক হার। তবে এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পরপরের বদলে প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি ঘটে। যেমন ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি। আরও জানতে দেখুন-statmania.info।

সপ্তম অধ্যায়

চিরকাল একটি দীর্ঘ সময়

অসীম নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি শুধুই একটি বড় সংখ্যা নয়। বৈশিষ্ট্যগতভাবে প্রকাণ্ড রকম ও অকল্পনীয়ভাবে বড় কিছুর চেয়ে অসীম একেবারেই আলাদা। ধরুন, মহাবিশ্ব চিরকাল ধরে প্রসারিত হচ্ছে, যার নেই কোনো শেষ। চিরকাল টিকে থাকার অর্থ হবে এর আয়ু হবে অসীম। এমন ক্ষেত্রে যেকোনো ভৌত প্রক্রিয়া (physical process) কোনো না কোনো সময় ঘটবেই। চাই তা যতই ধীরগতির কিংবা অসম্ভাব্য হোক না কেন। যেমনিভাবে একটি বানর অনন্তকাল ধরে এলোপাতাড়ি কি-বোর্ড চাপতে থাকলে একসময় না একসময় উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বইগুলো লেখা হয়ে যাবেই।

মহাকর্ষ তরঙ্গ নির্গমনের ঘটনা থেকে ভালো একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। এটা নিয়ে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে কথা বলেছি। শুধু প্রকাণ্ড বড় কোনো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই মহাকর্ষীয় বিকিরণের মাধ্যমে শক্তি ক্ষয় থেকে দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন ঘটবে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরার ফলে তরঙ্গ নির্গত হয় প্রায় ১ মিলিওয়াট। পৃথিবীর গতির ওপর এর প্রভাব অবিশ্বাস্যরকম ক্ষুদ্র (infinitesimal)। কিন্তু এতটুকু শক্তির ক্ষয়ও ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন[১] বছর ধরে চলতে থাকলে একসময় পৃথিবী সর্পিল পথ বেয়ে সূর্যে গিয়ে ধাক্কা খাবে। হ্যাঁ, তার আগেই সূর্য পৃথিবীকে গিলে খেয়ে ফেলার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু কথা হলো, যে সময়কালটা মানুষের সময়ের হিসাবে খুব নগণ্য কিন্তু অল্প অল্প করে হলেও অবিরত থাকে, সেটাই একসময় প্রকট হয়ে উঠে ভৌত ব্যবস্থার (physical system) ভবিষ্যৎ ঠিক করে দিতে পারে।

এখন থেকে অনেক অনেক সময় পরের মহাবিশ্বের অবস্থার কথা একটু চিন্তা করি। আজ থেকে এক হাজার কোটি কোটি কোটি (মানে ১ পর ২৪টি শূন্য) বছর পরের কথাই ধরুন না। সব নক্ষত্র জ্বালানি ফুরিয়ে আলোহীন হয়ে গেছে।

মহাবিশ্বটা এখন অন্ধকার। কিন্তু ফাঁকা নয়। বিশাল শূন্যতার এখানে-সেখানে রয়েছে ঘুরন্ত কৃষ্ণগহ্বরগুলো। রয়েছে দলছুট নিউট্রন নক্ষত্র। আর রয়েছে কালো বামন (black dwarf)। ও! আছে কিছু গ্রহের অবশেষও। এই সময় এই বস্তুগুলো একে অপরের থেকে থাকবে অনেক অনেক দূরে। মহাবিশ্ব তত দিনে প্রসারিত হয়ে এর বর্তমান আকারের ১০ হাজার ট্রিলিয়ন গুণ হয়েছে।

মহাকর্ষ বল খেলবে এক অদ্ভুত খেলা। প্রসারমাণ মহাবিশ্ব চাইবে সব বস্তুকে একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে। কিন্তু বস্তুদের পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণ তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। চাইবে আরও কাছে আসতে। এর ফলে কিছু কিছু বস্তু মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধই থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে ছায়াপথপুঞ্জ ও বহু বছরের কাঠামো বিকৃতির পরও যে ছায়াপথগুলো টিকে থাকবে। তবে এরাও এদের আশপাশের বস্তুগুলো থেকে দূরে সরে যাবে। মহাবিশ্বের প্রসারণ হার কত দ্রুত কমবে তার ওপর নির্ভর করবে কাছে ঠেলা ও টানা—এই যুদ্ধের ফল। মহাবিশ্বে বস্তুর ঘনত্ব যত কম হবে, উপরিউক্ত বস্তুগুলো তত সহজে আশপাশের বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যাবে। ঘুরতে থাকবে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে।

মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ সিস্টেমের ক্ষেত্রে মহাকর্ষ ধীরে হলেও তার তীব্র আধিপত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। মহাকর্ষ তরঙ্গের নির্গমন দুর্বল হলেও ঘাতকের মতো ক্রমেই সিস্টেমের শক্তি শেষ করে দেয়। যার ফল একটি ধীর ও সর্পিল পথের মৃত্যু। এভাবে ধীরে ধীরে এক মৃত তারা অন্য মৃত তারা বা কৃষ্ণগহ্বরের দিকে অগ্রসর হবে। একসময় এরা একে ওপরকে গিলে খাবে। সূর্যের কক্ষপথ ধ্বংস করতে মহাকর্ষ তরঙ্গের সময় লাগবে এক হাজার কোটি কোটি কোটি বছর। সূর্য তত দিনে হবে একটি কালো বামন নক্ষত্র। দেখতে অঙ্গারের মতো। ধীরে ধীরে যেতে থাকবে ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে, যেখানে এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণগহ্বর হাঁ করে আছে, তাকে গিলে খাওয়ার জন্য।

সূর্যের মৃত্যু এভাবেই হবে, এটা নিশ্চিত করে বলার কোনো সুযোগ নেই। সর্পিল পথে এগিয়ে যাওয়ার সময় অন্য নক্ষত্রের সঙ্গেও এর দেখা হবে। অনেক সময় এটি চলে আসবে কোনো বাইনারি সিস্টেমের কাছে, যেখানে দুটো তারকা মহাকর্ষীয় বন্ধনে ঘুরপাক খাচ্ছে। এরপর ঘটে এক মজার ঘটনা, যার নাম মহাকর্ষীয় নিক্ষেপণ (gravitational slingshot)। দুটো বস্তুর একে ওপরের চারপাশের ঘূর্ণনের সরলতার জন্য বিখ্যাত। বিষয়টি কেপলার ও নিউটনকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল। যে ব্যস্ততা থেকেই জন্ম আধুনিক বিজ্ঞানের। তাঁরা এ ক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন সূর্য ও পৃথিবী বস্তু দুটি নিয়ে। একটি আদর্শ পরিবেশের কথা চিন্তা করলে ও মহাকর্ষীয় বিকিরণের কথা বাদ দিলে গ্রহটির এই গতি নিয়মিত ও পর্যাবৃত্ত। মানে নির্দিষ্ট সময়

পরপর গতি একই রকম হয়। আপনি যত সময়ই অপেক্ষা করুন না কেন, গ্রহ একইভাবে কক্ষপথে চলতে থাকে। তবে তৃতীয় একটি বস্তু যুক্ত হলেই অবস্থা আমূল পাল্টে যায়। সেটা এক নক্ষত্র ও দুই কিংবা তিন নক্ষত্র, যা-ই হোক। গতি এখন আর সরল ও পর্যাবৃত্ত হবে না। তিন বস্তুর মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ সব সময় জটিল উপায়ে পাল্টে যেতে থাকবে। এর ফলে এই ব্যবস্থার (system) শক্তি উপাদান বস্তুগুলোর মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে না। এমনকি তারা একই রকম বস্তু হলেও না। চলতে থাকে বরং এক জটিল নৃত্য, যেখানে একটি বস্তু ও সঙ্গে অন্য একটি বস্তুই শক্তির প্রধান অংশ দখল করে। দীর্ঘ সময়ের কথা চিন্তা করলে ওই ব্যবস্থার আচরণ অনিবার্যভাবে দৈব[২] (random)। সত্যি বলতে, মহাকর্ষীয় গতিবিদ্যার তিন বস্তুর সমস্যা (three-body problem) বিশৃঙ্খল (chaotic) ব্যবস্থারও একটি ভালো উদাহরণ। এমনও হতে পারে, যে দুটি বস্তু মিলে উপস্থিত শক্তির এতটাই নিয়ে ফেলে যে তৃতীয় বস্তুটা ব্যবস্থা থেকেই ছিটকে পড়ে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো। এ কারণেই এ প্রক্রিয়াকে বলে মহাকর্ষীয় নিক্ষেপণ।

নিক্ষেপণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নক্ষত্রস্তবক থেকে ছিটকে যেতে পারে নক্ষত্র। এমনকি ছায়াপথ থেকেও ছিটকে যেতে পারে। দূর ভবিষ্যতে মৃত নক্ষত্র, গ্রহ ও কৃষ্ণগহ্বরদের বড় অংশ এভাবে আন্তছায়াপথীয় স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। হয়তো এ ঘটনার মাধ্যমে সাক্ষাৎ হবে অন্য কোনো ভাঙনরত ছায়াপথের সঙ্গে। অথবা এটি চিরকাল বিশাল প্রসারণশীল শূন্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে। তবে এই প্রক্রিয়া ঘটবে খুব ধীরে। এটা ঘটতে মহাবিশ্বের বর্তমান বয়সের ১০০ কোটি গুণ সময় লাগবে। অবশিষ্ট বস্তুগুলো ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে যাত্রা করবে। মিলিত হয়ে গড়ে তুলবে বিশাল বপুর (gigantic) কৃষ্ণগহ্বর।

পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, জ্যোতির্বিদেরা মোটামুটি নিশ্চিত, বর্তমানেই কিছু কিছু ছায়াপথের কেন্দ্রে বিশাল বিশাল কৃষ্ণগহ্বর আছে। এরা ঘূর্ণনশীল গ্যাস গিলে খাচ্ছে। বিনিময়ে বিমুক্ত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ শক্তি। সময় এলে এমন টালমাটাল ঘটনার শিকার হবে সব ছায়াপথ। এটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না কৃষ্ণগহ্বরের পার্শ্ববর্তী সব বস্তু হয় দূরে ছিটকে যাবে, নয়তো কৃষ্ণগহ্বরের পেটে চলে যাবে। ছিটকে যাওয়া বস্তু আবার ফিরেও আসতে পারে। আবার ক্রমেই হালকা হয়ে আসা আন্তনাক্ষত্রিক গ্যাসের সঙ্গেও মিশে যেতে পারে। ফুলে-ফেঁপে ওঠা কৃষ্ণগহ্বরটি এবার মোটামুটি নিথর হয়ে থাকবে। শুধু থেকে থেকে দু-একটি বিচ্ছিন্ন নিউট্রন নক্ষত্র কিংবা কৃষ্ণগহ্বর এসে মিশে যাবে এর সঙ্গে। তবে কৃষ্ণগহ্বরের জীবন এখানেই শেষ নয়। ১৯৭৪ সালে স্টিফেন হকিং আবিষ্কার করলেন কৃষ্ণগহ্বর ঠিক কৃষ্ণ নয়। তারা বরং একটি দুর্বল তাপের আভা বিকিরণ করে।

এই হকিং বিকিরণ ঠিকভাবে বুঝতে হলে লাগবে কোয়ান্টাম তত্ত্ব। তত্ত্বটা সহজ নয়। মহাবিশ্বের স্ফীতি তত্ত্ব নিয়ে কথা বলার সময় আমি এর কথা আলোচনা করেছি। হয়তো মনে আছে, কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি প্রধান বক্তব্য হলো হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি। নীতিটি বলছে, কোয়ান্টাম কণাদের সব বৈশিষ্ট্যের সুসংজ্ঞায়িত মান থাকে না। যেমন ধরুন, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি ফোটন বা ইলেকট্রন কণার শক্তির পরিমাণের নির্দিষ্ট কোনো মান থাকা সম্ভব নয়। সত্যি বলতে, একটি অতিপারমাণবিক কণা শক্তি 'ধার' করতে পারে। শর্ত হলো, খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এই শক্তি ফিরিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়েই বলেছি, শক্তির এই ধার করা থেকে কিছু আগ্রহোদ্দীপক ফলাফল পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি হলো আপাতদৃষ্টে শূন্যস্থানে স্বল্পায়ু বা ভার্চ্যুয়াল কণার উপস্থিতি। এটা থেকে পাওয়া যায় এক অদ্ভুত ধারণা। কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম। এটা এমন এক ভ্যাকুয়াম (ফাঁকা স্থান), যেটি ফাঁকা থাকার বদলে অস্থির ভার্চ্যুয়াল কণার উপস্থিতিতে মুখর থাকে। এই কার্যক্রম সাধারণত চোখে পড়ে না। তবে এর ভৌত প্রভাব কিন্তু আছে। এমন একটি ফলাফল পাওয়া যায় ভ্যাকুয়ামের এই কার্যক্রম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হলে।

ভার্চ্যুয়াল কণাদের একটি চরম পরিবেশ পাওয়া যায় কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের কাছে। আগেই বলেছি, ধার করা শক্তির সাহায্যে ভার্চ্যুয়াল কণারা অল্প সময়ের জন্য অস্তিত্বমান থাকে। একটু পরেই শক্তিটুকু দিয়ে দিতে হয়। কণাদেরও ধ্বংস হয়ে যেতে হয়। এই সময়ের মধ্যে কোনো কারণে ভার্চ্যুয়াল কণারা বাইরের কোনো উৎস থেকে শক্তির বড় কোনো সরবরাহ পেলে তাদের ঋণ পরিশোধ করা সহজ হয়ে গেল। অতএব, ঋণ পরিশোধের জন্য এবার আর তাদের বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এবার এরা কম-বেশি স্থায়ী অস্তিত্ব পাবে।

হকিংয়ের মতে, এমন ঋণ নেওয়ার ঘটনাই ঘটে ব্ল্যাকহোলের কাছে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তি জোগান দেওয়া দাতা হলো ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। কাজটি ঘটে এভাবে : সাধারণত ভার্চ্যুয়াল কণারা তৈরি হয় জোড়ায় জোড়ায়। আর গতি থাকে বিপরীতে। ঘটনা দিগন্তের ঠিক বাইরে এমন এক জোড়া নতুন কণার কথা চিন্তা করুন। ধরুন, কণাদের গতি এমন যে একটি কণা ঘটনা দিগন্ত পেরিয়ে ব্ল্যাকহোলের মধ্যে চলে গেল। যাওয়ার সময় এটি ব্ল্যাকহোলের তীব্র মহাকর্ষ থেকে প্রচুর শক্তি লাভ করবে। হকিং দেখলেন, এই শক্তিটুকু দিয়ে পুরো ঋণটাই শোধ করে ফেলা যায়। এর মাধ্যমে ব্ল্যাকহোলের ভেতরের ও বাইরের দুটি কণাই বাস্তব কণায় পরিণত হয়। দিগন্তের বাইরের বিচ্ছিন্ন কণাটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। হতে পারে, এটিও ব্ল্যাকহোলের দিকে চলে আসবে। আবার উচ্চ বেগে ব্ল্যাকহোল থেকে উল্টো

দিকেও যেতে পারে। পালিয়ে যেতে পারে ব্ল্যাকহোলের ত্রিসীমানা থেকে। অতএব হকিং বলছেন, ব্ল্যাকহোল থেকে দূরের দিকে এমন ঝাঁক কণা অবিরাম পালাতে থাকবে। এ ঘটনারই নাম হকিং বিকিরণ।

আণুবীক্ষণিক ব্ল্যাকহোলের জন্যই হকিং বিকিরণ সবচেয়ে শক্তিশালী হবে। একটি ভার্চ্যুয়াল ইলেকট্রনের কথা চিন্তা করুন। সাধারণ অবস্থায় এটি ঋণ পরিশোধ করার আগে সর্বোচ্চ $১০^{-১১}$ সেন্টিমিটার পথ যেতে পারে। তার মানে শুধু এর চেয়ে ছোট মাত্রার (প্রায় পরমাণুর কেন্দ্রের সমান) ব্ল্যাকহোলই শুধু সত্যিকার অর্থে ইলেকট্রনের ফোয়ারা তৈরি করতে পারবে। ব্ল্যাকহোল এর চেয়ে বড় হলে বেশির ভাগ ভার্চ্যুয়াল ইলেকট্রনই ঋণ পরিশোধের আগে ঘটনা দিগন্ত থেকে বের হতে পারবে না।

একটি ভার্চ্যুয়াল কণা কতটা পথ যাবে, সেটা নির্ভর করে সেটি কত সময় বাঁচবে তার ওপর। এটা আবার নির্ভর করে ধারকৃত শক্তির পরিমাণের ওপর। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির মাধ্যমে। ঋণ যত বেশি হবে, কণার আয়ু হবে তত কম। শক্তি ধার করার বড় একটি অংশ হলো কণার নিশ্চল ভরশক্তি। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ অন্তত ইলেকট্রনের নিশ্চল ভরের সমান হতে হবে। প্রোটন বা এমন আরও বেশি নিশ্চল ভরের কণার ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ হবে আরও বড়। তাই মেয়াদকালও হবে কম। তার মানে অতিক্রান্ত পথও হবে অল্প। তাহলে ভাবুন, হকিং বিকিরণের মাধ্যমে প্রোটন তৈরি করতে হলে কেমন পরিবেশ লাগবে। লাগবে এমন এক ব্ল্যাকহোল, যা পরমাণুর কেন্দ্রের মাত্রার চেয়েও ছোট। অন্যদিকে, নিউট্রিনো বা এমন আরও কম নিশ্চল ভরের কণা তৈরি হবে এমন ব্ল্যাকহোলে, যার মাত্রা পরমাণুর কেন্দ্রের মাত্রার চেয়ে বড়। ফোটনের নিশ্চল ভর শূন্য। এটা যেকোনো আকারের ব্ল্যাকহোলই তৈরি করতে পারবে। এমনকি মাত্র এক সৌরভরের ব্ল্যাকহোলও হকিং প্রবাহের মাধ্যমে ফোটন, এমনকি সম্ভবত নিউট্রিনোও নির্গত করবে। তবে সে ক্ষেত্রে প্রবাহের তীব্রতা হবে খুব দুর্বল।

এখানে 'দুর্বল' কথাটায় এতটুকুও অত্যুক্তি নেই। হকিং দেখলেন, ব্ল্যাকহোল দিয়ে সৃষ্ট শক্তির বর্ণালি একটি উত্তপ্ত বস্তু থেকে নির্গত বিকিরণের মতোই হয়। অতএব, হকিং প্রভাবের তীব্রতা পরিমাপ করার একটি উপায় হলো তাপমাত্রা। পরমাণুর কেন্দ্রের আকারের (ব্যাস $১০^{-১৩}$ সেন্টিমিটার) একটি ব্ল্যাকহোলের তাপমাত্রা অনেক অনেক বেশি—প্রায় এক হাজার ডিগ্রি। অন্যদিকে সৌরভরের একটি ব্ল্যাকহোলের ব্যাস মাত্র এক কিলোমিটার। আর তাপমাত্রা পরম শূন্য[৩] তাপমাত্রার ১০ লাখ ভাগের ১ ভাগেরও কম। হকিং বিকিরণের মাধ্যমে পুরো বস্তুটি এক ওয়াটের এক হাজার কোটি কোটি কোটি ভাগেরও কম পরিমাণ বিকিরণ উদ্‌গিরণ করবে।

হকিং প্রভাবের অনেক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। এর একটি হলো ব্ল্যাকহোলের ভর যত কম হয়, বিকিরণের তাপমাত্রা হয় তত বেশি। তার মানে, ছোট ব্ল্যাকহোলগুলো বেশি উত্তপ্ত হয়। বিকিরণের মাধ্যমে ব্ল্যাকহোলের শক্তি কমতে থাকে। ফলে কমে ভরও। আর এটি ক্রমেই ছোট হয়ে আসে। ফলে এটি আরও উত্তপ্ত হয়। বিকিরণ হয় আরও বেশি। তার মানে, ছোট হয় আরও দ্রুতগতিতে। স্বভাবগতভাবেই প্রক্রিয়াটি অস্থিতিশীল কিন্তু শক্তিশালী। ব্ল্যাকহোল ক্রমেই আগের চেয়ে দ্রুত শক্তি নির্গত করতে থাকে ও আকারে ছোট হতে থাকে।

হকিং প্রভাব বলছে, বিকিরণ দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত সব ব্ল্যাকহোল নিঃশেষ হয়ে যাবে। শেষের মুহূর্তগুলো হবে দেখার মতো। মনে হবে যেন এক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটছে। তীব্র তাপশক্তির এক স্বল্পস্থায়ী ঝলক। তারপর? তারপর আর কিছুই না। তত্ত্ব অন্তত সে কথাই বলছে। তবে কিছু কিছু পদার্থবিদ ব্ল্যাকহোলকে মেনে নিতে পারছেন না। কেন একটি জড়পদার্থ গুটিয়ে গিয়ে ব্ল্যাকহোল হবে? তাও আবার পরে শুধু তাপ বিকিরণ রেখে নিজে মিলিয়ে যাবে শূন্যে!

তাদের উদ্বেগের কারণ হলো, দুটি একদম আলাদা বস্তু অবিকল একই রকম তাপ বিকিরণের জন্ম দিতে পারে। ফলে মূল ব্ল্যাকহোলের আগের কোনো তথ্য সংরক্ষিত থাকছে না। এমন উধাও হওয়ার প্রক্রিয়া সব ধরনের সংরক্ষণশীলতা নীতির বিপক্ষে। তবে বিকল্প একটি ব্যাখ্যাও আছে। হয়তো উধাও হওয়ার আগে ব্ল্যাকহোল একটি সূক্ষ্ম ধ্বংসাবশেষ রেখে যায়, যাতে কোনোভাবে বিপুল পরিমাণ তথ্য রক্ষিত থাকে। সে যা-ই হোক, ব্ল্যাকহোলের ভরের বিশাল একটি অংশ তাপ ও আলো আকারে বিকিরিত হয়ে যাচ্ছেই।

হকিং প্রক্রিয়া অভাবনীয় রকম ধীরে কাজ করে। এক সৌরভরের একটি ব্ল্যাকহোলই নিঃশেষ হতে $১০^{৬৬}$ বছর সময় নেবে। অন্যদিকে, একটি সুপারম্যাসিভ বা অতিভারী ব্ল্যাকহোলের সময় লাগবে $১০^{৯৩}$ বছর। তাও আবার প্রক্রিয়াটি শুরুই হবে না, যতক্ষণ মহাবিশ্বের পটভূমি তাপমাত্রা সেই ব্ল্যাকহোলের তাপমাত্রার নিচে না নামে। অন্যথায় আশপাশের অঞ্চল থেকে ব্ল্যাকহোলের দিকে প্রবাহিত তাপের তীব্রতা ব্ল্যাকহোল থেকে হকিং প্রভাবের মাধ্যমে নির্গত তাপের চেয়ে বেশি হবে। বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণের বর্তমান তাপমাত্রা পরম শূন্যের ৩ ডিগ্রি ওপরে। সৌরভরের ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রে তাপ বিকিরণের নিঃসরণ ও আগমনের ভারসাম্য (সমান-সমান) হওয়ার তাপমাত্রা কমে আসতে সময় লাগবে $১০^{২২}$ বছর। হকিং বিকিরণ এমন কিছু নয়, যা আমরা কিছুক্ষণ বসে থেকেই দেখে ফেলতে পারব।

তবে চিরকাল একটি দীর্ঘ সময়। তাই চিরকাল অপেক্ষা করতে পারলে সম্ভবত সব ব্ল্যাকহোল, এমনকি অতিভারীদেরও উধাও হতে দেখা যাবে। চিরন্তন মহাজাগতিক অমানিশার আলোর ক্ষণস্থায়ী ঝলক দেখিয়ে ব্ল্যাকহোল তার মৃত্যুবেদনা প্রকাশ করবে। কোটি কোটি সূর্যের সমান তেজস্বী বস্তুটার বিদায়ঘণ্টা!

বাকি থাকল তাহলে কী?

সব পদার্থ ব্ল্যাকহোলে পতিত হয় না। নিউট্রন নক্ষত্র ও কৃষ্ণবামন নিয়েও আমাদেরকে ভাবতে হবে। এ ছাড়া আছে নিঃসঙ্গ গ্রহ, যারা একাকী আন্তছায়াপথীয় স্থানে ঘুরে বেড়ায়। শুধু কি তাই? আরও আছে গ্যাস ও ধূলিকণার হালকা আবরণ, যেগুলো কখনো সমবেত হয়ে নক্ষত্রে পরিণত হতে পারেনি। আরও আছে গ্রহাণু, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড ও বিভিন্ন সৌর ব্যবস্থার পুরোনো পাথরখণ্ড। এসব বস্তু কি চিরকাল টিকে থাকবে?

এখানে এসে আমরা তাত্ত্বিক সমস্যায় পড়ে যাই। আমাদের জানতে হবে সাধারণ পদার্থ, মানে আমরা মানুষেরা এবং পৃথিবী যেসব বস্তু দিয়ে গড়া, তা কি একেবারে স্থিতিশীল? ভবিষ্যতে কী ঘটবে তার চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করছে কোয়ান্টাম মেকানিকসের ওপর। কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া সাধারণত পারমাণবিক ও অতিপারমাণবিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার নীতি সবকিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়ার কথা। প্রযোজ্য হওয়ার কথা আণুবীক্ষণিক বস্তুর ক্ষেত্রেও। বড় বস্তুর ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম ফলাফল অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র। তবে দীর্ঘ সময়ে সেটাও বড় পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অনিশ্চয়তা ও সম্ভাবনা। কোয়ান্টাম জগতে কিছুই নিশ্চিত নয়। আছে শুধু সম্ভাবনা। তার মানে কোনো একটি ঘটনা যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে যথেষ্ট পরিমাণ সময় পেলে এটি ঘটবেই। সম্ভাবনা যতই কম হোক। তেজস্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে আমরা এই নিয়মটির প্রতিফলন দেখি। ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর নিউক্লিয়াস প্রায় সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। তবে এটি থেকেও একটি আলফা কণা নিক্ষিপ্ত হয়ে থোরিয়াম তৈরি হয়ে যাওয়ার ছোট একটি সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। আরও সঠিক করে বললে, প্রতি একক সময়ে একটি নির্দিষ্ট ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের ভেঙে যাওয়ার একটি খুব ছোট সম্ভাবনা আছে। এটা ঘটতে গড়ে সাড়ে ৪০০ কোটি বছর সময় লাগে। তবে পদার্থবিদ্যার সূত্র প্রতি একক সময়েই একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা চায়। ফলে যেকোনো ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রই একসময় না একসময় ভাঙবেই।

একবার ভাবুন তো, আলফা কণার তেজস্ক্রিয় ক্ষয় কেন ঘটে? কারণ ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটন ও নিউট্রনের অবস্থানে একটুখানি অনিশ্চয়তা আছে। ফলে সব সময় ক্ষুদ্র হলেও একগুচ্ছ কণা অল্প সময়ের জন্য

নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থান করার একটি সম্ভাবনা আছে। এ কারণে নিউক্লিয়াস থেকে তারা দ্রুত দূরে ধাবিত হয়। একইভাবে কঠিন পদার্থের পরমাণুর অবস্থানের ব্যাপারেও একটি আরও ছোট কিন্তু অশূন্য অনিশ্চয়তা আছে। যেমন হীরার মধ্যে একটি কার্বন পরমাণুর কথা ভাবুন। এটি স্ফটিকের ল্যাটিসের মধ্যে খুবই সুসংজ্ঞায়িত জায়গায় অবস্থান করে। দূর ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের প্রত্যাশিত তাপমাত্রা শূন্যের কাছে পৌঁছালেই এই অবস্থান অস্থিতিশীল হওয়ার কথা। কিন্তু পুরোপুরি নয়। পরমাণুটির অবস্থানে সব সময়ই একটি ক্ষুদ্র অনিশ্চয়তা আছে। এর মানে হলো, ল্যাটিস থেকে পরমাণুটি বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার একটি ক্ষুদ্র সম্ভাবনা আছে। এমন প্রস্থান প্রক্রিয়ার কারণে কোনো পদার্থ, এমনকি হীরার মতো কঠিন পদার্থও সত্যিকার অর্থে কঠিন নয়। বরং, যাকে দেখতে কঠিন মনে হয় সেটি আসলে অনেক বেশি আঠালো একটি তরল পদার্থ। এবং অনেক বেশি সময় পেলে এটিও তরলের মতো প্রবাহিত হতে পারবে। কারণ হলো কোয়ান্টাম মেকানিকসের প্রভাব। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ফ্রিম্যান ডাইসন হিসাব করে দেখেছেন, প্রায় $১০^{৬৫}$ বছর পর যত্নের সঙ্গে কাটা প্রতিটি হীরকখণ্ড গোলাকার গুটিতে পরিণত হবে। শুধু তা-ই নয়, প্রতি টুকরা পাথরও পরিণত হবে মসৃণ গোলকে।

অবস্থানের অনিশ্চয়তার কারণে নিউক্লীয় রূপান্তরও ঘটে যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে হীরার স্ফটিকের দুটো প্রতিবেশী পরমাণুর কথা ভাবুন। খুব কম ঘটলেও অনেক সময় দেখা যায়, একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সামান্য সময়ের জন্য এর প্রতিবেশী পরমাণুর পাশে আবির্ভূত হয়। নিউক্লিয়াসের আকর্ষণী বল হয়তো তখন দুটো নিউক্লিয়াসকে জোড়া দিয়ে ম্যাগনেশিয়ামের একটি নিউক্লিয়াস বানিয়ে দেবে। তার মানে, নিউক্লীয় ফিউশন (সংযোজন) ঘটার জন্য খুব উচ্চ তাপমাত্রা না হলেও চলে। শীতল সংযোজনও সম্ভব। তবে এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ সময়। ডাইসন হিসাব করে দেখেছেন, $১০^{১৫০০}$ বছর (তার মানে ১ এর পরে ১৫০০টি শূন্য) পরে সব পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে সবচেয়ে স্থিতিশীল নিউক্লীয় আকৃতি লাভ করবে। এটা হলো লৌহ।

তবে এটাও পারে যে নিউক্লীয় বস্তুটি এতটা সময় পর্যন্ত টিকে থাকবে না। এর কারণ হলো, অত্যন্ত ধীরগতির হলেও আরও দ্রুতগতির নিউক্লীয় রূপান্তর প্রক্রিয়া। ডাইসনের পরিমাপে প্রোটনকে (ও নিউক্লিয়াসে থাকা নিউট্রনকে) পুরোপুরি স্থিতিশীল ধরে নেওয়া হয়েছে। অন্য কথায়, একটি প্রোটন ব্ল্যাকহোলে পতিত না হলে বা অন্য কোনোভাবে উত্তেজিত না হলে এটি চিরকাল টিকে থাকবে। কিন্তু বিষয়টা কি আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি? আমার ছাত্রজীবনে এটা নিয়ে কারোরই সন্দেহ ছিল না। প্রোটনরা ছিল

অবিনশ্বর। তারা ছিল পুরোপুরি স্থিতিশীল। তবে একটুখানি অস্বস্তিকর সন্দেহ সব সময়ই ছিল। সমস্যাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে পজিট্রন নামের একটি কণা। এটি ইলেকট্রনের মতোই। পার্থক্য একটি জায়গায়। প্রোটনের মতোই এর চার্জ ধনাত্মক (যেখানে ইলেকট্রনের চার্জ ঋণাত্মক)। প্রোটনের চেয়ে এরা অনেক হালকা। ফলে, অন্য সবকিছু ঠিক থাকলে প্রোটনরা পজিট্রন হয়ে যেতে চাইবে। পদার্থবিদ্যায় ভৌত ব্যবস্থাগুলো (physical system) একটি গূঢ় নীতি মেনে চলে। এই ব্যবস্থাগুলো সব সময় ন্যূনতম শক্তির অবস্থায় যেতে চায়। আর অল্প ভর মানে অল্প শক্তি। এখন, কেউই বলতে পারবেন না কেন প্রোটনরা এই কাজটি করে না। তাই পদার্থবিদেরা অনুমান করে নিলেন, প্রকৃতির কোনো সূত্র হয়তো একে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিছুদিন আগেও বিষয়টি একদম দুর্বোধ্য ছিল। তবে কোয়ান্টাম মেকানিকসের সূত্র অনুসারে নিউক্লীয় বলগুলো কীভাবে এক কণাকে অন্য কণায় রূপান্তরিত করে, সে সম্পর্কে ধারণা কিছুটা পরিষ্কার হয় ১৯৭০-এর দশকে। সর্বশেষ তত্ত্বগুলো অনুসারে প্রোটনের ক্ষয়ের বিপরীতে কাজ করা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। তবে এমন বেশির ভাগ তত্ত্বই বলছে, সূত্রটি পুরোপুরি ফলপ্রসূ নয়। একটি প্রোটন পজিট্রনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার একটি ছোটখাটো সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। বাকি ভরটুকুর কিছু অংশ বৈদ্যুতিকভাবে আধান নিরপেক্ষ কোনো কণায় পরিণত হতে পারে। যেমন তথাকথিত পাইওন। কিছু অংশ আবার গতিশক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারে (ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট বস্তুগুলো উচ্চ বেগে চলাচল করবে)।

সবচেয়ে সরল একটি তাত্ত্বিক নমুনা অনুসারে প্রোটন ক্ষয়ের জন্য গড় সময়ের প্রয়োজন $১০^{২৮}$ বছর। এটা মহাবিশ্বের বর্তমান বয়সের ১০ হাজার কোটি কোটি গুণ। এ কারণে আপনার কাছে হয়তো মনে হবে, প্রোটন ক্ষয়ের বিষয়টি শুধু কাগজ-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিষয়টির সঙ্গে কোয়ান্টাম মেকানিকস জড়িয়ে আছে। ফলে সহজাতভাবেই এটি সম্ভাবনানির্ভর। $১০^{২৮}$ বছর হলো পূর্বাভাসকৃত গড় আয়ু। সব প্রোটনের প্রকৃত আয়ু নয়। অনেক বেশি প্রোটনের কথা বিবেচনা করলে আমাদের চোখের সামনেই একটি প্রোটনের ক্ষয় দেখার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। সত্যি বলতে, $১০^{২৮}$টি প্রোটনের কথা বিবেচনা করলে প্রায় প্রতিবছর একটি করে প্রোটন ক্ষয় হওয়ার কথা। আর মাত্র ১০ কেজি পদার্থেই আছে $১০^{২৮}$টি প্রোটন।

তবে আসলে যেটা ঘটল, তত্ত্বটা জনপ্রিয় হওয়ার আগেই প্রোটনের এই রকম আয়ু থাকার সম্ভাবনা পরীক্ষামূলকভাবে বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু তত্ত্বটির বিভিন্ন রূপভেদে আরও বেশি আয়ুর কথা বলা হয়েছে—$১০^{৩০}$ বা $১০^{৩২}$ বছর। বা আরও বেশি। কিছু কিছু তত্ত্ব তো $১০^{৮০}$ বছর পর্যন্ত অনুমান করে।

অল্প মানগুলো পরীক্ষামূলকভাবে যাচাইযোগ্য। যেমন ১০^{৩২} বছর ক্ষয়কালের অর্থ হবে আপনার পুরো আয়ুষ্কালে আপনি শরীর থেকে একটি বা দুটি প্রোটন হারাতে পারেন। কিন্তু এমন দুর্লভ ঘটনা কীভাবে শনাক্ত করা সম্ভব?

এর জন্য একটি কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। হাজার হাজার টন পদার্থ জড়ো করা হয়। এরপর খুব সংবেদনশীল ডিটেক্টর দিয়ে বহু মাস ধরে এগুলোর ওপর নজর রাখা হয়। ডিটেক্টরকে এমনভাবে রাখা ছিল, যাতে একটি প্রোটন ক্ষয়ের উৎপাদকও সংকেত দেবে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, প্রোটন ক্ষয় খোঁজা খড়ের গাদায় সুই খোঁজার মতোই। কারণ, এমন ক্ষয় মহাজাগতিক বিকিরণের প্রভাবে ঘটা আরও এমন বহু বেশিসংখ্যক ঘটনার আড়ালে চাপা পড়ে যায়। পৃথিবী প্রতিমুহূর্তে মহাকাশ থেকে আসা উচ্চশক্তির কণার আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে। এর ফলে অতিপারমাণবিক কণিকার একটি সর্বদা উপস্থিত পটভূমি তৈরি হচ্ছে। এই ব্যতিচার কমানোর জন্য পরীক্ষা চালাতে হয় মাটির নিচে।

মাটির আধ মাইলের বেশি নিচে এ ধরনের একটি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। জায়গাটা ওহাইওর ক্লিভল্যান্ডের একটি লবণের খনিতে অবস্থিত। ১০ হাজার টন অতিমাত্রায় বিশুদ্ধ পানিকে ঘনাকার ট্যাংকে রেখে ডিটেক্টর দিয়ে ঘেরাও করে যন্ত্র নির্মাণ করা হয়। পানি ব্যবহারের কারণ এর স্বচ্ছতা। ফলে ডিটেক্টর একবারে যথাসম্ভব সর্বোচ্চসংখ্যক প্রোটন দেখতে পাবে। বুদ্ধিটা ছিল এমন: যদি ভালো কোনো তত্ত্বের কথা অনুসারে প্রত্যাশিত উপায়ে কোনো প্রোটনের ক্ষয় ঘটে, তাহলে এটি একটি পজিট্রনের পাশাপাশি বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ পাইওন তৈরি করবে। এটা আমরা আগেও ব্যাখ্যা করেছি। এই পাইওনও আবার দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাবে। সাধারণত এ ক্ষয় থেকে দুটি খুব তেজস্বী ফোটন বা গামা রশ্মি তৈরি হবে। শেষে এই গামা রশ্মি পানির নিউক্লিয়াসের দেখা পায়। প্রতিটি থেকে তৈরি হয় একটি ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়। এরাও হয় খুব তেজস্বী। সত্যি বলতে, এই গৌণ ইলেকট্রন ও পজিট্রনগুলো এতই তেজস্বী হয় যে এরা আলোর কাছাকাছি গতিতে চলে। এমনকি পানিতেও।

শূন্য মাধ্যমে আলো চলে সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার গতিতে। কোনো কণাই এর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। এখন, পানি আলোর গতিকে কিছুটা কমিয়ে দেয়। বেগ দাঁড়ায় ২ লাখ ৩০ হাজার কিলোমিটার।[৪] ফলে পানিতে প্রায় ৩ লাখ কিলোমিটার বেগে চলা উচ্চগতির কোনো অতিপারমাণবিক কণা পানিতে আলোর বেগের চেয়ে বেশি বেগে চলে। কোনো আকাশযান শব্দের চেয়ে বেশি বেগে চললে তীব্র গুম গুম শব্দ হয়। এর নাম সনিক বুম। একইভাবে, কোনো মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলা কোনো চার্জিত কণা সেই মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র তড়িৎ-চুম্বকীয়

শকওয়েভ তৈরি করবে। এর নাম চেরেনকোভ বিকিরণ। প্রক্রিয়াটির নাম রুশ আবিষ্কারকের নামেই নামটি দেওয়া। এ কারণে ওহাইওর পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত বিজ্ঞানীরা চেরেনকোভ ঝলকের খোঁজে একগুচ্ছ আলোকসংবেদী ডিটেক্টর স্থাপন করেন। প্রোটনের ক্ষয়কে মহাজাগতিক নিউট্রিনো ও অন্য ভেজাল অতিপারমাণবিক ধ্বংসাবশেষ থেকে আলাদা করার জন্য বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট একটি সংকেতের খোঁজ করেন। একের পর এক একই সঙ্গে আসা চেরেনকোভ আলোক সংকেতের জোড়া। এটা নির্গত হবে ইলেকট্রন-পজিট্রনের জোড়া ভিন্নদিকে গতিশীল হলে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে কয়েক বছরের অনুসন্ধানের পরও ওহাইওর পরীক্ষা থেকে প্রোটন ক্ষয়ের পক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অবশ্য চতুর্থ অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে, এ পরীক্ষায় সুপারনোভা '১৯৭৪এ' থেকে আসা নিউট্রিনো ধরা পড়ে। (বিজ্ঞানে এমনটা হরহামেশাই ঘটে। একটি জিনিস খুঁজতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য জিনিস পাওয়া যায়) এই বইটি লেখার সময় পর্যন্ত[৫] আলাদা কৌশলে নির্মিত অন্য পরীক্ষার ফলাফলও না-বোধক। এর অর্থ হতে পারে, প্রোটনরা ক্ষয়ই হয় না। আবার এ-ও হতে পারে, এরা ক্ষয় হয়, তবে এদের আয়ুষ্কাল ১০^{৩২} বছরের বেশি। বর্তমান সময়ের পরীক্ষণ উপকরণ দিয়ে এর চেয়ে ধীরগতির ক্ষয় হার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তাই নিকট ভবিষ্যতে প্রোটন ক্ষয়ের ব্যাপারে কোনো ভালো ফলাফল পাওয়ার সম্ভবনাও দেখা যাচ্ছে না।

অনেকগুলো মহাএকীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব (Grand unified theory) বিষয়ক তাত্ত্বিক কাজের মাধ্যমে প্রোটন ক্ষয়ের অনুসন্ধান শুরু। লক্ষ্য ছিল সবল (সবল বলের কাজ হলো নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রনদের গেঁথে রাখা) ও দুর্বল নিউক্লীয় বল (দুর্বল নিউক্লীয় বল বেটা তেজস্ক্রিয়তার জন্য দায়ী) এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় বলকে জোড়া দেওয়া। এই বলগুলোর সূক্ষ্ম মিশ্রণেও প্রোটন ক্ষয় ঘটবে। তবে এই মহাএকীভবন ভুল হয়ে থাকলে অন্য উপায়েও প্রোটন ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটা হতে পারে প্রকৃতির চতুর্থ মৌলিক বল মহাকর্ষের মাধ্যমে।

মহাকর্ষ কীভাবে প্রোটন ক্ষয় ঘটায়, সেটা দেখতে হলে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। প্রোটন কিন্তু সত্যিকার অর্থে মৌলিক কণা নয়। নেই কোনো বিন্দুসদৃশ আকৃতি। এটি আসলে একটি যৌগিক কণা। কোয়ার্ক নামে আরও তিনটি ছোট কণা দিয়ে এটি তৈরি। বেশির ভাগ সময়ই প্রোটনের ব্যাস হয় ১ সেন্টিমিটারের প্রায় ১০ লাখ কোটি ভাগের এক ভাগের সমান। এটা হলো কোয়ার্কদের মধ্যকার গড় দূরত্ব। তবে কোয়ার্করা স্থির থাকে না। প্রোটনের মধ্যে অবিরত অবস্থান বদলাতে থাকে। এরও কারণ কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার

অনিশ্চয়তা। মাঝেমধ্যেই দুটি কোয়ার্ক একে ওপরের খুব কাছে চলে আসে। আরও কম ঘটলেও অনেক সময় তিনটি কোয়ার্কই খুব কাছে চলে আসে। এমনিতে কোয়ার্কদের মধ্যকার মহাকর্ষ বল একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য। তবে এটা অসম্ভব নয় যে কণাগুলো এতটা কাছে আসবে যে তাদের মধ্যকার মহাকর্ষ বল অন্য সবকিছুর চেয়ে শক্তিশালী হবে। এটা সত্যি হয়ে থাকলে কোয়ার্করা জড়ো হয়ে একটি ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোল তৈরি করতে পারে। প্রকৃত অর্থে কোয়ান্টাম মেকানিকসের কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের প্রভাবে প্রোটন নিজের মহাকর্ষের ভারেই গুটিয়ে যায়। এর ফলে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোলটি হয় খুব অস্থিতিশীল। হকিং প্রক্রিয়ার কথা মনে করে দেখুন। প্রোটন ক্ষয় থেকে প্রাপ্ত ব্ল্যাকহোলও সঙ্গে সঙ্গেই আবার উধাও হয়ে যায়। তৈরি হয় একটি পজিট্রন। এই উপায়ে প্রোটন ক্ষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় এখনো সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। তবে সময়টা $১০^{৪৫}$ বছর থেকে $১০^{২২০}$ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

দীর্ঘ সময় পর প্রোটন ক্ষয়ই হয়ে গেলে মহাবিশ্বের দূর ভবিষ্যতের ওপর তার বড় প্রভাব থাকবে। সব পদার্থ হয়ে যাবে অস্থিতিশীল। এবং সবশেষে উধাও। গ্রহদের মতো কঠিন বস্তুরা ব্ল্যাকহোলে পতিত না হলেও চিরকাল থাকবে না। খুব দ্রুতই ক্রমেই মিলিয়ে যাবে। প্রোটনের আয়ুষ্কাল $১০^{৩২}$ হলে তার অর্থ হবে পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে এক লাখ কোটি প্রোটন হারাচ্ছে। এই হারে চলতে থাকলে মোটামুটি $১০^{৩৩}$ বছর পর আমাদের পৃথিবী নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য তার আগেই অন্য কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে ভিন্ন কথা।

তবে নিউট্রন নক্ষত্র কিন্তু এই পক্রিয়া থেকে মুক্ত। নিউট্রনরাও তিনটি কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত। যে প্রক্রিয়ায় প্রোটন ধ্বংস হয়, মোটামুটি সেভাবেই নিউট্রনও আরও হালকা কণায় পরিণত হতে পারে। (বিচ্ছিন্ন নিউট্রন কণা যেকোনো অবস্থাতেই অস্থিতিশীল এবং ১৫ মিনিটের মধ্যেই ক্ষয় হয়ে যেতে পারে।) শ্বেত বামন নক্ষত্র, পাথর, ধুলা, ধূমকেতু, গ্যাসের হালকা মেঘ এবং অন্য সব মহাকাশ প্রযুক্তিও একইভাবে কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। আমরা বর্তমানে যে $১০^{৪৮}$ টন পদার্থকে পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকতে দেখছি, সেটাও একসময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। হয় ব্ল্যাকহোলের মধ্যে পতিত হবে, নয়তো ধীরে ধীরে নিউক্লীয় ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেষ হবে।

প্রোটন ও নিউট্রনরাও ক্ষয় হলে অবশ্যই তৈরি হয় ধ্বংসাবশেষ। ফলে মহাবিশ্ব পুরোপুরি পদার্থহীন হয়ে যাবে, এমন কোনো কথা নেই। এর একটি উদাহরণ আগেও দেওয়া হয়েছে। প্রোটন ক্ষয়ের সম্ভাব্য একটি উপায় হলো একটি পজিট্রন ও একটি নিরপেক্ষ পাইওন তৈরি হওয়া। পাইওন খুব অস্থিতিশীল। খুব দ্রুত ক্ষয় হয়ে দুটো ফোটনে পরিণত হয়। অথবা ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়া। দুই ক্ষেত্রেই প্রোটন ক্ষয়ের ফলে মহাবিশ্ব ক্রমাগত বেশি

বেশি পজিট্রন দিয়ে ভরপুর হতে থাকবে। পদার্থবিদদের বিশ্বাস, মহাবিশ্বে ধনাত্মক (প্রধানত প্রোটন) ও ঋণাত্মক চার্জধারী (প্রধানত ইলেকট্রন) কণার সংখ্যা সমান। এর অর্থ হলো, সব প্রোটন ক্ষয় হয়ে গেলে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের পরিমাণ সমান হবে। এখন, পজিট্রন হলো ইলেকট্রনের প্রতিকণা। ইলেকট্রন ও পজিট্রনের দেখা হলে একে অপরকে শেষ করে দেয়। পরীক্ষাগারে এই প্রক্রিয়াটি অনায়াসে করে দেখা হয়। কণা দুটির সাক্ষাতের ফলে ফোটন কণা আকারে প্রচুর পরিমাণ শক্তি অবমুক্ত হয়।

দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্বে উপস্থিত পজিট্রন ও ইলেকট্রন একে অপরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে, নাকি একটি কণার কিছু অংশ বাকি থেকে যাবে, সেটা জানতে অনেক হিসাব-নিকাশ করা হয়েছে। ধ্বংস হওয়ার ঘটনা হুট করে ঘটে না। বরং একটি ইলেকট্রন ও পজিট্রন প্রথমে নিজেদের পজিট্রোনিয়াম নামে একটি ক্ষুদ্র পরমাণুতে সজ্জিত করে। এখানে দুজনেই তাদের যৌথ ভরকেন্দ্রকে[৬] প্রদক্ষিণ করে। নিজেদের মধ্যকার বৈদ্যুতিক আকর্ষণের প্রভাবে নাচতে নাচতে বেজে যায় মৃত্যুঘণ্টা। এভাবে কণাগুলো সর্পিল পথ বেয়ে একসময় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যায়। সর্পিল পথে কণাগুলো কত সময় থাকবে, তা পজিট্রোনিয়াম 'পরমাণুটি' তৈরি হওয়ার সময় ইলেকট্রন ও পজিট্রনের মধ্যে প্রাথমিক যে দূরত্ব ছিল, তার ওপর নির্ভর করে। পরীক্ষাগারে পজিট্রনিয়াম ক্ষয় হতে এক সেকেন্ডের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ সময় ব্যয় হয়। কিন্তু বাইরের মহাশূন্যে কণাগুলোকে নিয়ে নাক গলানোর মতো তেমন কেউ নেই। ফলে এদের কক্ষপথ হতে পারে অনেক বিশাল। পরিমাপ করে দেখা গেছে, ইলেকট্রন ও পজিট্রন থেকে পজিট্রোনিয়াম তৈরি হতে $১০^{৭১}$ বছর সময় লাগে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এদের কক্ষপথ বহু ট্রিলিয়ন আলোকবর্ষ চওড়া হয়। কণাগুলো এতটা ধীরে চলবে যে ১ সেন্টিমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগবে বহু মিলিয়ন বছর। ইলেকট্রন ও পজিট্রন এতটাই ধীরগতির হয়ে যাবে যে সর্পিল পথে চলতে $১০^{১১৬}$ বছরের মতো দীর্ঘ সময় লাগবে। তবু এই পজিট্রোনিয়ামের চূড়ান্ত নিয়তি কিন্তু এটি তৈরি হওয়ার সময়ই নির্ধারিত হয়ে গেছে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সব ইলেকট্রন ও পজিট্রনকে কিন্তু ধ্বংস হতে হয় না। যে সময় ধরে ইলেকট্রন ও পজিট্রনরা তাদের বিপরীত চিহ্ন খুঁজতে থাকে, সে সময়েই তাদের ঘনত্ব নির্দিষ্ট হারে কমতে থাকে। এর পেছনে দুটো কারণ কাজ করে। একটি হলো ধ্বংস হওয়ার প্রক্রিয়া, আর অন্যটি হলো মহাবিশ্বের চিরন্তন প্রসারণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পজিট্রোনিয়াম তৈরি কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে অবশিষ্ট পদার্থের সামান্য ধ্বংসাবশেষ কমতে থাকলে এটি কখনোই পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় না। সব সময়ই কোথাও না কোথাও

ইলেকট্রন বা পজিট্রনের বিজোড় সংখ্যা পাওয়া যাবে। যদিও এমন প্রতিটি কণাই ক্রমাগত বড় হয়ে ওঠা শূন্যস্থানের মধ্যে একা একা অবস্থান করে।

ধীরগতির এতসব মারাত্মক প্রক্রিয়াগুলো শেষে মহাবিশ্ব কেমন হতে পারে, তার একটি মোটামুটি চিত্র আমরা অনুমান করতে পারি। প্রথমত থাকবে বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ। সব সময় উপস্থিত থাকা মহাজাগতিক পটভূমি। এতে রয়েছে ফোটন ও নিউট্রিনো। আবার আমাদের এখনো অচেনা পুরোপুরি স্থিতিশীল কোনো কণাও থাকতে পারে। মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই কণাগুলোর শক্তি কমতে থাকবে, যতক্ষণ না এদের পটভূমি খুব হালকা হয়ে যায়। মহাবিশ্বের সাধারণ পদার্থগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। সব ব্ল্যাকহোলও শেষ হয়ে যাবে। ব্ল্যাকহোলের বেশির ভাগ ভর ফোটনে পরিণত হবে। আর কিছু অংশ থাকবে নিউট্রিনো আকারে। আর খুবই সামান্য একটি অংশ থাকবে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ও আরও ভারী কণারূপে। এগুলো নির্গত হয়েছিল ব্ল্যাকহোলের একেবারে অন্তিম বিস্ফোরণের ধাক্কায়। ভারী কণাগুলোর সবাই খুব দ্রুত ক্ষয় হয়। আর নিউট্রন ও প্রোটন ক্ষয় হয় আরও ধীরে। ফলে এদের সঙ্গে যোগ দেয় কিছু ইলেকট্রন ও পজিট্রন কণা। আমরা আজ যে সাধারণ পদার্থ দেখছি, এই কণাগুলোই হলো তার সর্বশেষ স্মৃতিচিহ্ন।

তার মানে, দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্ব হবে ফোটন, নিউট্রিনো এবং ক্রমাগত কমতে থাকা ইলেকট্রন ও পজিট্রনের একটি অচিন্তনীয় ধরনের হালকা স্যুপের মতো। এই কণাগুলোর সবাই ধীরে ধীরে আরও দূরে সরতে থাকবে। এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি, এর পরে আর কোনো ভৌত প্রক্রিয়া সংঘটিত হবে না। এমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটবে না, যাতে মহাবিশ্বের বন্ধ্যত্বের অবসান ঘটতে পারে। যাত্রাপথের শেষে এসেও মহাবিশ্ব যেন পেল চিরন্তন জীবন। অথবা চিরন্তন মৃত্যু বললেই হয়তো সঠিক বলা হবে।

ঊনবিংশ শতকের পদার্থবিদ্যায় তাপীয় মৃত্যু (heat death) নামে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল। আমাদের আলোচনায় আসা শীতল, অন্ধকার, বৈশিষ্ট্যহীন প্রায় শূন্য এই নীরস চিত্রই আধুনিক কসমোলজির তাপীয় মৃত্যুর সবচেয়ে কাছাকাছি বিবরণ। মহাবিশ্ব এই অবস্থায় আসতে এত বেশি সময় লাগবে যে এটা কল্পনা করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তবু এটি অসীম সময়ের অতিশয় ক্ষুদ্র একটি অংশই মাত্র। আগেই বলেছি, চিরকাল একটি দীর্ঘ সময়।

এটা সত্যি যে মহাবিশ্বের ক্ষয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে যে সময়ের প্রয়োজন, সেটি মানবীয় সময়ের মাপকাঠিতে অনেক অনেক বেশি। এতই বেশি যে সে সময়টা আসলে আমাদের কাছে অর্থহীন। তবু আমরা আগ্রহভরে প্রশ্ন করি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভাগ্যে কী ঘটবে? তারা কি অনিবার্যভাবে এমন এক মহাবিশ্বে বন্দী হবে, যা খুব ধীরে হলেও

অপ্রতিরোধ্যভাবে তাদের চারপাশে অচল হয়ে যাবে? দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানের পূর্বাভাস খুব বেশি প্রতিশ্রুতিশীল নয়। ফলে মনে হচ্ছে কোনো ধরনের জীবনের জন্যই অনুকূল কোনো পরিবেশ থাকবে না। তবে মৃত্যু অত সহজও নয়।

তথ্যনির্দেশ

১. ১ ট্রিলিয়ন সমান ১ লাখ কোটি। মানে ১-এর পর ১২টি শূন্য দিতে হবে। অর্থাৎ, ১,০০০,০০০,০০০,০০০।
২. যে ঘটনার ফলাফল আগে থেকে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, তাকে দৈব বা র‍্যান্ডম ঘটনা বলে।
৩. পরম শূন্য তাপমাত্রা: ০ কেলভিন বা মাইনাস ২৭৩.১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলা হয়। তাত্ত্বিকভাবে এটাই মহাবিশ্বের সম্ভাব্য ন্যূনতম তাপমাত্রা।
৪. শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ ৩ লাখ কিলোমিটার হলেও পানিতে এই বেগ অনেকটা কম। পানির ঘনত্বের ওপর এটা নির্ভর করলেও বেগটা মোটামুটি সেকেন্ডে প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার কিলোমিটার। কিন্তু ইলেকট্রন ও পজিট্রনরা পানিতেও শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে চলে।
৫. বইটির আলোচ্য অংশ অনুবাদের সময়ও (ফেব্রুয়ারি, ২০২০) প্রোটন ক্ষয়ের পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
৬. কোনো একটি সিস্টেমের সব অংশের গড় অবস্থানকে ভরকেন্দ্র বলে। যেমন বৃত্তের ক্ষেত্রে এর কেন্দ্রই ভরকেন্দ্র। একই কথা প্রযোজ্য গোলকের ক্ষেত্রেও। আমরা অনেক সময় বলি, বাইনারি স্টার বা জোড়া তারারা একে অপরকে কেন্দ্র করে ঘোরে। আসলে কিন্তু তারা দুজনের যৌথ ভরকেন্দ্রকে ঘিরে পাক খায়। সেই ভরকেন্দ্র সাধারণত দুটো তারার মাঝামাঝি কোনো স্থান হয়। আবার আমরা জানি, পৃথিবী ও বৃহস্পতির মতো গ্রহরা সূর্যকে ঘিরে পাক খায়। তবে বাস্তবতা হলো, বৃহস্পতি আসলে ঠিক সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে না। ঘোরে সূর্যের পরিধির বাইরের একটি বিন্দুকে ঘিরে।

অষ্টম অধ্যায়

ধীরগতির জীবন

১৯৭২ সালে ক্লাব অব রোম নামে একটি সংগঠন মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দ্য লিমিটস টু গ্রোথ একটি নেতিবাচক পূর্বাভাস প্রকাশ করে। তারা আসন্ন বিভিন্ন দুর্যোগবিষয়ক অনেক আশঙ্কা প্রকাশ করে এতে। এর মধ্য অন্যতম ছিল জীবাশ্ম জ্বালানিবিষয়ক। তাদের মতে, অল্প কয়েক দশকের মধ্যে পৃথিবীর সব জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে। মানুষ ভয় পেল। তেলের দাম গেল বেড়ে। বিকল্প জ্বালানি নিয়ে গবেষণা গতি পেল। এখন আমরা ১৯৯০-এর দশকে আছি[১]। কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার লক্ষণ এখনো কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। ফলে ভয়ের বদলে এখন সবার মনে রয়েছে পরিতৃপ্তি। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, সরল গাণিতিক হিসাব বলছে, সম্পদের সসীম পরিমাণ চিরকাল ধরে নির্দিষ্ট হারে কমতে থাকতে পারে না। আজ হোক, কাল হোক, জ্বালানি ঘাটতির মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে। পৃথিবীর জনসংখ্যা সম্পর্কেও একই কথা খাটে। অনির্দিষ্ট সময় ধরে এটা অব্যাহত থাকতে পারে না।

জেরেমিয়া ধর্মীয় গোষ্ঠীর কিছু কিছু মানুষ মনে করে, আসন্ন জ্বালানি-সংকট ও অতিজনসংখ্যার ফলে মানুষ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে জীবাশ্ম জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে গেলেই মানুষেরও অবসান ঘটে যাবে, এটা বলা যাবে না। আমাদের চারপাশে জ্বালানির বিপুল উৎস রয়েছে। অবশ্য সেটা কাজে লাগানোর মতো বুদ্ধিমত্তা থাকা চাই। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আমাদের যতটুকু শক্তি দরকার, সূর্যের আলোতে তার চেয়ে বেশি শক্তি রয়েছে। আরেকটি বড় সমস্যাও আছে। হয়তো জনসংখ্যার বৃদ্ধি আমরা কমানোর আগেই খাদ্যাভাবে সেটা এমনিতেই কমে যাবে। এর জন্য বৈজ্ঞানিক কৌশলের চেয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কৌশল বেশি প্রয়োজন। তবে আমার বিশ্বাস, জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে শক্তির

যে ঘাটতি তৈরি হবে, সেটার সমাধান করা গেলে এবং আমাদের গ্রহের বাস্তুগত ও গ্রহাণুর আঘাতজনিত ক্ষতি কমিয়ে আনা গেলে, মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। মানবজাতির ভবিষ্যৎকে সীমিত করার মতো স্পষ্ট কোনো নিয়ম প্রকৃতিতে চোখে পড়ছে না।

আগের অধ্যায়গুলোতে আমি বলেছি, কীভাবে অসম্ভব দীর্ঘ সময় পর মহাবিশ্বের কাঠামো বদলে যাবে। সাধারণত এর মাধ্যমে ধীরগতির ভৌত প্রক্রিয়ার প্রভাবে মহাবিশ্ব নিজের বৈশিষ্ট্যগুলো হারাবে। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব আছে প্রায় ৫০ লাখ বছর হলো (এটা নির্ভর করে মানুষের সংজ্ঞার ওপর)। আর সভ্যতার সূচনা কয়েক হাজার বছর আগে। এখন থেকে আরও ২০০ বা ৩০০ কোটি বছর পৃথিবী বাসযোগ্য থাকবে। তবে জনসংখ্যা অবশ্যই কমে যাবে। সময়টা এত দীর্ঘ যে সেটা কল্পনা করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একে এতই বড় মনে হয় যে সেটাকে বাস্তবে অসীম সময় বলে মনে হয়। তবু আমরা দেখেছি, মহাবিশ্বের জন্ম, ক্রমবিকাশের জন্য যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, সে তুলনায় ১০০ কোটি বছরও খুব নস্যি। আরও বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পরও আমাদের ছায়াপথের অন্য কোথাও পৃথিবীর মতো আবাস থাকতেই পারে।

আমরা কল্পনা করতেই পারি, আমাদের বংশধরেরা এত সময় হাতে পেয়ে মহাশূন্যে ছুটে বেড়াবে। বানাবে সব ধরনের বিস্ময়কর যন্ত্রপাতি। সূর্য পৃথিবীকে পুড়িয়ে ফেলার আগে আগে পালানোর যথেষ্ট সময় তারা পাবে। খুঁজে নিতে পারবে অন্য এক গ্রহ। তারপর আরেকটি। তারপর আরেকটি। মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়লে জনসংখ্যাও বাড়বে। এটা জেনে কি আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি যে বিশ শতকে আমাদের টিকে থাকার লড়াই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ না-ও হতে পারে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি বলেছি, বার্ট্রান্ড রাসেল তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের ফলাফল নিয়ে হতাশাচ্ছন্ন ছিলেন। যন্ত্রণাভরে তিনি লিখেছিলেন, যেহেতু সৌরজগৎ একসময় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাই মানুষের অস্তিত্বও একসময় নিষ্ফল হবে। রাসেল স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, আমাদের বাসস্থানের স্পষ্ট অনিবার্য মৃত্যু কোনোভাবে মানবজীবনকে অর্থহীন কিংবা প্রহসনে পরিণত করেছে। এটা নিশ্চিত, এই বিশ্বাস তাঁকে নাস্তিক বানানোর পথে অবদান রেখেছে। ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষীয় শক্তি সূর্যের বহুগুণ বেশি এবং সৌরজগৎ তছনছ হয়ে যাওয়ারও লাখো-কোটি বছর পর্যন্ত টিকে থাকবে জানলে কি তিনি আরেকটু ভালো অনুভব করতেন? আসলে সময়টা কত দীর্ঘ, সেটা মুখ্য নয়। মূল বিষয় হলো, আজ হোক, কাল হোক, মহাবিশ্ব একসময় বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। এ কারণে কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের অস্তিত্ব অর্থহীন।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে মহাবিশ্বের দূর ভবিষ্যতের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। হয়তো আমরা ধরে নিতে পারি, আরও কম পরিবর্তনযোগ্য ও বেশি বৈরী পরিবেশ তৈরি হবে না বললেই চলে। তবে আমাদের ভাবনাই যে সঠিক, সেটা ধরে নেওয়া যাবে না। আবার হতাশও হওয়া যাবে না। ইলেকট্রন ও পজিট্রন দিয়ে গড়া এক পাতলা স্যুপের মতো মহাবিশ্বে বাস করা মানুষের পক্ষে নিঃসন্দেহে কঠিন হবে। তবে আমাদের কথা সেখানে নয়। অবশ্যই মানবপ্রজাতি অমর কি না, আমরা সেটা নিয়ে কথা বলছি না। আমাদের বংশধরেরা টিকে থাকতে পারবে কি না, সেটা বলছি। আর আমাদের বংশধরেরা যে মানুষই হবে, তার সম্ভাবনাও কম।

বৈজ্ঞানিক কোনো পদ্ধতিতে[২] পৃথিবীতে হোমো স্যাপিয়েন্সদের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু আমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়া খবু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আমরা হস্তক্ষেপ করে ফেলেছি। মিউটেশন বা পরিব্যক্তিকেও নিয়ন্ত্রণ করা দিন দিন সহজ হয়ে যাচ্ছে। জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যেমে খুব দ্রুতই হয়তো আমরা ইচ্ছেমতো গুণ ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ বানাতে পারব। জৈবপ্রযুক্তির এই সম্ভাবনাগুলো মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে তৈরি হয়েছে। একবার ভাবুন, হাজার হাজার বা লাখো বছরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চার মাধ্যমে কী সম্ভব হতে পারে।

মাত্র কয়েক দশকেই মানুষ গ্রহ থেকে বের হয়ে নিকট মহাকাশে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো পৃথিবী ছাড়িয়ে সৌরজগতের আরও দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে। তারপর যাবে ছায়াপথের অন্য নক্ষত্রে। অনেক সময় মানুষ ভুল করে মনে করে, এ কাজ করতে অসীম সময় লাগবে। আসলে তা নয়। বসতি গড়ার প্রক্রিয়াটি হয়তো হবে বারবার গ্রহান্তরের মাধ্যমে। বসতি স্থাপনকারীরা পৃথিবী ছেড়ে কয়েক আলোকবর্ষ দূরের অন্য কোনো উপযুক্ত গ্রহে ঠাঁই নেবে। আলোর কাছাকাছি বেগে চলতে পারলে তাতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক বছর। আমাদের বংশধরেরা আলোর এক ভাগের মতো যথেষ্ট গতি অর্জন করতে না পারলেও ভ্রমণে সময় লাগবে মাত্র কয়েক শ বছর। নতুন একটি বসতি পুরোপুরি গড়ে তুলতে হয়তো আরও কয়েক শ বছর লাগবে। ততক্ষণে নতুন কোনো গ্রহের সন্ধানে এক দল অভিযাত্রীকে পাঠিয়ে দেওয়ার চিন্তা করা যাবে। আরও কয়েক শ বছর পর সেই গ্রহেও বসতি গড়ে উঠবে। এভাবেই চলতে থাকবে। পলিনেশীয়রা মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপগুলোতে এভাবেই বসতি নির্মাণ করেছিল।

ছায়াপথকে অতিক্রম করতে আলোর এক লাখ বছর সময় লাগে। আলোর বেগের এক ভাগ বেগে চললে তাতে সময় লাগবে এক কোটি বছর। এই

যাত্রাপথে এক লাখ গ্রহে বসতি স্থাপন করা গেলে এবং প্রতিটির জন্য ২০০ বছর লাগলে পুরো ছায়াপথে বসতি গাড়তে ছায়াপথ পার হওয়ার সময়ের তিন গুণের বেশি সময় লাগবে না। তবে মহাকাশ বা ভূতাত্ত্বিক মাপকাঠির তুলনায় এক কোটি বছর খুব অল্প সময়। সূর্য পুরো ছায়াপথকে একবার ঘুরে আসতে প্রায় ২০ কোটি বছর সময় নেয়। এর অন্তত ১৭ গুণ সময় ধরে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। সূর্যের বার্ধক্যের কারণে পৃথিবী বিপদে পড়তে মাত্র দুই বা তিন শ কোটি বছর লাগবে। ফলে আরও তিন কোটি বছরে খুব অল্প পরিবর্তনই ঘটবে। তার মানে বলতে চাচ্ছি, পৃথিবীর বুকে প্রযুক্তিগত সভ্যতা গড়ে উঠতে যতটুকু সময় লেগেছে, পুরো ছায়াপথে বসতি গড়তে তার খুব সামান্য ভগ্নাংশের সমান সময় লাগবে।

বসতি গড়ে তোলা আমাদের এই বংশধরেরা কেমন হবে? কল্পনার ঘোড়াকে ইচ্ছেমতো ছুটতে দিলে আমরা ধারণা করতে পারি, জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা কাঙ্ক্ষিত গ্রহের পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে। একটি সরল উদাহরণ চিন্তা করি। ধরা যাক, এপসাইলন এরিডানি নক্ষত্রের চারপাশে ঘূর্ণমান পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ পাওয়া গেল। দেখা গেল, এর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন আছে মাত্র ১০ শতাংশ। তাহলে অধিবাসীদের দেহকে পরিবর্তন করে লোহিত রক্তকণিকা বাড়াতে হবে। গ্রহটির পৃষ্ঠের মহাকর্ষ বেশি হলে অধিবাসীদের দেহকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে হবে। হাড়কেও শক্ত করতে হবে। এভাবেই সবকিছু বদলে নিতে হবে।

এই ভ্রমণের জন্য যা যা লাগবে, তাতে সমস্যাও হওয়ার কথা নয়, যদি তাতে কয়েক শ বছর লাগে তবুও। মহাকাশযানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে বানানো যেতে পারে, যা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অভিযাত্রীদের কয়েক প্রজন্ম ধরে আবাসন দিতে সক্ষম হবে। আবার অভিযাত্রীদের ভ্রমণের সময় তীব্র ঠান্ডা পরিবেশে জমিয়ে রাখা যেতে পারে[৩]। সত্যি বলতে, ছোট একটি যানে অল্প কিছুসংখ্যক কর্মীসহ লাখো হিমায়িত নিষিক্ত কোষ পাঠানোই বেশি যুক্তিসংগত হবে। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর সেগুলো থেকে জন্ম নেবে মানুষ। এতে করে নতুন গ্রহে তাৎক্ষণিকভাবে একদল অধিবাসী পাওয়া যাবে। বিপুল পরিমাণ বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবহনের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হবে না।

আরেকটি বিষয়—আমাদের ধরে নিতে হচ্ছে, এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছু হওয়া সম্ভব। ফলে ভবিষ্যতে বসতি গাড়া মানুষগুলো যে চেহারা-সুরত বা মানসিকতায় যে মানুষের মতোই হবে, সেটা ভাবারও কোনো কারণ নেই। যদি মানুষকে প্রয়োজন অনুসারে বদলে নেওয়া নেওয়া যায়, তাহলে প্রতিটি অভিযানেই প্রস্তাবিত নকশা অনুসারে প্রাণী বানিয়ে নেওয়া যায়, যাতে থাকে উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ শরীর ও মনের সমন্বয়।

বসতি স্থাপনকারীদের সাধারণ সংজ্ঞার জীবিত প্রাণীও হতে হবে না। এখনই মানুষের মধ্যে সিলিকন-চিপের মাইক্রোপ্রসেসর স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রযুক্তি আরও উন্নত হলে জৈব ও কৃত্রিম বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের মিশ্রণ হতেই পারে, যাতে করে শারীরবৃত্তিক কাজের পাশাপাশি মস্তিষ্কও ঠিকভাবে কাজ করবে। যেমন ধরুন, মানুষের মস্তিষ্কের জন্য স্মৃতি তৈরি করা যেতে পারে। অনেকটা কম্পিউটারের যেভাবে অতিরিক্ত মেমোরি লাগানো হয়। উল্টোভাবে আবার এমনও হতে পারে, জৈব পদার্থর জন্যে যন্ত্রাংশ তৈরির চেয়ে হিসাব-নিকাশ করার প্রতি অভ্যস্ত হওয়া বেশি কার্যকর হবে। তার মানে, কম্পিউটারের যন্ত্রাংশগুলোকে জৈব উপায়ে বিকশিত করা যাবে। ডিজিটাল কম্পিউটারের বদলে নিউরাল নেট চলে আসার সম্ভাবনা আরও বেশি। এমনকি এখনই ডিজিটাল কম্পিউটারের নিউরাল নেট ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে উদ্দীপিত করা হচ্ছে। পূর্বানুমান করা হচ্ছে অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আচরণ। মস্তিষ্কের টিস্যুর একটি অংশ নিয়ে তা দিয়ে শুরু থেকেই জৈব নিউরাল নেট বানানোটাই হয়তো আরও বেশি অর্থপূর্ণ হবে। জৈব ও কৃত্রিম নেটওয়ার্কের একটি বন্ধন তৈরি হবে খুবই যুক্তিসংগত। ন্যানোপ্রযুক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবিত ও মৃত, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম, মস্তিষ্ক ও কম্পিউটারের পার্থক্য ক্রমেই ছোট হয়ে আসবে।

বর্তমানে এসব অনুমান বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতেই শুধু পাওয়া যায়। এগুলো কি বৈজ্ঞানিক বাস্তবে পরিণত হতে পারে? আর যা-ই হোক, আমরা কোনো কিছু অনুমান করতে পারি বলেই যে সেটা সত্যি হয়ে যাবে, এমন কোনো কথা নেই। তবে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেমন নীতি প্রয়োগ করেছি, সেটা করতে পারি প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও। যথেষ্ট বেশি সময় পাওয়া গেলে যা যা ঘটতে পারে, তার সবই ঘটবে। যদি মানুষ বা তাদের বংশধরেরা যথেষ্ট উৎসাহী থাকে (এটা হয়তো অনেক যদি-কিন্তুর ব্যাপার), তাহলে পদার্থবিদ্যার সূত্র ছাড়া আর কিছুই প্রযুক্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এক প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের জন্য মানব জিনোম প্রকল্প কষ্টসাধ্য এক কাজ। কিন্তু শত শত, হাজার হাজার বা লাখো প্রজন্ম এই কাজ করতে থাকলে কাজটি হয়ে যাবে অনায়াসেই।

আশাবাদীই হওয়া যাক। ধরুন আমরা বেঁচে যাব। আর আমাদের প্রযুক্তির উন্নয়ন সর্বোচ্চ শিখরে যেতে থাকবে। মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা কী হবে? ধরুন, উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বুদ্ধিমান জীব বানানো সম্ভব হলো। এর ফলে এখন যেসব বৈরী জায়গায় প্রতিনিধি পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, সেখানেও সেটা করা যাবে। এই প্রাণীগুলো মনুষ্য-নির্মিত প্রযুক্তিরই ফসল হলেও এরা নিজেরা কিন্তু মানুষ হবে না।

এই অদ্ভুত প্রাণীগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের কি চিন্তিত হওয়া উচিত? মানুষের বদলে এ ধরনের দানব চলে আসতে পারে, ভাবলেই অনেকের মধ্যে বিরক্তি কাজ করে। টিকে থাকার জন্য জিনপ্রকৌশলের মাধ্যমে নির্মিত জৈব রোবটের কাছে জায়গা ছেড়ে দিতে হলে হয়তো দেওয়াই উচিত। তবুও মানুষের অবসান যদি আমাদের হতাশ করে, তাহলে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, আমরা মানুষের ঠিক কোন জিনিসটি সংরক্ষণ করতে চাই। অবশ্যই আমাদের শারীরিক আকৃতি নয়। আজ থেকে ১০ লাখ বছর পরে আমাদের বংশধরদের পায়ের আঙুল না-ও থাকতে পারে, শুনলে কি আমাদের খারাপ লাগবে? অথবা পা ছোট হয়ে গেলে? কিংবা মাথা বা মস্তিষ্ক বড় হয়ে গেলে? আমাদের শারীরিক আকৃতি তো গত কয়েক শতাব্দীতে অনেক পাল্টেছে। এখনো বিভিন্ন গোত্রের মানুষের মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য আছে।

আমার মনে হয়, কিছু একটা বলতে বললে বেশির ভাগ মানুষ মানবিক চেতনাকে গুরুত্ব দেবেন। আমাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, স্বতন্ত্র মানসিক গঠন ইত্যাদি। আমাদের শৈল্পিক, বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনের ক্ষেত্রে এমনটাই দেখা গেছে। এই জিনিসগুলো অবশ্যই সংরক্ষণ করে রাখার মতো। আমরা আমাদের বংশধরদের কাছে মানবিকতা রেখে যাওয়া নিশ্চিত করতে পারলে শারীরিক আকৃতিতে কী এসে যায়? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা তো অর্জিত হচ্ছেই।

মহাশূন্যময় ঘুরে বেড়ানো মানুষের মতো প্রাণী তৈরি করা সম্ভব কি না, সেটা বড়সড় অনুমান না করে বলার উপায় নেই। অন্য কিছু না হলেও এটা হতে পারে যে মানুষ এত বড় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনাটুকু হারিয়ে ফেলবে। অথবা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত বা অন্য কোনো দুর্যোগের ফলে এই গ্রহটিকে ছেড়ে যাওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা বাস্তবায়নের আগেই আমাদের মৃত্যু ঘটবে। আবার এও হতে পারে, পৃথিবীর বাইরের বুদ্ধিমান প্রাণীরা আমাদের চেয়ে একধাপ এগিয়ে গেছে। বাসযোগ্য বেশির ভাগ গ্রহই হয়তো ওরা দখল করে ফেলেছে (তবে অবশ্যই পৃথিবীকে দখল করতে পারেনি)। তবে পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে প্রযুক্তির সাহায্যে তা নিয়ন্ত্রণ করার কাজটি কি আমাদের কোনো বংশধর করবে, নাকি কোনো ভিনগ্রহের প্রাণীরা করবে, সেটা বলা যাচ্ছে না। আবার ধীরগতিতে মহাবিশ্বের বিনাশকে এমন উন্নত প্রজাতি কীভাবে মোকাবিলা করবে, সে প্রশ্নও মাথায় আসা স্বাভাবিক।

সপ্তম অধ্যায়েই বলেছি, মহাবিশ্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হবে অত্যন্ত ধীরগতিতে। ফলে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বহু দূরের ভবিষ্যতের প্রযুক্তি কেমন হবে, সেটা অনুমান করা অর্থহীন। এক লাখ কোটি বছর একটি প্রযুক্তিগত সমাজের কথা তো চিন্তা করাও কঠিন। মনে হতে পারে, তারা

যেকোনো কিছু অর্জন করতে পারবে। কিন্তু একটি প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, তাকে পদার্থবিদ্যার মৌলিক সূত্রগুলো মানতেই হবে। যেমন ধরুন, আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সঠিক। কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে যেতে পারে না। ফলে লাখো কোটি বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেলেও আলোর বেগের এই বাধা পার হওয়া সম্ভব হবে না। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, ভালো কিছু করতে গেলেই কিছু না কিছু শক্তি ব্যয় হয়। ফলে মহাবিশ্বের মুক্ত শক্তির উৎস ক্রমেই খালি হয়ে যাচ্ছে, যা প্রযুক্তি সমাজের জন্য এক বিরাট সমস্যা। সে যত উন্নত সভ্যতাই হোক না কেন।

সর্বোচ্চ শ্রেণির বুদ্ধিমান জীবের ক্ষেত্রে মৌলিক প্রাকৃতিক নীতিগুলো প্রয়োগ করে আমরা যাচাই করতে পারি, মহাবিশ্বের ক্ষয়ের ফলে দূর ভবিষ্যতে প্রাণীদের টিকে থাকতে সত্যিকারের মৌলিক কোনো সমস্যা হবে কি না। একটি জীবকে বুদ্ধিমান হতে হলে একে অন্তত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারতেই হবে। এর জন্য মহাবিশ্বের ভৌত অবস্থাকে কেমন হতে হবে, তা জানা দরকার।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে শক্তি খরচ হয়। এ কারণেই যে ওয়ার্ড প্রসেসরে আমি এই বইটি টাইপ করছি, সেটি প্রধান বৈদ্যুতিক সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত আছে। প্রতি বিট তথ্যের জন্য কী পরিমাণ শক্তি খরচ হবে, সেটা নির্ভর করে তাপগতীয় প্রক্রিয়ার ওপর। প্রসেসরের পরিবেশের তাপমাত্রার কাছাকাছি তাপমাত্রায় কাজ করলে খরচ হয় সবচেয়ে কম। মানুষের মস্তিষ্ক ও বেশির ভাগ কম্পিউটারের কর্মদক্ষতা খুবই কম। তাপ আকারে বেরিয়ে যায় প্রচুর পরিমাণ বাড়তি শক্তি।

উদাহরণস্বরূপ, দেহের তাপের বড় একটি অংশ মস্তিষ্কই তৈরি করে। গলে যাওয়া থেকে বাঁচাতে অনেক কম্পিউটারেই শীতলীকরণ ব্যবস্থা রাখতে হয়। এই তাপ অপচয়ের মূল কারণ খুঁজলে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কৌশলটাই পাওয়া যাবে। ঠিক এই কারণেই আবার তথ্য হারিয়েও যায়। যেমন ধরুন একটি কম্পিউটার দিয়ে হিসাব করা হলো ১ +২ = ৩। তাহলে দুই বিট তথ্য (১ ও ২) সরিয়ে এক বিট তথ্য (৩) পাওয়া গেল। হিসাব শেষ হওয়ার পর কম্পিউটার আগের তথ্য ফেলে দিতে পারে। ফলে দুই বিটের বদলে এক বিট তথ্য থাকল। সত্যি বলতে, কম্পিউটারের মেমোরির চাপ কমাতে এ ধরনের বাড়তি তথ্য সব সময়ই ফেলে দিতে হয়। সংজ্ঞানুসারেই মুছে ফেলার এই প্রক্রিয়া অফেরতযোগ্য। এর ফলে কিন্তু বেড়ে যায় এনট্রপি[৪]। ফলে বোঝা যাচ্ছে, একেবারে মৌলিক কারণে তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের কারণে অনিবার্য ও অফেরতযোগ্য উপায়ে বিদ্যমান শক্তি কমে যাচ্ছে। আর বাড়ছে মহাবিশ্বের এনট্রপি।

মহাবিশ্ব শীতল হতে হতে তাপীয় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলে বুদ্ধিমান জীবেরা কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হবে, তা নিয়ে ফ্রিম্যান ডাইসন ভেবেছেন। শুধু চিন্তা করার জন্যও এই জীবদের একটি নির্দিষ্ট হারে শক্তি খরচ করতে হয়। প্রথম অসুবিধা হলো জীবদের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হতে হবে। তা না হলে অতিরিক্ত তাপ তাদের শরীর থেকে বের হতে পারবে না। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, একটি ভৌত ব্যবস্থা কী হারে পরিবেশে শক্তি বিকীর্ণ করবে, তা পদার্থবিদ্যার সূত্র মেনে চলতে বাধ্য। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, জীবেরা যে হারে অতিরিক্ত তাপ থেকে মুক্ত হবে, তার চেয়ে বেশি হারে সে ধরনের তাপ শরীরে তৈরি হলে বেশি দিন বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। ফলে কী হারে তাপ খরচ হবে, তার একটি নিম্নসীমা নির্ধারিত আছেই। ফলে একটি অনিবার্য প্রয়োজন হলো, শক্তির মুক্ত একটি উৎস থাকতেই হবে, যাতে তাপের এই প্রবাহ অবিরাম চলতে পারে। ডাইসনের মতে, মহাবিশ্বের দূর ভবিষ্যতে এ ধরনের সব উৎসই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার মানে সব বুদ্ধিমান জীবই একসময় শক্তির সংকটের মুখে পড়বে।

এখন, বুদ্ধিমান জীবেরা দুই উপায়ে আয়ু বাড়াতে পারে। একটি হলো, যত দিন সম্ভব বেঁচে থাকা। আরেকটি হলো, চিন্তা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের হার বাড়ানো। ডাইসন এ ক্ষেত্রে একটি যৌক্তিক অনুমান করেছেন। একটি জীবের জন্য সময় অতিবাহিত হওয়ার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ওই জীবের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের হারের ওপর নির্ভর করে। প্রক্রিয়া যত দ্রুত চলবে, একক সময়ে তত দ্রুত চিন্তা ও অনুভূতি সম্পন্ন হবে। সময়ও তত দ্রুত চলবে বলে মনে হবে। রবার্ট ফোরওয়ার্ডের 'ড্রাগন'স এগ সায়েন্স ফিকশনে' এই অনুমান বেশ রসাত্মকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে একদল বুদ্ধিমান জীবের গল্প বলা হয়েছে। এরা বাস করে একটি নিউট্রন নক্ষত্রের পৃষ্ঠে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বদলে নিউক্লীয় প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। এরা তথ্য প্রসেস করে অনেক দ্রুত। মানুষ এক সেকেন্ডে যা করে, তারা সেই সময়ে বহু বছরের কাজ করে ফেলে। মানুষের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় তারা বেশ আদিম ছিল। কিন্তু মিনিটের মধ্যে তারা পরিস্থিতি বুঝে ফেলে ও মানুষকে পরাজিত করে।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, দূর ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার জন্য এই কৌশল গ্রহণ করলে অসুবিধা আছে। তথ্য যত দ্রুত প্রসেস হবে, শক্তি খরচের হারও তত দ্রুত হবে। শক্তির জোগানও তত দ্রুত খালি হয়। হয়তো ভাবছেন, এর ফলে আমাদের বংশধরেরা তো তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। সে তাদের দৈহিক আকৃতি যা-ই হোক না কেন। কিন্তু সেটা না-ও হতে পারে। ডাইসন দেখিয়েছেন, একটি কৌশল করে দুটোর মধ্যে সমন্বয় করা যাবে। মহাবিশ্বের

ক্ষয়ের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করতে প্রাণীরা তাদের কর্মকাণ্ডের হার আস্তে আস্তে কমিয়ে আনবে। যেমন ধরুন, ক্রমেই বেশি সময়ের জন্য তারা শীতনিদ্রায় অবস্থান করবে। প্রতিটি শীতনিদ্রার সময় আগের সক্রিয় মেয়াদের কাজের ফলে সৃষ্ট তাপ বেরিয়ে যাবে। আর জমা হবে প্রয়োজনীয় শক্তি, যা ব্যবহার করা যাবে পরের সক্রিয় মেয়াদে।

এই কৌশল গ্রহণ করা জীবদের অতিবাহিত সময় সত্যিকার সময়ের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশ হতে থাকবে। কারণ, এদের নিষ্ক্রিয় অবস্থা ক্রমেই বড় হতে থাকবে। কিন্তু আমি অনেকক্ষণ ধরেই বলছি, চিরকাল একটি দীর্ঘ সময়। ফলে বিপরীতমুখী দুটি স্রোতের মধ্যে আমরা বাঁধা। সম্পদ ক্রমেই ফুরিয়ে যাবে। আর সময় ক্রমেই বেড়ে চলবে অসীমের দিকে। এই সীমাগুলোকে সরল উপায়ে পরীক্ষা করে ডাইসন দেখেছেন, মোট সম্পদের পরিমাণ সসীম হলেও মোট আপেক্ষিক সময় অসীম হতে পারে। তিনি অসাধারণ একটি তথ্য দিয়েছেন। বর্তমানে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে এত সংখ্যক জীব ৬×১০^{৩০} জুল শক্তি দিয়েই আক্ষরিক অর্থে অনন্তকাল বাঁচতে পারবে। সূর্য আট ঘণ্টা জ্বললেই এই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়।

তবে সত্যিকারের অমরত্ব পেতে হলে অসীম পরিমাণ তথ্য প্রসেস করতে পারলেই চলবে না। একটি জীবের মস্তিষ্কের অবস্থার সংখ্যা সসীম হলে সে শুধু সসীমসংখ্যক আলাদা চিন্তা করতে পারবে। চিরকাল বেঁচে থাকতে হলে এক চিন্তাই অনেকবার করতে হবে। এ ধরনের বেঁচে থাকাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক প্রজাতির মতোই অর্থহীন মনে হয়। এটা থেকে বাঁচতে চাইলে ওই সম্প্রদায় বা মহাপ্রাণীটাকে ক্রমেই বড় হতে থাকতে হবে। অনেক দূরের ভবিষ্যতে এটা করতে যাওয়া অনেক কঠিন কাজ হবে। কারণ, বস্তুকে যে গতিতে মস্তিষ্কের অংশ বানানো যাবে, তার চেয়ে বেশি গতিতে বস্তু বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বাড়িয়ে নিতে বেপরোয়া ও বিচক্ষণ কোনো জীব হয়তো সব সময় হাতের সামনে পড়ে থাকা দুর্লভ্য মহাজাগতিক নিউট্রিনো থেকে শক্তি আহরণ করবে।

ডাইসনের কথাবার্তার অনেকাংশজুড়েই ভেতরে ভেতরে ধরে নেওয়া হয়েছে, এসব জীবের মানসিক চিন্তার গতি ডিজিটাল কম্পিউটারের হিসাবের গতির সমান হয়ে যাবে। দূর ভবিষ্যতের জীবদের ভবিষ্যৎ নিয়ে করা বিভিন্ন অনুমানেও আসলে তা-ই ধরে নেওয়া হয়। ডিজিটাল কম্পিউটার অবশ্যই সসীম অবস্থাসম্পন্ন একটি মেশিন। ফলে এর কাজের সম্ভাব্য পরিধি সীমিত। তবে অ্যানালগ কম্পিউটার নামে অন্য ধরনের যন্ত্রও আছে। ডিজিটাল কম্পিউটারের কিছু সীমাবদ্ধতা অ্যানালগ কম্পিউটারে নেই। ডিজিটাল কম্পিউটার শুধু সসীম পরিমাণ তথ্য জমা ও প্রসেস করতে

পারে। ধরুন, অ্যানালগ কম্পিউটারের মতো করে তথ্য এনকোড করা হলো। ধরুন যে জড়বস্তুর কোণের অবস্থানের মাধ্যমে সেটা করা হলো। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ধারণক্ষমতাকে অসীম মনে হবে। ফলে একটি মহাপ্রাণী অ্যানালগ কম্পিউটারের মতো করে কাজ করতে পারলে এটি শুধু অসীমসংখ্যক চিন্তাই করতে পারবে না, হয়তো অসীমসংখ্যক আলাদা চিন্তাও করতে পারবে।

কিন্তু সার্বিকভাবে মহাবিশ্ব অ্যানালগ নাকি ডিজিটাল কম্পিউটারের মতো, সেটা আমরা জানি না। কোয়ান্টাম ফিজিকস বলছে, মহাবিশ্ব নিজেও কোয়ান্টায়িত বা ছিন্নায়িত। মানে অংশে অংশে বিভক্ত। অর্থাৎ, এটি নিরবচ্ছিন্ন তারতম্যের বদলে বিচ্ছিন্ন অংশে সবগুলো বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। তবে এটি শুধুই একটি ধারণা। আমরা মানসিক ও জড় মস্তিষ্কের মধ্যকার সম্পর্কও সঠিকভাবে বুঝি না। আমরা তো এখানে কোয়ান্টাম ফিজিকসের ধারণা নিয়ে কথা বললাম। তার সঙ্গে চিন্তা ও অভিজ্ঞতাগুলোর সম্পর্ক না-ও তো থাকতে পারে।

তবে মন যেমনই হোক না কেন, দূর ভবিষ্যতের জীবেরা যে শেষ পর্যন্ত জ্বালানির সংকটে পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মহাবিশ্বের সব শক্তি একদিন নিঃশেষ হবেই। তবুও এটাকে মোকাবিলা করে তারা একধরনের অমরত্ব লাভ করতে পারে। ডাইসনের তুলে ধরা চিত্রে জীবের প্রয়োজনের প্রতি মহাবিশ্বের কোনো নজরই থাকবে না। তাদের কর্মকাণ্ডও মহাবিশ্বকে ক্রমাগত কম প্রভাবিত করতে থাকবে। অপরিসীম সময় ধরে জীবেরা থাকবে নিষ্ক্রিয়। স্মৃতি থাকবে। কিন্তু স্মৃতিতে নতুন কিছু যুক্ত হবে না। মুমূর্ষু মহাবিশ্বের স্থির অন্ধকারে উঠবে না কোনো আলোড়ন। একটু বুদ্ধি খরচ করে ওরা হয়তো এখনো অসীমসংখ্যক চিন্তা করতে পারবে। অসীমসংখ্যক অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে পারবে। আর কীই-বা আশা করার আছে?

বর্তমান সময়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অন্যতম ভুল ধারণা হলো মহাজাগতিক তাপীয় মৃত্যু। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে আপাতদৃষ্টে মহাবিশ্ব একসময় এর বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে ফেলবে। রাসেল ও আরও কেউ কেউ এই ধারণাকে ব্যবহার করে নাস্তিকতা, নাস্তিবাদ (nihilism) ও হতাশার দর্শন প্রমাণে ব্যস্ত হয়েছেন। বর্তমানে আমাদের কসমোলজির জ্ঞান আরও উন্নত হয়েছে। এখন আমরা একটু ভিন্ন চিত্র দেখছি। মহাবিশ্ব হয়তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর উপাদান শেষ হয়ে যাচ্ছে না। হ্যাঁ, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের প্রয়োগ ঘটছে। কিন্তু এর কারণে সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটবে বলার উপায় নেই।

আসলে ডাইসন যেমন বলেছেন, বাস্তবে পরিস্থিতি এতটা খারাপ না-ও হতে পারে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি ধরে নিয়েছি, প্রসারিত ও শীতল হতে হতেও

মহাবিশ্ব কম-বেশি সুষম (একই রকম) থাকে। কিন্তু এটা ভুলও হতে পারে। মহাকর্ষ বহু রকম অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়। বর্তমানে বড় স্কেলে চিন্তা করলে আমরা মহাবিশ্বকে সুষম বা সব দিকে একই রকম দেখি। দূর ভবিষ্যতে হয়তো সেটি আরও জটিল কোনো দিকে মোড় নিতে পারে। যেমন ধরুন, আলাদা দিকে প্রসারণের হার সামান্য তারতম্যের ফল বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। বড় বড় ব্ল্যাকহোল নিজেদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের মাধ্যমে মহাজাগতিক প্রসারণের প্রভাব উপেক্ষা করে একীভূত হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থার কারণে একটি দারুণ লড়াই বাধবে। মনে করে দেখুন, একটি ব্ল্যাকহোল যত ছোট হবে, এর তাপমাত্রা তত বেশি। এটি বাষ্পীভূতও হয়ে যায় তত তাড়াতাড়ি। দুটো ব্ল্যাকহোল মিলিত হলে সমন্বিত ব্ল্যাকহোলটি আকারে বড় হবে। তার মানে, এর তাপমাত্রা হবে কম। ফলে এর বাষ্পীভবন বড় একটি সমস্যার মুখে পড়বে। তাহলে দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্ব সম্পর্কে মূল প্রশ্ন হলো, ব্ল্যাকহোলদের একীভবন তাদের বাষ্পীভবন ঠেকাতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারবে কি না। যদি পারে, তাহলে সব সময়ই কিছু ব্ল্যাকহোল হকিং বিকিরণের মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ করতে পারবে। উন্নত প্রযুক্তির কোনো জাতি সেই জ্বালানি ব্যবহার করে হয়তো শীতনিদ্রার প্রয়োজন থেকে মুক্তি পাবে। পদার্থবিদ ডন পেইজ ও র‍্যান্ডাল ম্যাককির হিসাব অনুসারে প্রসারণ ও সংকোচনের প্রভাব উনিশ-বিশ হবে। মহাবিশ্বের প্রসারণ হার কী হারে কমবে, সেটার ওপর এই লড়াইয়ের ফলাফল খুব বেশি নির্ভর করছে। কোনো কোনো নমুনা অনুসারে ব্ল্যাকহোলদের একীভবনই জয়ী হয়।

ডাইসনের বিবরণে আরও একটি বিষয়ও মাথায় রাখা হয়নি। এমনও তো হতে পারে যে নিজেদের আয়ু বাড়ানো আমাদের বংশধরেরা মহাবিশ্বের বড় স্কেলের কাঠামো পাল্টে ফেলার চেষ্টা করতে পারে। জ্যোতিঃপদার্থবিদ জন ব্যারো ও ফ্র্যাঙ্ক টিপলার এমন কিছু উপায় নিয়ে ভেবেছেন। উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন কোনো সম্প্রদায় হয়তো নিজেদের জন্য অনুকূল কোনো মহাকর্ষীয় বিন্যাস তৈরি করতে নক্ষত্রের চলাচলে সামান্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যেমন ধরুন, নিউক্লীয় অস্ত্র ব্যবহার করে গ্রহাণুর কক্ষপথ পাল্টে ফেলা যাবে। এর মাধ্যমে এটি কোনো গ্রহের মহাকর্ষীয় শক্তি অর্জন করে সূর্যে গিয়ে ধাক্কা লাগাতে পারবে। এই ধাক্কার ফলে ছায়াপথে সূর্যের কক্ষপথ সামান্য পাল্টে যাবে। এই প্রভাব ছোট। কিন্তু ধীরে ধীরে এর ফলাফল লক্ষণীয় হয়ে উঠবে। সূর্য যত দূরে সরবে, ততই দ্রুত দূরে সরতে থাকবে। বহু আলোকবর্ষের মতো দূরত্বে এই স্থানচ্যুতির ফলে সূর্য অন্য কোনো নক্ষত্রের কাছাকাছি চলে গেলে বড় ঘটনা দেখা যেতে পারে। হালকা একটি ধাক্কা থেকে হয়তো ছায়াপথে সূর্যের গতিপথে চলে আসবে আমূল পরিবর্তন।

অনেকগুলো নক্ষত্রের গতিপথ পাল্টালে নানান রকমের মহাজাগতিক বস্তু তৈরি করা যাবে। ব্যবহার করা যাবে জাতির কল্যাণে। আর ফলাফল ক্রমেই বড় হয়ে যায় বলে এর মাধ্যমে এখানে-সেখানে এক-আধটু পরিবর্তন করে করে যেকোনো আকারে ব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। যথেষ্ট দীর্ঘ সময় পেলে আমাদের বংশধরেরা নিজেদের জন্যে প্রচুর সময় হাতে পাবে। পুরো ছায়াপথও এভাবে দখলে আনা যেতে পারে।

বড় আকারের এই মহাজাগতিক কলাকৌশলগুলো প্রাকৃতিক ও দৈব ঘটনার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। সপ্তম অধ্যায়েই বলা হয়েছে, নক্ষত্র ও ছায়াপথগুলো মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ গুচ্ছ থেকে ছিটকে পড়তে থাকবে। ব্যারো ও টিপলার দেখেছেন, গ্রহাণুকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি ছায়াপথকে পুনর্বিন্যাস করতে $১০^{২২}$ বছর সময় লাগবে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা $১০^{১৯}$ বছরের মধ্যেই ঘটে। তার মানে দেখা যাচ্ছে, লড়াইয়ের ফল চলে যাচ্ছে প্রকৃতির পক্ষে। অন্যদিকে, আমাদের বংশধরেরা হয়তো গ্রহাণুর চেয়ে বড় আকারের জিনিসকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এ ছাড়া এই প্রক্রিয়াগুলো বস্তুগুলোর কক্ষপথের বেগের ওপরও নির্ভর করে। আমরা পুরো ছায়াপথ নিয়ে ভাবলে দেখব, মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই বেগগুলো কমে আসে। ফলে এগুলোকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেও সময় বেশি লেগে যাবে। তবে দুটো প্রভাব একই হারে কমবে না। দেখে মনে হচ্ছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার হার মহাবিশ্বকে পুনির্বিন্যাস করার হারের পেছনে পড়ে যাবে। এতে করে দারুণ একটি সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। ক্রমেই সম্পদ ফুরিয়ে যেতে থাকা মহাবিশ্বের ওপর বুদ্ধিমান জীবদের নিয়ন্ত্রণও ক্রমেই বাড়তে থাকবে। একটা সময় পুরো প্রকৃতি চলে আসবে প্রযুক্তির আওতায়। প্রাকৃতিক আর কৃত্রিম জিনিসের মধ্যে পার্থক্যই আর থাকবে না।

ডাইসনের বিশ্লেষণের আরেকটি বড় অনুমান হলো, চিন্তা করতে গেলে শক্তি খরচ হবেই। মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সত্যি। কয়েক দিন আগ পর্যন্তও ধরে নেওয়া হতো, যেকোনো রকম তথ্য প্রসেস করতে গেলেই একটি ন্যূনতম পরিমাণ তাপগতীয় মূল্য দিতেই হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এটা সব সময় সত্য নয়। কম্পিউটার বিজ্ঞানী চার্লস বেনেট ও রোলফ র‍্যানডৌর দেখিয়েছেন, নীতিগতভাবে প্রত্যাগামী (বিপরীত দিকেও কাজ করতে সক্ষম) হিসাবও সম্ভব। এর অর্থ হলো, কিছু কিছু ভৌত ব্যবস্থা অপচয় ছাড়াও তথ্য প্রসেস করতে পারে (বিষয়টি এখনো বাস্তবে করা সম্ভব হয়নি)। এমন একটি সিস্টেমের কথা চিন্তা করা যেতে পারে, যেটি কোনো ধরনের বিদ্যুৎ-সংযোগের প্রয়োজন ছাড়াই অসীমসংখ্যক চিন্তা সম্পন্ন করতে পারবে। এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে এ ধরনের একটি সিস্টেম একই সঙ্গে

তথ্য সংগ্রহ ও প্রসেস করতে পারবে কি না। কারণ, পরিবেশ থেকে কোনো অশূন্য তথ্য নিতে গেলে কোনো না কোনোভাবে শক্তি অপচয় হতে দেখা যায়ই। কারণ, গোলমেলে শব্দ থেকে বের করে নিতে হয় সঠিক সংকেত। ফলে বাইরের জগৎ সম্পর্কে এই সরল জীবের কোনো ধারণা থাকবে না। তবে অতীতের মহাবিশ্বের কথা তাদের মনে থাকবে। সেই জীব আবার স্বপ্নও দেখতে পারবে হয়তো।

এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের মৃত্যুপ্রক্রিয়া নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করছেন। এনট্রপির মাধ্যমে সৃষ্ট অপচয়ের মাধ্যমে আমাদের বাসস্থান মহাবিশ্ব যে নির্দিষ্ট হারে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, সেটি বিজ্ঞানি মহলের একটি সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাস কতটা প্রতিষ্ঠিত? আমি কি নিশ্চিত করে বলতে পারি সব ভৌত প্রক্রিয়া অনিবার্যভাবে বিশৃঙ্খলা ও ক্ষয়ের জন্ম দেয়?

সম্ভবত পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা ঘটেছে আদিম আঠালো কাদা থেকে। বর্তমান প্রাণিজগৎ বিশাল ও জটিল বাস্তুসংস্থানের অংশ। একটি জটিল ও অত্যন্ত বৈচিত্র্যে ভরপুর এক বিশাল জালে অণুজীবেরা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছে। জীববিজ্ঞানীরা অবশ্য বিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতির পক্ষের যেকোনো প্রমাণকে অস্বীকার করেন। হয়তো সেটা করেন ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে। তবে বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ সবাই ভালো করেই জানেন, পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের পর থেকে কমবেশি একই দিক বরাবর কিছু একটার উন্নতি ঘটেছে। সেই উন্নতিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করাই হলো সমস্যার কাজ। ঠিক কোন জিনিসটি উন্নত হয়েছে।

টিকে থাকা সম্পর্কিত এতক্ষণের আলোচনায় তথ্য (বা শৃঙ্খলা) ও এনট্রপির মধ্যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে, এনট্রপিই সব সময় জয়ী হয়। কিন্তু তথ্যই কি সেই জিনিস, যেটা নিয়ে আমাদের চিন্তিত হওয়া উচিত? আর যা-ই হোক, সম্ভাব্য সব রকম চিন্তা নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করা ফোনবুক পড়ার মতোই রোমাঞ্চকর কাজ। অভিজ্ঞতার মানই হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরও সার্বিকভাবে বললে সংগৃহীত ও ব্যবহৃত তথ্যের মান।

আমরা যত দূর জানি, কমবেশি বৈশিষ্ট্যহীন অবস্থায় মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে সমৃদ্ধি ও ভৌত ব্যবস্থার বৈচিত্র্য। তার মানে, মহাবিশ্বের ইতিহাস আসলে অর্গানাইজড বা সংগঠিত জটিলতা তৈরির ইতিহাস। শুনে একে প্যারাডক্স মনে হয়। আলোচনার শুরুতেই বলেছিলাম, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে মহাবিশ্বের মৃত্যু হচ্ছে। এটি প্রাথমিক সময়ের নিম্ন এনট্রপির অবস্থা থেকে সর্বোচ্চ এনট্রপির চূড়ান্ত অবস্থার দিকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু হচ্ছে সম্ভাবনাগুলোর। তাহলে পরিস্থিতি ভালো হচ্ছে, নাকি খারাপ হচ্ছে?

আসলে কিন্তু কোনো প্যারাডক্স নেই। কারণ অর্গানাইজড বা সংগঠিত জটিলতা এনট্রপি থেকে ভিন্ন জিনিস। এনট্রপি না বিশৃঙ্খলা হলো ঋণাত্মক তথ্য বা শৃঙ্খলা। আপনি যত বেশি তথ্য ব্যবহার করবেন, মানে যত বেশি বিন্যাস তৈরি করবেন, তত বেশি এনট্রপি তৈরি হয়ে যাবে। এক জায়গার শৃঙ্খলা অন্য জায়গার বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয় সূত্রটা এমনই। এনট্রপি সব সময় জয়ী হয়। তবে অর্গানাইজড বা সংগঠিত হওয়া ও জটিলতা বলতে সবসময় বিন্যাস আর তথ্যকেই বোঝায় না। এগুলো হলো নির্দিষ্ট ধরনের বিন্যাস ও তথ্য। যেমন ধরুন, একটি ব্যাকটেরিয়া ও একটি স্ফটিকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আমরা বুঝতে পারি। দুটোই বিন্যস্ত থাকে। তবে বিন্যস্ত থাকে ভিন্ন উপায়ে। একটি স্ফটিকের জাফরিতে থাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ সুষমতা। দারুণ সুন্দর হলেও বিরক্তিকর। অন্যদিকে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সংগঠিত একটি ব্যাকটেরিয়া দারুণ আকর্ষণীয়।

মনে হবে এই বিষয়গুলো ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে আলাদা হবে। তবে গণিতের মাধ্যমে এগুলোকে শক্ত ভিত্তি দেওয়া যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গবেষণার নতুন একটি শাখার উদ্ভব ঘটেছে। অর্গানাইজড বা সংগঠিত জটিলতার মতো ধারণাগুলোকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য। এটি সংগঠিত হওয়ার সাধারণ নীতিমালাও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সেগুলোকে স্থান করে দিতে চায় পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত নিয়মের পাশে। এই শাখাটি এখনো একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় আছে। কিন্তু বিন্যাস ও বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে প্রথাগত অনেক অনুমানকেই এটি হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে।

আমার *`À KmwgK RÂwKcU* বইয়ে আমি বলেছি, মহাবিশ্বে হয়তো তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের পাশাপাশি একধরনের 'জটিলতার বর্ধনশীল সূত্র' কাজ করছে। এই দুই সূত্রের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বাস্তবে একটি ভৌত ব্যবস্থার গঠনগত জটিলতা বাড়লে এনট্রপি বাড়ে। যেমন নতুন ও আরও বেশি জটিল প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। তবে তার আগে কিন্তু সংঘটিত হয় ধ্বংসাত্মক ভৌত ও জীব বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া (যেমন সঠিকভাবে অভিযোজিত হতে না পারা মিউট্যান্টদের[৫] অকালমৃত্যু)। এমনকি তুষারফলক তৈরির সময়ও অপ্রয়োজনীয় তাপ তৈরি হয়। আর এভাবেই বেড়ে চলে মহাবিশ্বের এনট্রপি। তবে আগেই ব্যাখ্যা করেছি, সব সময় যেকোনো কিছু অর্গানাইজড বা সংগঠিত হলেই এনট্রপি বাড়বে, তা নয়। কারণ সংগঠিত হওয়া এনট্রপির বিপরীত নয়।

আমি অত্যন্ত খুশি যে আরও অনেক গবেষক একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। জটিলতার 'দ্বিতীয় সূত্র'কে প্রতিষ্ঠিত করার একটি চেষ্টাও চলছে। এর সঙ্গে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের কোনো বিরোধ নেই। তবে জটিলতার সূত্রটি মহাজাগতিক পরিবর্তন সম্পর্কে ভিন্ন কথা বলছে। এটি বলছে, মূলত বৈশিষ্ট্যহীন

অবস্থা থেকে মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে আরও বিস্তারিত জটিল অবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে (এক অর্থে আগে উল্লিখিত গবেষণা অনুসারে সেটি আরও সুকঠিন হবে)।

মহাবিশ্বের শেষ অবস্থার কথা চিন্তা করলে জটিলতার বৃদ্ধিবিষয়ক সূত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। অর্গানাইজড বা সংগঠিত জটিলতা এনট্রপির বিপরীত না হলে ঋণাত্মক এনট্রপির স্বল্পতার কারণে জটিলতার সীমা বাধাগ্রস্ত হওয়ার কথা নয়। জটিলতা বাড়লে যে এনট্রপি বাড়ে, সেটা হয়তো নিতান্তই ঘটনাক্রমে ঘটে গেছে। এটা হয়তো বিন্যস্ত হওয়া বা তথ্য প্রসেস করার ক্ষেত্রে যেমন ঘটে, তেমন মৌলিক কোনো নিয়ম নয়। এটা সত্য হয়ে থাকলে আমাদের বংশধরেরা হয়তো ফুরিয়ে আসতে থাকা সম্পদের অপচয় ছাড়াই আরও বেশি সংগঠিত জটিল অবস্থা অর্জন করতে পারবে। হয়তো তারা তাদের ইচ্ছেমতো তথ্য প্রসেস করতে পারবে না। কিন্তু তাদের মানসিক ও শারীরিক কর্মকাণ্ডের সক্ষমতার সমৃদ্ধির অর্জনে কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না।

এই অধ্যায় ও সর্বশেষ অধ্যায়ে আমি মহাবিশ্বের গতি ধীর হয়ে যাওয়ার একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তবে গতি ধীর হয়ে গেলেও হয়তো কখনোই গতি থামবে না। আরও বলেছি, সায়েন্স ফিকশনের অদ্ভুত প্রাণীদের সামান্য উপকরণ দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টার গল্প, যেখানে চিরকাল তাদের মুখোমুখি হতে হয় প্রতিকূলতার। তাপগতিবিদ্যার নির্মম দ্বিতীয় সূত্রের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের মস্তিষ্কের সৃজনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। টিকে থাকার জন্য তাদের আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। সে প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হবেই, এমনটি বলার জো নেই। তাদের এ অবস্থার কথা ভেবে কোনো কোনো পাঠক হয়তো আনন্দ পাচ্ছেন। কেউবা আবার বিষণ্ণও হচ্ছেন। আমার নিজের প্রতিক্রিয়াটা মিশ্র।

তবে সবকিছুই অনুমান করা হয়েছে এটা ধরে নিয়ে যে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতেই থাকবে। আমরা দেখেছি, এটা আসলে নিছকই মহাবিশ্বের অনেকগুলো সম্ভাব্য পরিণতির মধ্যে একটি। প্রসারণ যথেষ্ট দ্রুত হারে কমে গেলে একদিন হয়তো বন্ধই হয়ে যাবে। শুরু হতে পারে সংকোচন। আর ঘটবে এক মহাসংকোচন। সে ক্ষেত্রে আমাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা কেমন?

তথ্যনির্দেশ

১. বইটি ১৯৯০-এর দশকে লেখা হয়েছিল। তবে আলোচ্য বক্তব্য এখনো সত্য।

২. বিজ্ঞান কী ও কীভাবে কাজ করে, তা নিয়ে পরিশিষ্ট অংশে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. অনেকটা সাপ বা ব্যাঙের শীতনিদ্রার মতো। এতে করে বেঁচে থাকার জন্য নিয়মিত খাবার গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। সঞ্চিত চর্বি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাওয়া যায়। এ সময় হৃৎস্পন্দন ও বিপাকের হার কমে যায়।

৪. পদার্থবিদ্যায় এনট্রপি বলতে বোঝায় শক্তি রূপান্তরের অক্ষমতা। অন্য অর্থে, এলোমেলো অবস্থার একটি পরিমাপ। যেমন কোনো তাকে অনেক বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলে বলা যাবে গুছিয়ে রাখা কোনো তাকের চেয়ে এর এনট্রপি বেশি। এলোমেলো বইগুলো গোছানো হলে তার এনট্রপি কমবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বের এনট্রপি কখনো কমে না। কারণ, ওই রুম গোছাতে গেলে মানুষ বা যন্ত্র যে কাজ করবে, তাতে সামগ্রিকভাবে এনট্রপি বাড়বেই। ফলে কিছু শক্তি অপচয় হবেই। কিছু শক্তি অরূপান্তরযোগ্য হয়ে যাবেই। আর ইনফরমেশন থিওরিতে এনট্রপি বলতে বোঝায় একটি ঘটনাকে প্রকাশ করতে গড়ে যে পরিমাণ বিট তথ্য প্রয়োজন। তবু দুটো আসলেই একই ধারণার ভিন্ন প্রকাশ।

৫. ডিএনএর জিনোম সিকোয়েন্স পাল্টে যাওয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন জীবকে মিউট্যান্ট বলে।

নবম অধ্যায়

দ্রুতগতির জীবন

চিরকাল বেঁচে থাকার জন্য মানুষ বা এলিয়েনদের সৃজনশীলতা কখনোই যথেষ্ট হবে না, যদি না 'চিরকাল' বলে কিছু একটা থাকে। মহাবিশ্ব একটি নির্দিষ্টসময় পর্যন্ত যদি টিকে থাকে, তাহলে তো অ্যারমাগেডন এড়ানোর কোনো উপায় নেই। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমি দেখিয়েছি, মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি কীভাবে এর মোট ভরের ওপর নির্ভর করে। মহাবিশ্ব হয় চিরকাল প্রসারিত হবে অথবা একসময় আবার গুটিয়ে যেতে থাকবে। পর্যবেক্ষণ বলছে, মহাবিশ্বের ভর এই দুই সংকট সীমারই খুব কাছাকাছি। একসময় মহাবিশ্ব আবার গুটিয়েই যেতে শুরু করলে আগের অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধিমান জীবের যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছি, সেটা একদম ভিন্ন রকম হয়ে যাবে।

মহাজাগতিক সংকোচনের প্রাথমিক অবস্থায় ভয়ের তেমন কিছুই নেই। একটি বল যেমন এর গতিপথের চূড়ায় ওঠে, তেমনি মহাবিশ্বও খুব ধীরে ভেতরের দিকে পতন শুরু করবে। আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি, মহাবিশ্ব ১০ হাজার কোটি বছর পর সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছাবে। তখনো প্রচুর নক্ষত্র জ্বলতে থাকবে। অপটিক্যাল টেলিস্কোপ দিয়ে আমাদের বংশধরেরা তখনো ছায়াপথের গতিপথ দেখতে পারবে। দেখা যাবে, ছায়াপথগুচ্ছরা ক্রমেই ধীরে দূরে সরছে। একসময় দূরে সরা বন্ধ করে আবার একে অপরের দিকে আসতে থাকবে। আমাদের বর্তমানে দেখা ছায়াপথগুলো সে সময় আরও চার গুণ দূরে থাকবে। মহাবিশ্বের বয়স বাড়ার কারণে সে সময়ের জ্যোতির্বিদেরা আমাদের চেয়ে দশ গুণ বেশি দূরের জিনিস দেখতে পারবেন[১]। ফলে আমাদের চেয়ে তাঁদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে ছায়াপথের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি হবে।

পুরো মহাবিশ্ব পাড়ি দিতে আলোর বহু বিলিয়ন বছর সময় লেগে যায়। ফলে এখন থেকে ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি) বছর পরের জ্যোতির্বিদেরা মহাবিশ্বের সংকোচন দেখার জন্য খুব বেশি সময় পাবেন না।

প্রথমে তাঁরা দেখবেন, অপেক্ষাকৃত কাছের ছায়াপথগুলো গড়ের ওপর দূরে না সরে কাছাকাছি হচ্ছে। কিন্তু দূরের ছায়াপথের আলো তখনো লোহিত সরণ[২] প্রদর্শন করবে। ২০০ থেকে ১ হাজার কোটি বছরের মধ্যের কোনো এক সময়েই শুধু সংকোচন দৃশ্যমান হবে। তবে মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণের সূক্ষ্ম পরিবর্তন আরও সহজে বোঝা যাবে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এই পটভূমি বিকিরণ বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ। বর্তমানে এর তাপমাত্রা পরম শূন্য তাপমাত্রার ৩ ডিগ্রি ওপরে। মানে ৩ ডিগ্রি কেলভিন। মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই তাপমাত্রা কমছে। ১০ হাজার বছর পর এটি কমে ১ ডিগ্রি কেলভিন হবে। প্রসারণের সর্বোচ্চ বিন্দুতে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম হবে। সংকোচন শুরু হওয়ামাত্রই তাপমাত্রা আবার বাড়তে শুরু করবে। মহাবিশ্বের বর্তমান সময়ের ঘনত্বে পৌঁছালে আবারও তাপমাত্রা হবে ৩ ডিগ্রি কেলভিন। এতে সময় লাগবে আরও ১০ হাজার কোটি বছর। মহাবিশ্বের উত্থান ও পতন সময়ের সাপেক্ষে মোটামুটি প্রতিসম[৩]।

মহাবিশ্ব রাতারাতি গুটিয়ে যাবে না। সত্যি বলতে, ২০০ থেকে ১০০০ কোটি বছর ধরে আমাদের বংশধরেরা সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারবে। সেটা সংকোচন শুরু হলেও অব্যাহত থাকবে। কিন্তু ধরুন, সংকোচন শুরু হতে আরও অনেক বেশি সময় লাগল। এই যেমন এক হাজার কোটি কোটি কোটি বছর। এটা হলে কিন্তু পরিস্থিতি এতটা অনুকূলে থাকবে না। এ ক্ষেত্রে প্রসারণ সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছার আগেই নক্ষত্ররা নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। চিরকাল প্রসারিত হতে থাকা মহাবিশ্বে বেঁচে থাকা প্রাণীরা যে সমস্যায় পড়ত, সেই একই সমস্যা এখানেও হবে।

এখন থেকে যত বছর পরই সংকোচন শুরু হোক না কেন, একই সংখ্যক বছর পরে মহাবিশ্ব আবার বর্তমান আকারের সমান হবে। তবে দেখতে অনেকটা আলাদা হবে। সংকোচন ১০ হাজার বছর পর হলেও এখনকার চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক ব্ল্যাকহোল থাকবে। নক্ষত্র থাকবে অনেক কম। বাসযোগ্য গ্রহ থাকবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি।

মহাবিশ্বের আকার পুনরায় বর্তমান আকারের সমান হতে হতে সংকোচন হবে অনেক দ্রুতগতিতে। প্রায় সাড়ে ৩০০ কোটি বছরে এর আকার অর্ধেক হয়ে যাবে। ক্রমেই সংকোচন হার আরও বেড়ে যাবে। তবে আসল খেলা শুরু হবে এর প্রায় এক হাজার কোটি বছর পর। এ সময় মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণের তাপমাত্রা বড় হুমকি হয়ে দেখা দেবে। তাপমাত্রা ৩০০ ডিগ্রি কেলভিন হলে তাপের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচা পৃথিবীর জন্য কঠিন হয়ে যাবে। এটি চরমভাবে গরম হতে থাকবে। প্রথমেই গলে যাবে হিমমুকুট (ice-cap) বা তুষারস্রোত। এরপর সমুদ্রের পানি বাষ্প হতে শুরু করবে।

৪ কোটি বছর পর পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা পৃথিবীর বর্তমান গড় তাপমাত্রার সমান হবে। পৃথিবীর মতো গ্রহগুলো বাসের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়বে। অবশ্য পৃথিবী তার আগেই বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, সূর্য প্রসারিত হয়ে লোহিত দানব (red giant) হবে। এই সময়টায় আমাদের বংশধরেরা যাওয়ার জন্য আর কোনো জায়গা খুঁজে পাবে না। কোনো নিরাপদ বাসস্থান থাকবে না। তাপ বিকিরণে ভর্তি থাকবে মহাবিশ্ব। সব জায়গার তাপমাত্রা হবে ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আরও বাড়তে থাকবে। নিজেকে গরম পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া বা হিমায়িত পরিবেশ তৈরি করে তাপ থেকে রক্ষা করতে পারা কোনো জ্যোতির্বিদ দেখবেন, মহাবিশ্ব পাগলের মতো গতিতে গুটিয়ে যাচ্ছে। কয়েক মিলিয়ন বছরেই আকার হয়ে যাচ্ছে অর্ধেক। তত দিন পর্যন্ত টিকে থাকা কোনো ছায়াপথকে আর আলাদা করে চেনা যাবে না। তত দিন তারা একে অপরের সঙ্গে মিশে যাবে। তবে তখনো অনেক ফাঁকা স্থান থাকবে। নক্ষত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটবে না বললেই চলে।

অন্তিম মুহূর্ত কাছে চলে এলে মহাবিশ্বের অবস্থা খুব দ্রুত বিগ ব্যাংয়ের সামান্য পরের সময়ের মতো হয়ে যেতে থাকবে। জ্যোতির্বিদ মার্টিন রিজ সংকোচনশীল মহাবিশ্বের একটি আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে কাজ করেছেন। পদার্থবিদ্যার কিছু সাধারণ নীতিমালা প্রয়োগ করে তিনি সংকোচনের একটি চূড়ান্ত চিত্র তৈরি করতে পেরেছেন। শেষ পর্যন্ত মহাজাগতিক তাপীয় বিকিরণ এত তীব্র হবে যে রাতের আকাশ বেরসিক লাল রং বিকিরণ করবে। ধীরে ধীরে মহাবিশ্ব হয়ে উঠবে এক সর্বগ্রাসী মহাজাগতিক চুল্লি, যা সব ধরনের ভঙ্গুর প্রাণকে শেষ করে দেবে, সে যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন। এই তাপমাত্রায় গ্রহদের বায়ুমণ্ডলও টিকে থাকবে না। ক্রমেই লাল বিকিরণ হলুদ ও শেষে সাদা হয়ে যাবে। পুরো মহাবিশ্বে উপস্থিত প্রচণ্ড এই তাপীয় বিকিরণ একসময় নক্ষত্রের অস্তিত্বকেই হুমকিতে ফেলবে। বিকিরণের মাধ্যমে শক্তি ক্ষয় করতে না পেরে নক্ষত্ররা নিজেদের অভ্যন্তরে তাপ জমা করবে। একসময় ঘটাবে বিস্ফোরণ। উত্তপ্ত গ্যাস বা প্লাজমা দিয়ে স্থান ভর্তি হবে। এর বিকিরণ হবে প্রচণ্ড তীব্র। সব সময় এর উষ্ণতা আরও বাড়তেই থাকবে।

পরিবর্তনের গতি বাড়তে থাকবে। পরিস্থিতি হয়ে উঠবে আরও চরম। ক্রমেই অল্প অল্প সময়ের মধ্যেই মহাবিশ্বে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যাবে। প্রথমে এক লাখ, পরে এক হাজার, পরে এক শ বছরেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে। যা শেষে হুট করে মোড় নেবে ভয়াবহ এক বিপর্যয়ের দিকে। তাপমাত্রা বেড়ে প্রথমে মিলিয়ন ও পরে বিলিয়ন ডিগ্রিতে পৌঁছাবে। যে পদার্থ বর্তমানে ব্যাপক জায়গা দখল করে আছে, তা গুটিয়ে ছোট্ট জায়গায়

স্থান নেবে। একটি ছায়াপথের সব ভর মাত্র কয়েক আলোকবর্ষ চওড়া স্থানে আশ্রয় নেবে। শেষ তিন মিনিট চলে এল বলে।

শেষ পর্যন্ত তাপমাত্রা এত বাড়বে যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসও ভেঙে যাবে। বস্তু ভেঙে গিয়ে মৌলিক কণাদের একটি সুষম স্যুপে পরিণত হবে। আপনি যতক্ষণে পৃষ্ঠাটি পড়বেন, তার চেয়ে কম সময়ে বিগ ব্যাং ও বহু প্রজন্মের নক্ষত্রের মাধ্যমে ভারী রাসায়নিক বস্তু সৃষ্টির কাজটি আগের অবস্থায় ফিরে গেল। পরমাণুর যে নিউক্লিয়াসরা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর ধরে টিকে ছিল, আজ তারা শেষ হয়ে গেল চিরতরে। এক ব্ল্যাকহোল ছাড়া আর সব ধরনের কাঠামো অনেক আগেই বিলীন হয়ে গেছে। মহাবিশ্বে বিরাজ করছে এক মার্জিত কিন্তু অশুভ সারল্য। আয়ু আছে মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

ক্রমেই দ্রুত হারে মহাবিশ্বের সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রাও বাড়ছে অনেক দ্রুত হারে। ঠিক কতটা বাড়ছে সেটা কারও জানা নেই। বস্তু এত শক্ত হয়ে গুটিয়ে গেছে যে প্রোটন ও নিউট্রনের আর আলাদাভাবে কোনো অস্তিত্ব নেই। আছে শুধু কোয়ার্কের স্যুপ। সংকোচনের হার কিন্তু তখনো বাড়ছে।

এবার চূড়ান্ত মহাজাগতিক বিপর্যয়ের সময় এসেছে। আর মাত্র কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড বাকি। ব্ল্যাকহোলগুলো একে অপরের সঙ্গে একীভূত হতে শুরু করবে। গুটিয়ে যাওয়ার সময় মহাবিশ্বের সাধারণ অবস্থা থেকে ব্ল্যাকহোলের ভেতরের অবস্থা অবশ্য ভিন্ন হবে। এরা এখন নিছকই স্থান-কালের এমন অঞ্চল, যারা একটু আগেভাগেই শেষ পরিণতিতে চলে এসেছে, যাদের সঙ্গে পরে যোগ দিচ্ছে মহাবিশ্বের বাকি অংশ।

একেবারে শেষ সময়ে মহাকর্ষ সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়। এটি নির্মমভাবে স্থান ও কালকে দুমড়েমুচড়ে ফেলে। স্থান-কালের বক্রতা ক্রমেই দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। ক্রমেই বড় থেকে বড় অঞ্চলের স্থান সংকুচিত হয়ে ছোট থেকে ছোট আয়তনের স্থানে জায়গা নেয়। প্রচলিত তত্ত্ব বলছে, ভেতরের দিকের এই অন্তঃস্ফোটন অসীম শক্তি অর্জন করে। ফলে সব বস্তু দুমড়েমুচড়ে চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায়। ধ্বংস করে দেয় প্রতিটি ভৌত বস্তুকে। এমনকি স্থান ও কালও রেহাই পায় না। সবকিছুর স্থান হয় স্থান-কালের সিঙ্গুলারিটিতে।

এটাই শেষ পরিণতি।

আমরা এখন পর্যন্ত যতটা বুঝি, এই মহাধস শুধু বস্তুরই ইতি ঘটায় না, ইতি ঘটায় সবকিছুরই। মহাধসের সময়-কাল নিজেও অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। ফলে তার পরে কী ঘটবে, সে প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। যেমনিভাবে অর্থহীন বিগ ব্যাংয়ের আগে কী ঘটেছে, সেটা জিজ্ঞেস করা। 'পরবর্তী' বলতে আসলে কিছুই নেই। কাজের অভাব হওয়ার মতোও সময় নেই। ফাঁকা থাকার

মতোও নেই কোনো স্থান। বিগ ব্যাংয়ের সময় শূন্য থেকে অস্তিত্বে আসা মহাবিশ্ব মহাধসের মাধ্যমে আবার মিলিয়ে যাবে শূন্যেই। এটি যে এত মহাকাল ধরে বিরাজমান ছিল, তার কোনো স্মৃতিচিহ্নও নেই।

এমন একটি সম্ভাবনা দেখে কি আমাদের মন খারাপ করা উচিত? আসলে কোনটি খারাপ—চিরকাল প্রসারিত হতে হতে বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে যাওয়া এক অন্ধকার শূন্যতা, নাকি গুটিয়ে গিয়ে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে মিলিয়ে যাওয়া এক মহাবিশ্ব? যেখানে মহাবিশ্ব থেকে সময়ই হারিয়ে যাবে, সেখানে অমরত্বের সম্ভাবনাই-বা কেমন?

চিরকাল প্রসারিত হতে থাকা দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্বের চেয়ে মহাধসের ক্ষেত্রেই তো প্রাণের টিকে থাকা বেশি কঠিন মনে হচ্ছে। এখানে শক্তির স্বল্পতা কোনো সমস্যা নয়। বরং শক্তির আধিক্যই সমস্যা করছে। তবে বিপর্যয় চলে আসার আগে আমাদের বংশধরেরা হয়তো প্রস্তুতির জন্য ১০০ কোটি বা এমনকি ১ লাখ কোটি বছর সময় পাবে। এই সময়ে প্রাণ পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে যেতে পারে। সংকোচনশীল মহাবিশ্বের সবচেয়ে সরল নমুনায় স্থানের মোট আয়তন আসলে সসীম। এর কারণ হলো, স্থান বেঁকে থাকে। আর এটি একটি গোলকের পৃষ্ঠের মতো করে ত্রিমাত্রিক জগতে নিজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। ফলে বোঝা কঠিন নয় যে বুদ্ধিমান জীবেরা পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তার মানে, নিজেদের হাতে থাকা সব রকম রসদ নিয়ে তারা মহাধস মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

প্রথম দৃষ্টিতে দেখে বোঝা যাচ্ছে না কেন তারা টিকে থাকার চিন্তা করবে। মহাধসের পর যদি বেঁচে থাকা অসম্ভবই হয়, তাহলে যন্ত্রণাকে আর বাড়িয়েই বা কী লাভ? ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছরের পুরোনো মহাবিশ্বে শেষ ধ্বংসের ১০ লাখ বছর আগের মৃত্যুও যা, ১ কোটি বছর পরের মৃত্যুও তা। তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, সময় কিন্তু আপেক্ষিক। আমাদের বংশধরদের নিজস্ব সময় কিন্তু তাদের বিপাক ক্রিয়া ও তথ্য প্রসেস করার গতির ওপর নির্ভর করবে। তাই আবারও বলতে হচ্ছে, শারীরিক আকৃতিকে খাপ খাইয়ে নিতে প্রচুর সময়ে পাচ্ছে বলে তারা হয়তো কোনোভাবে অমরত্ব অর্জনে সক্ষম হবে।

তাপমাত্রা বাড়ার অর্থ কণাদের চলাচলও বাড়বে। ভৌত প্রক্রিয়াগুলোও চলবে দ্রুতগতিতে। মনে রাখতে হবে, বুদ্ধিমান জীবের জন্য আবশ্যকীয় প্রয়োজন হলো তথ্য প্রসেস করতে পারা। তাপমাত্রা বাড়তে থাকা মহাবিশ্বে কিন্তু তথ্য প্রসেস করার গতিও বাড়বে। যে জীব ১০০ কোটি ডিগ্রির তাপগতীয় প্রক্রিয়াকেও কাজে লাগাতে শিখবে, তার কাছে মহাবিশ্বের আসন্ন মৃত্যুকে মনে হবে বহু বছর পরের ঘটনা। যতটুকু সময় বাকি আছে সেটাকে

যদি মনের মধ্যে অসীম মনে হয়, তাহলে সমাপ্তি নিয়ে চিন্তা করার তো দরকারই নেই। সংকোচন বাড়তে বাড়তে মহাধস ক্রমেই দ্রুততার সঙ্গে যতই নিকটবর্তী হবে, তাত্ত্বিকভাবে সময় ক্রমেই তত ধীরে চলবে বলে মনে হবে। চিন্তার গতি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যারমাগেডনের দিকেও নিকটবর্তী হওয়ার বেগ বাড়বে। যথেষ্ট রসদ থাকলে এই জীবগুলো সত্যিকার অর্থেই সময় কিনতে পারবে।

কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, সংকোচনশীল মহাবিশ্বে বাস করা কোনো মহাপ্রাণী একদম শেষ মুহূর্তের সসীম সময়ে অসীমসংখ্যক আলাদা চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন করতে পারবে কি না। জন ব্যারো ও ফ্রাঙ্ক টিপলার প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। শেষ দিকের পর্যায়গুলোর ভৌত অবস্থার ওপর প্রশ্নটির উত্তর খুব বেশি নির্ভরশীল। যেমন ধরুন, শেষের সিঙ্গুলারিটির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় মহাবিশ্ব মোটামুটি সুষম থাকল। তাহলে কিন্তু একটি সমস্যা হয়ে যাবে। যা-ই হোক না কেন, আলোর গতি কিন্তু পাল্টাচ্ছে না। আলো কিন্তু সেকেন্ডে এক আলোকসেকেন্ডের[৪] বেশি পথ যেতে পারবে না। কোনো ভৌত প্রতিক্রিয়া সর্বোচ্চ কত দ্রুত প্রবাহিত হতে পারে, তাতে আলোর গতি একটি সীমা বেঁধে দেয়। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, একদম শেষ সেকেন্ডে মহাবিশ্বের এক আলোকসেকেন্ডের বেশি দূরের দুটি জায়গার মধ্যে যোগাযোগ হওয়া সম্ভব নয়। (এটাও ঘটনা দিগন্তের একটি উদাহরণ, যেমনিভাবে ব্ল্যাকহোলে একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে কোনো তথ্য পৌঁছাতে পারে না।) মহাবিশ্বের সমাপ্তি নিকটবর্তী হতে থাকলে যোগাযোগযোগ্য অঞ্চল ও তাতে উপস্থিত কণার সংখ্যা কমে শূন্যতে নেমে আসে। একটি সিস্টেমকে তথ্য প্রসেস করতে হলে সিস্টেমের সব অংশের মধ্যে যোগাযোগ থাকতে হবে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আলোর বেগ নির্দিষ্ট হওয়ায় শেষের সময়ের যেকোনো 'মস্তিষ্ক'কে ছোট বানিয়ে ফেলবে। এবং এর ফলে হয়তো এমন একটি মস্তিষ্কের আলাদা আলাদা অবস্থা বা চিন্তার সংখ্যাও কমে যাবে।

এই বাধাকে দূর করতে হলে মহাজাগতিক সংকোচনের শেষ পর্যায়গুলোকে সুষমতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এবং সত্যি বলতে এটাও একটি সম্ভাব্য ঘটনা। মহাকর্ষীয় সংকোচন নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ চালিয়ে দেখা গেছে, মহাবিশ্বের অন্তঃস্ফোটনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দিকে অন্তঃস্ফোটনের হার ভিন্ন ভিন্ন হবে। উৎসুক্যের ব্যাপার হলো, একদিকে দ্রুত ও অন্যদিকে ধীরে মহাবিশ্বের সংকোচনটাই শুধু বিষয় নয়। ব্যাপার হলো, স্পন্দন শুরু হলে সবচেয়ে দ্রুত অন্তঃস্ফোটনের দিকও পাল্টে যায়। বাস্তবতা হলো, বিলুপ্তির আগের সময়ে ক্রমেই বেড়ে চলা উন্মাদনা ও জটিলতার ফলে মহাবিশ্ব এদিক-ওদিক দোল খেতে থাকে।

ব্যারো ও টিপলার ধারণা করছেন, জটিল এসব স্পন্দনের কারণে প্রথমে একদিকের ঘটনা দিগন্ত হারিয়ে যাবে। পরে হারাবে অন্য একদিকের ঘটনা দিগন্ত। ফলে সব দিকের অঞ্চলই হাতের নাগালে থাকবে। মহামস্তিষ্কগুলোতে হতে হবে বুদ্ধিতে ভরপুর। স্পন্দনের কারণে একদিকে অন্যদিকের চেয়ে অন্তঃস্ফোটন দ্রুত ঘটতে থাকলে যোগাযোগের দিকও বদলে ফেলতে হবে। প্রাণীরা তাল মিলিয়ে চলতে পারলে স্পন্দন থেকেই চিন্তা প্রসেস করার প্রয়োজনীয় শক্তি মিলবে। এ ছাড়া সরল গাণিতিক নমুনা থেকে দেখা যাচ্ছে, মহাধসের মাধ্যমে সমাপ্তির আগের সসীম সময়ে অসীমসংখ্যক স্পন্দন হবে। এর মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে অসীম পরিমাণ তথ্য প্রসেস করার সুযোগ হবে। তার মানে মহাপ্রাণীদের হিসাবে সময়ের পরিমাণ হবে অসীম। ফলে তাদের মনের ভেতরে জগৎটার কখনো ইতি ঘটবে না। যদিও মহাধসের মাধ্যমে ভৌত জগৎ হঠাৎ করে নেই হয়ে যাবে।

অসীম ক্ষমতার একটি মস্তিষ্ক কী করতে পারে? টিপলারের মতে, এটি এর নিজের অস্তিত্বের সবকটি দিক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবে না। পুরো মহাবিশ্বকেও বুঝতে পারবে না। কিন্তু তথ্য প্রসেসের ক্ষমতা অসীম হওয়ায় এটি ভার্চ্যুয়াল বাস্তবতায় কাল্পনিক জগতে বিচরণ করে যেতে পারবে। এভাবে এটি মনোজগতে অসীমসংখ্যক সম্ভাব্য মহাবিশ্বকে ধারণ করতে পারবে। শেষ তিন মিনিট শুধু অসীম পর্যন্তই বিস্তৃত হবে না, এ সময় অসীম রকমের ছদ্ম বাস্তবতাও তৈরি করা যাবে।

তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, (কিছুটা পাগলাটে) এই ধারণাগুলো খুব নির্দিষ্ট ভৌত নমুনার ওপর নির্ভরশীল। হয়তো সেগুলো একেবারেই অবাস্তব। এ ছাড়া এগুলোতে কোয়ান্টাম প্রভাবকেও উপেক্ষা করা হয়েছে, যে প্রভাব হয়তো শেষ সময়ের মহাকর্ষীয় অন্তঃস্ফোটনকে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ করবে। সেই প্রভাবের কারণে হয়তো তথ্য প্রসেসের হারেও একটি চূড়ান্ত সীমা বাঁধা থাকবে। সে ক্ষেত্রে আমরা আশা করব, মহাপ্রাণী বা সুপারকম্পিউটার যেন অন্তত অস্তিত্বকে যথেষ্ট পরিমাণ বুঝতে পেরে হাতে থাকা সময়ে নিজের সমাপ্তিকে সহজে মেনে নিতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১. আগেও এর কারণ বলা হয়েছে। আলোর বেগ অনেক বেশি হলেও নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে আমরা ইচ্ছেমতো দূরের জিনিস দেখতে পারি না। শুধু যত দূর থেকে আলো আমাদের চোখে এসে আসতে পেরেছে, তত

দূরের জিনিসই দেখতে পাই। তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আরও দূর থেকে আলো আসার সুযোগ পাবে বলে ক্রমেই আরও দূরের ও অতীতের বস্তুও আমরা দেখতে পারব।

২. মহাজাগতিক মাপকাঠিতে দূরে সরা বস্তুর আলোর কম্পাঙ্ক কমে যায়। ফলে বেড়ে যায় তরঙ্গদৈর্ঘ্য। এ কারণে দৃশ্যমান আলোর রং লাল হয়ে যায়। এটাই লোহিত সরণ।

৩. একটি বিন্দু বা অবস্থানের সাপেক্ষে কোনো জিনিসকে দুই বিপরীত দিক থেকে দেখতে একই রকম দেখা গেলে তাকে প্রতিসম জিনিস বা ঘটনা বলে। যেমন ধরুন, কেউ সকাল ১০টায় বাড়ি থেকে বের হলেন। ২ মিনিট পর বাসে উঠলেন। ২০ মিনিট পরে কাছের শহরে গেলেন। ১৬ মিনিট ধরে বাজার করলেন। পরের ২০ মিনিটে বাসে করে এসে নামলেন বাসস্ট্যান্ডে। পরের ২ মিনিটে বাসায় চলে এলেন। খেয়াল করে দেখুন, সাড়ে ১০টার দুই দিকের ঘটনাগুলো একই রকম। তাহলে এই ভদ্রলোকের কাজের খতিয়ান সাড়ে ১০টার সাপেক্ষে প্রতিসম। অবশ্য আরও সূক্ষ্মভাবে ভাবলে এই চলাচলকে প্রতিসম করতে হলে আরও কিছু বিষয় চিন্তা করতে হবে। আবার ধরুন, একটি রাস্তাকে একটি জায়গা থেকে দেখলে দুই দিকেই একই রকম দেখা যায়। তাহলে এই রাস্তাও প্রতিসম। আমাদের মানবদেহও কিন্তু প্রতিসম ধরনের। আমাদের দেহের ওপর থেকে নিচে একটি রেখা কল্পনা করুন। এই রেখার দুই দিক প্রায় একই রকম। এটাও একধরনের প্রতিসাম্য। একটি মার্বেলকে মাঝখান দিয়ে কেটে ফেললে দুই দিক একই রকম হবে। তাই, ব্যাস বরাবর মার্বেলও প্রতিসম।

৪. আলো ১ সেকেন্ডে যত দূর যায় তাকে এক আলোকসেকেন্ড বলে। যেমনি এক বছরে অতিক্রান্ত পথকে এক আলোকবর্ষ বলে। তার মানে ১ আলোকসেকেন্ড আসলে ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল বা ৩ লাখ কিলোমিটার।

দশম অধ্যায়

হঠাৎ মৃত্যু ও পুনর্জন্ম

এ পর্যন্ত আমি ধরে নিয়েছি মহাবিশ্বের পরিণতি নির্ধারিত হবে অনেক অনেক দিন পরে। হয়তো অসীম সময় পরের ভবিষ্যতে। হয়তো সেটা ঘটবে বিস্ফোরণ কিংবা আর্তনাদের (আরও সঠিক করে বললে কচকচ শব্দ বা তীব্র হিমায়ন) মাধ্যমে। মহাবিশ্ব সংকুচিত হলে সেই আসন্ন ঘটনার বহু বিলিয়ন বছর আগেই আমাদের বংশধরেরা আগাম সংকেত পাবে। কিন্তু আরও বেশি ভয়াবহ একটি সম্ভাবনাও আছে।

আমি আগেই বলেছি, মহাবিশ্বের দিকে তাকালে জ্যোতির্বিদেরা মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থার তাৎক্ষণিক কোনো চিত্র দেখেন না। দূরের অঞ্চল থেকে আমাদের কাছে আলো আসতে সময় লাগে বলে আমরা একটি বস্তুর সেই অবস্থা দেখি, যখন এটি থেকে আলো বের হয়েছিল। টেলিস্কোপ শুধু দূরের জিনিস দেখার যন্ত্র নয়, অতীতের জিনিস দেখারও যন্ত্র। একটি বস্তু যত দূরে হবে, এর তত অতীতের চিত্র আজ দেখব আমরা। বাস্তবতা হলো, জ্যোতির্বিদদের কাছে মহাবিশ্ব হলো স্থান ও কালের মাঝখান দিয়ে কেটে নিয়ে এক ফালি অতীত। কেতাবি নাম অতীতের লাইট কোন (cone)। ১০.১ চিত্রে এটি দেখানো হয়েছে।

আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে কোনো তথ্য বা ভৌত ঘটনা আলোর চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না। অতীতের লাইট কোন (আলোক শঙ্কু) আমাদের জ্ঞানকে যেমন সীমিত করছে, তেমনি সীমিত করছে বর্তমানে আমাদের প্রভাবিত করতে পারা ঘটনাকেও। তার মানে, যে ভৌত ঘটনা আমাদের দিকে আলোর বেগে আসছে, সেটি আসছে কোনো পূর্বসংকেত ছাড়াই। বিপর্যয় যদি অতীতের লাইট কোন বা আলোক শঙ্কু বেয়ে ধেয়ে আসে, তাহলে সেই বিপদ আগে থেকে বোঝাই যাবে না। আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরই কেবল প্রথম এর কথা জানা যাবে।

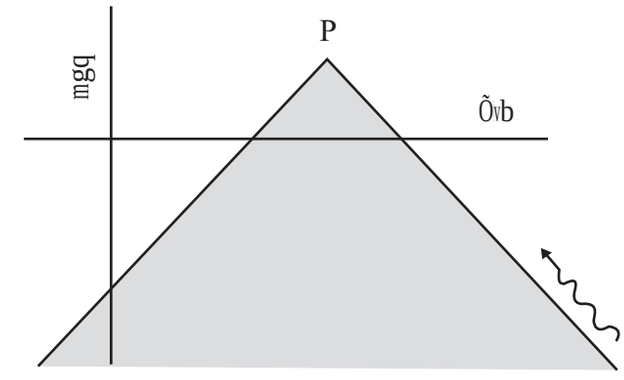

চিত্র ১০.১

স্থান ও কালের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু P চিন্তা করুন। এটা হয়তো এখন এবং এখানে। যেমন মহাবিশ্বের দিকে তাকানো একজন জ্যোতির্বিদ আসলে দেখছেন এর অতীত অবস্থা। বর্তমান অবস্থা নয়। P বিন্দুতে আসা আলো তথ্য P-এর মাধ্যমে অতীতের আলোক শঙ্কু বেয়ে আসছে, যার গতিপথ তির্যক রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে। আলোর চেয়ে দ্রুত কোনো তথ্য বা ভৌত প্রভাব চলতে পারে না বলে এই মুহূর্তের একজন পর্যবেক্ষক শুধু ছবির গাঢ় অঞ্চলে ঘটা প্রভাব বা ঘটনা দেখতে পাবেন। অতীতের আলোক শঙ্কুর বাইরে ঘটা কোনো দুর্যোগ হয়তো পৃথিবীর দিকে বিপৎসংকেত পাঠাতে থাকবে। কিন্তু পর্যবেক্ষক সেটা না জেনেই আনন্দের মধ্যে সময় পার করবে।

একটি সরল কাল্পনিক উদাহরণ চিন্তা করি। এ মুহূর্তে সূর্য বিস্ফোরিত হলে আমরা সেটা জানতে পারব সাড়ে আট মিনিট পর। সূর্য থেকে আমাদের কাছে আসতে এই সময়টুকুই লাগে। একইভাবে হতেই পারে, কাছের কোনো নক্ষত্র এর মধ্যেই সুপারনোভা হিসেবে বিস্ফোরিত হয়েছে। এটা হলে পৃথিবী প্রাণঘাতী বিকিরণে ছেয়ে যাবে। কিন্তু সেটা না জেনেই আরও কয়েক বছর আমরা আনন্দেই সময় কাটাব। অথচ বিপর্যয়ের খবর কিন্তু আমাদের দিকে আলোর বেগেই ছুটে আসবে। ফলে এই মুহূর্তে মহাবিশ্বকে দেখতে যথেষ্ট মনে হলেও আমরা নিশ্চিত করতে বলে দিতে পারি না ভয়ংকর কিছু ইতিমধ্যেই ঘটে যায়নি।

সবচেয়ে আকস্মিক বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি ঘটনার মহাজাগতিক অঞ্চলের আশপাশেই সীমাবদ্ধ থাকবে। নক্ষত্রের মৃত্যু বা ব্ল্যাকহোলের মধ্যে বস্তুর পতন গ্রহ ও আশপাশের নক্ষত্রকে প্রভাবিত করবে। এর প্রভাবই হয়তো কয়েক আলোকবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিস্ফোরণ

ঘটবে কিছু কিছু ছায়াপথের অভ্যন্তরে ঘটা ঘটনায়। আগেও বলেছি, মাঝেমধ্যে আলোর বেগের বড় এক ভগ্নাংশের মধ্যে বস্তুর বিশাল বিশাল পিচকিরি নির্গত হয়। সেই সঙ্গে বেরিয়ে আসে বিপুল পরিমাণ বিকিরণ। এই বিশৃঙ্খলার প্রভাব ছায়াপথজুড়ে থাকে।

কিন্তু পুরো মহাবিশ্বকে কাঁপিয়ে দেওয়া ঘটনাগুলো কেমন হবে? এমন কোনো আলোড়ন কি সম্ভব, যা এক ধাক্কায় পুরো মহাবিশ্বকেই এর মধ্যবয়সেই শেষ করে দেবে? এমন কী হতে পারে যে সত্যিকারের কোনো মহাজাগতিক বিপর্যয় শুরুই হয়ে গেছে? যার অশুভ প্রভাব হয়তো আমাদের অতীতের লাইট কোন বেয়ে ধেয়ে আসছে? ধ্বংস হতে যাচ্ছে আমাদের স্থান-কালের ভঙ্গুর কাঠামো?

১৯৮০ সালে সিডনি কোলম্যান ও ফ্রাঙ্ক ডি লুসিয়া wdwRKÅvj wiwfD জার্নালে একটি ভয়ানক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। শিরোনামটা একেবারেই অক্ষতিকর, 'শূন্যস্থান ক্ষয়ের মহাকর্ষীয় প্রভাব'। তাঁরা যে ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থানের কথা বলছেন সেটি নিছকই ফাঁকা স্থান নয়। এটা হলো কোয়ান্টাম ফিজিকসের ফাঁকা স্থান। তৃতীয় অধ্যায়ে আমি ব্যাখ্যা করেছি, আমরা যেটাকে ফাঁকা স্থান মনে করি, সেখানে আসলে প্রচুর পরিমাণ ক্ষণস্থায়ী কোয়ান্টাম কর্মকাণ্ড ঘটে চলছে। দৈব উন্মাদনায় ভুতুড়ে ভার্চ্যুয়াল কণারা প্রতিমুহূর্তে আবির্ভূত ও উধাও হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের হয়তো মনে আছে, এই ভ্যাকুয়াম অবস্থা কিন্তু অনন্য নয়। কোয়ান্টাম অবস্থা কয়েকটি হতে পারে, যার সবই হবে ফাঁকা। কিন্তু সবগুলোর কোয়ান্টাম কর্মকাণ্ডের স্তর ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিটি অবস্থার শক্তিও আলাদা আলাদা।

কোয়ান্টাম ফিজিকসের সুপ্রতিষ্ঠিত একটি নীতি হলো, উচ্চশক্তির অবস্থা নিম্নশক্তির অবস্থায় নেমে আসতে চায়। যেমন ধরুন, একটি পরমাণু অনেকগুলো উত্তেজিত অবস্থায় থাকতে পারে। যার সব অবস্থাই অস্থিতিশীল। এটি সবচেয়ে নিম্নশক্তির অবস্থায় বা নিম্নতলের অবস্থায় নেমে আসতে চেষ্টা করবে। একইভাবে একটু উত্তেজিত ভ্যাকুয়ামও নিম্নতম শক্তির বা 'সত্যিকারের' ভ্যাকুয়ামে নেমে আসতে চেষ্টা করবে। স্ফীতিময় মহাবিশ্বে ধরে নেওয়া হয়েছে, খুব প্রারম্ভিক মহাবিশ্ব উত্তেজিত বা 'ছদ্ম' ভ্যাকুয়াম অবস্থায় ছিল। এ সময় এটি চরমভাবে স্ফীত হয়ে ওঠে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই অবস্থা সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামে চলে আসে। শেষ হয় স্ফীতি।

সাধারণত মনে করা হয়, মহাবিশ্ব বর্তমানে সত্যিকারের ভ্যাকুয়াম অবস্থায় আছে। তার মানে, আমাদের সময়ের ফাঁকা স্থান হলো সবচেয়ে নিম্নশক্তির ভ্যাকুয়াম। কিন্তু আমরা কি নিশ্চিত করে সেটা বলতে পারি? কোলম্যান ও ডি লুসিয়া একটি ভয়ানক সম্ভাবনার কথা বলছেন। বর্তমানের ভ্যাকুয়াম হয়তো সত্যিকারে ভ্যাকুয়াম নয়। এটা হয়তো আপাতত দীর্ঘস্থায়ী কোনো নকল

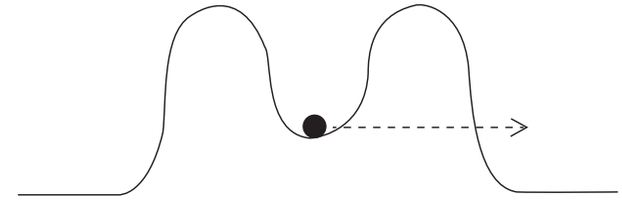

চিত্র ১০.২

টানেল ইফেক্ট বা সুড়ঙ্গ প্রভাব। দুই পাহাড়ের মধ্যের উপত্যকায় আবদ্ধ কোয়ান্টাম কণারও শক্তি ধার করে পাহাড়ের ওপাশে চলে যাওয়ার একটি ক্ষুদ্র সম্ভাবনা আছে। বাস্তবে সুড়ঙ্গ কেটে ওপাশে চলে যাওয়া পর্যবেক্ষণে দেখাও গেছে। এর একটি পরিচিত উদাহরণ হলো, কিছু মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের আলফা কণা নিউক্লীয় বলের বাধাকে ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার নাম আলফা তেজস্ক্রিয়তা। এই উদাহরণে পাহাড় হলো নিউক্লীয় ও তড়িৎ-চুম্বকীয় বল। আঁকা ছবিটা নিছকই ঘটনাটিকে সহজে বোঝানোর জন্যই দেওয়া হয়েছে।

ভ্যাকুয়াম। যার কারণে হয়তো ভুল করে আমরা মনে করে নিয়েছি আমরা নিরাপদ আছি। কারণ, এই নকল ভ্যাকুয়াম কয়েক বিলিয়ন বছর ধরে টিকে আছে। আমরা অনেক ধরনের কোয়ান্টাম অবস্থার কথা জানি। যেমন ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস, যার অর্ধায়ু বিলিয়ন বছর। একবার মনে করুন যে বর্তমানের ভ্যাকুয়ামও এই ধরনের, তাহলে? কোলম্যান ও ডি লুসিয়ার গবেষণাপত্রের শিরোনামে উল্লিখিত ভ্যাকুয়ামের ক্ষয় থেকে একটি ভয়ানক সম্ভাবনা পাওয়া যাচ্ছে। হয়তো বর্তমান ভ্যাকুয়াম হুট করে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মহাবিশ্ব চলে যেতে পারে আরও নিম্নশক্তির অবস্থায়। যার পরিণাম আমাদের জন্য হবে ভয়ানক (এবং বাকি সবার জন্যও)।

কোলম্যান ও ডি লুসিয়ার প্রস্তাবের পেছনে কাজ করছে কোয়ান্টাম টানেলিং প্রক্রিয়া। একে সবচেয়ে সহজে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি কোয়ান্টাম কণা একটি বলের বাধায় আটকে আছে—এমন সরল চিত্র বিবেচনা করা যেতে পারে। ধরুন, ১০.২ চিত্রের মতো কণাটি একটি উপত্যকায় আটকে আছে। দুই পাশে আছে খাড়া পাহাড়। বাস্তবে পাহাড়ই হতে হবে এমন কথা নেই। যেমন তারা বৈদ্যুতিক বা নিউক্লীয় বলের ক্ষেত্রও হতে পারে। এই পাহাড় পাড়ি দেওয়ার (বা বলক্ষেত্রকে অতিক্রম করার) শক্তি উপস্থিত না থাকলে মনে হবে কণাটি চিরকাল আটকেই থাকবে। কিন্তু মনে করে দেখুন, কোয়ান্টাম কণারা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি মানতে বাধ্য। যার কারণে এরা অল্প সময়ের জন্যে শক্তি ধার করতে পারে। এর ফলে মজার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়। কণাটি পাহাড়ের

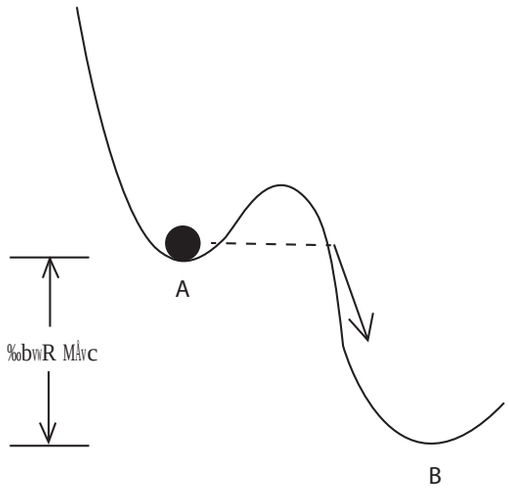

চিত্র ১০.৩

নকল ও সত্যিকারের ভ্যাকুয়াম অবস্থা। হতে পারে ফাঁকা স্থান A-এর বর্তমান কোয়ান্টাম অবস্থা সবচেয়ে নিম্নশক্তির অবস্থা নয়। হয়তো এটি উঁচু কোনো উপত্যকার আপাতস্থিতিশীল অবস্থায় আছে। সে ক্ষেত্রে সম্ভাবনা আছে এটি সুড়ঙ্গ প্রভাবের মাধ্যমে ক্ষয়ে গিয়ে সত্যিকারের স্থিতিশীল গ্রাউন্ড অবস্থা B-তে নেমে আসবে। বুদ্‌বুদের তৈরির মাধ্যমে ঘটা এই অবস্থান্তর থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হবে।

চূড়ায় ওঠার মতো শক্তি ধার করতে পারলে এবং ধার করা শক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার আগেই ওপাশে নেমে যেতে পারলেই তো আটকাবস্থা থেকে বেরিয়ে যেতে পারছে। বাস্তবেই এটি বাধা থেকে সুড়ঙ্গ কেটে বেরিয়ে গেল।

এমন আবদ্ধ জায়গা থেকে কোয়ান্টাম কণার সুড়ঙ্গ কেটে বেরিয়ে যাওয়া বাধার উচ্চতা ও প্রস্থের ওপর খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ভর করে। উচ্চতা যত বেশি হবে, কণাকে ওপরে ওঠার জন্য তত বেশি শক্তি ধার করতে হবে। ফলে অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে ঋণও ফিরিয়ে দিতে হবে তত তাড়াতাড়ি। তার মানে, উচ্চ বাধা পার হতে হলে বাধাকে হতে হবে চিকন। যাতে খুব দ্রুত ঋণ ফিরিয়ে দেওয়ার আগেই বাধা পার হয়ে যাওয়া যায়। এ কারণেই সুড়ঙ্গ প্রভাব নিত্যদিন চোখে পড়ে না। বড় রকমের টানেলিং ঘটতে হলে যে ধরনের উচ্চ ও প্রশস্ত বাধা হওয়া যাবে, বড় জগতের বাধাগুলো তার চেয়ে বেশি বড়। নীতিগতভাবে একজন মানুষ একটি ইটের দেয়াল ভেদ করে চলে যেতে

পারবে। কিন্তু এ অলৌকিক কাজ করতে পারার কোয়ান্টাম সুড়ঙ্গ সম্ভাবনা অনেক অনেক অনেক ক্ষুদ্র। তবে পারমাণবিক জগতে টানেলিং অহরহ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, আলফা তেজস্ক্রিয়তা এ প্রক্রিয়াতেই ঘটে। অর্ধপরিবাহী ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতেও সুড়ঙ্গ প্রভাব কাজে লাগানো হয়। যেমন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে টানেলিংয়ের মাধ্যমে স্ক্যান করা।

বর্তমান ভ্যাকুয়ামের সম্ভাব্য ক্ষয়ের সমস্যা সম্পর্কে কোলম্যান ও ডি লুসিয়া অনুমান করছেন, ভ্যাকুয়াম তৈরি করা কোয়ান্টাম ক্ষেত্র হয়তো ১০.৩ চিত্রে দেখানো বলের মতো (রূপক) দৃশ্য তৈরি করে। বর্তমান ভ্যাকুয়াম অবস্থা আছে উপত্যকা A-এর ভূমিতে। তবে সত্যিকারের ভ্যাকুয়াম আছে উপত্যকা B-এর ভূমিতে, যা A-এর নিচে। ভ্যাকুয়াম উচ্চশক্তির A অবস্থা থেকে নিম্নশক্তির B অবস্থায় নেমে আসতে চাইবে। কিন্তু মাঝখানে 'পাহাড়' বা বল ক্ষেত্র থাকায় সেটি করা যাচ্ছে না। পাহাড় এ ক্ষয়কে বাধা দিলেও কোয়ান্টাম টানেলিং প্রভাবের কারণে পুরোপুরি থামিয়ে রাখতে পারছে না। A থেকে B উপত্যকায় সুড়ঙ্গ কেটে চলে আসা সম্ভব। এই তত্ত্ব সঠিক হলে মহাবিশ্ব ধার করা সময়ের মধ্যে অবস্থান করছে। আটকে আছে উপত্যকা A-তে। কিন্তু সুড়ঙ্গ দিয়ে যেকোনো সময় B উপত্যকায় চলে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা সব সময় আছে।

কোলম্যান ও ডি লুসিয়া গাণিতিকভাবে ভ্যাকুয়ামের ক্ষয়ের নমুনা বানিয়েছেন। জানতে চেয়েছেন ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে ঘটে। তাঁরা দেখলেন, স্থানের একটি দৈব (random) অবস্থানে ক্ষয় শুরু হবে। এর আকৃতি হবে সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামের একটি ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের মতো। এটি অস্থিতিশীল নকল ভ্যাকুয়াম দ্বারা বেষ্টিত থাকবে। সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামের বুদ্‌বুদ তৈরি হওয়ামাত্রই এটি খুব দ্রুত প্রসারিত হতে থাকবে। প্রসারণের হার চলে আসবে আলোর বেগের কাছাকাছি, যা ক্রমেই নকল ভ্যাকুয়ামের বেশি অঞ্চলে ছেয়ে যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে সেই অঞ্চলগুলো সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামে পরিণত হবে। দুই অবস্থার মধ্যকার শক্তির পার্থক্য বুদ্‌বুদের দেয়ালে কেন্দ্রীভূত থাকবে। আর অবস্থাগুলো হয়তো হবে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত বড় মানগুলোর মতো। বুদ্‌বুদগুলো হয়তো মহাবিশ্বময় ঘুরে বেড়াবে, গতিপথের সবকিছু ধ্বংস করতে করতে।

সত্যিকারের বুদ্‌বুদের দেয়ালের কথা জানতে জানতে সেটা আমাদের দরজায় হানা দিয়ে ফেলবে। আমাদের জগতের কোয়ান্টাম কাঠামো হুট করে পাল্টে যাবে। আমরা তিন মিনিটের সতর্কসংকেতও পাব না। মুহূর্তের মধ্যে সব অতিপারমাণবিক কণা ও তাদের মিথস্ক্রিয়া আমূল পাল্টে যাবে। যেমন ধরুন, প্রোটন হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় হয়ে যাবে। এটা ঘটলে আকস্মিকভাবে সব বস্তু বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। যা কিছু বাকি থাকবে, সেটা চলে যাবে সত্যিকারের

ভ্যাকুয়ামের বুদ্‌বুদের অভ্যন্তরে। আমরা বর্তমানে যেমন দেখছি, সেটা হবে তার থেকে খুবই ভিন্ন। মহাকর্ষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন চোখে পড়বে। কোলম্যান ও ডি. লুসিয়া দেখেছেন, সত্যিকার ভ্যাকুয়ামের শক্তি ও চাপ এত তীব্র মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র তৈরি করবে যে বুদ্‌বুদ প্রসারিত হতে হতে বুদ্‌বুদ দিয়ে ঘেরা অঞ্চল ভেঙে পড়বে। এতে সময় লাগবে ১ মাইক্রোসেকেন্ডেরও কম। এ ক্ষেত্রে মহাসংকোচনের দিকে অগ্রযাত্রা কোমল হবে না। বরং হুট করে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। বুদ্‌বুদের ভেতরটা স্থান-কালের সিঙ্গুলারিটিতে গিয়ে গুটিয়ে যাবে। এককথায়, তাৎক্ষণিক এক সংকোচন ঘটবে। জোর দিয়ে কিন্তু সংযতভাবে তাঁরা বলছেন, এটা হতাশাজনক। তাঁরা আরও বলছেন, আমাদের নকল ভ্যাকুয়ামে বাস করার সম্ভাবনাকে কখনোই আনন্দচিত্তে গবেষণা করার বিষয় মনে হয়নি। ভ্যাকুয়ামের ক্ষয় পরিবেশের চূড়ান্ত বিপর্যয়। ভ্যাকুয়াম ক্ষয়ের পর আমাদের চেনাজানা প্রাণের অস্তিত্বই শুধু অসম্ভব নয়, এর গাঠনিক উপাদানও অসম্ভব। তবে সান্ত্বনার একটি জায়গা আছে। সম্ভবত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভ্যাকুয়াম স্থিতিশীল হবে। আমাদের চেনাজানা প্রাণের অস্তিত্ব না থাকলে এমন কিছু কাঠামো হয়তো থাকবে, যারা আনন্দ উপভোগ করতে জানবে। এ সম্ভাবনাও এখন আর নেই।

কোলম্যান ও ডি লুসিয়ার গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলে পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদেরা ভ্যাকুয়াম ক্ষয়ের ভয়ানক ফলাফল নিয়ে ব্যাপক আলোচনায় লেগে যান। ˆbPvi জার্নালে এর একটি ফলোআপ প্রকাশিত হয়। এটা লেখেন কসমোলজিস্ট মাইকেল টার্নার ও পদার্থবিদ ফ্র্যাঙ্ক উইলচজেক। তাঁরা একটি ভয়ানক ফলাফল বের করেন, 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের আচরণ থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের ভ্যাকুয়ামকে বাস্তবে স্থিতিশীল মনে হলেও এটি তা নয়। কোনো আগাম সংকেত ছাড়াই মহাবিশ্বের কোথাও সত্যিকার ভ্যাকুয়ামের একটি বুদ্‌বুদ তৈরি হয়ে যেতে পারে। বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে আলোর গতিতে।'

টার্নার ও উইলচজেকের প্রকাশনার পরপরই পিট হাট ও মার্টিন রিজ ˆbPvi-এই আরেকটি আতঙ্কের কথা প্রকাশ করেন। মহাবিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়ার মতো ভ্যাকুয়াম বুদ্‌বুদ হয়তো কণাপদার্থবিদেরাই মনের অজান্তে তৈরি করে ফেলতে পারেন। ভয়টা হচ্ছে, অতিপারমাণবিক কণাদের খুব উচ্চশক্তির সংঘর্ষে হয়তো এমন অবস্থা তৈরি হবে, যাতে ভ্যাকুয়াম ক্ষয় হয়ে যেতে চাইবে। হয়তো সেটা অল্প সময়ের জন্য ছোট্ট জায়গায়ই হবে। আণুবীক্ষণিক জগতেও একবার এই অবস্থান্তর ঘটলে নবসৃষ্ট এই বুদ্‌বুদকে থামানো যাবে না। খুদ দ্রুত এটি ছড়িয়ে বড় হয়ে যাবে। তাহলে পরের প্রজন্মের কণাত্বরকযন্ত্রগুলো কি নিষিদ্ধ করা উচিত? হাট ও রিজ অবশ্য আশ্বস্ত করছেন। তাঁরা বলছেন, মহাজাগতিক

রশ্মিগুলোতে শক্তি আমাদের কণাত্বরকযন্ত্রগুলোর চেয়ে বেশি হয়। আর মহাজাগতিক রশ্মিগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করে চলেছে। কিন্তু ভ্যাকুয়াম ক্ষয় তো তাতে শুরু হয়নি। তবে ত্বরকযন্ত্রের শক্তি কয়েক শ গুণ বাড়াতে পারলেই এত দিন মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীকে যে শক্তিতে আঘাত করেছে, তার চেয়ে বেশি তেজস্বী সংঘর্ষ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। কিন্তু পৃথিবীতে বুদ্‌বুদ তৈরি হতে পারে কি না, সেটা আসল বিষয় নয়। বিগ ব্যাংয়ের পরের কোনো এক সময় এই ঘটনা পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের কোথাও ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে কি না, সেটাই হলো আসল কথা। হাট ও রিজ বলেছেন, শক্তি বর্তমান ত্বরকযন্ত্রের চেয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন গুণ বেশি এমন দুটি মহাজাগতিক রশ্মির মুখোমুখি ধাক্কার লাগার সম্ভাবনা খুব কম। অতএব, ত্বরকযন্ত্রকে বন্ধ করে দেওয়ার এখনই কোনো দরকার নেই।

অন্যদিকে আবার যে বুদ্‌বুদ তৈরির কারণে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব হুমকির মুখে, সেই বুদ্‌বুদই একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মহাবিশ্বের অধিবাসীদের মুক্তির একমাত্র উপায় হতে পারে। মহাবিশ্বেও মৃত্যু থেকে বাঁচার একটি নিশ্চিত উপায় হলো আরেকটি মহাবিশ্ব তৈরি করে সেখানে পালিয়ে যাওয়া। এটা হয়তো কল্পনার ঘোড়ায় সবচেয়ে লম্বা লাগাম। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে 'শিশু মহাবিশ্ব' নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে। আর এদের অস্তিত্বের আলোচনা একেবারেই ছেলেমানুষি নয়।

১৯৮১ সালে বিষয়টি প্রথম আলোচনায় আনেন জাপানের একদল পদার্থবিদ। তাঁরা সত্যিকার ভ্যাকুয়াম দিয়ে বেষ্টিত একটি নকল ভ্যাকুয়ামের ছোট বুদ্‌বুদের আচরণের একটি সরল গাণিতিক বিশ্লেষণ চালান। এটা হলো একটু আগে বলা অবস্থার বিপরীত পরিস্থিতি। তাঁদের পূর্বাভাস বলছে, নকল ভ্যাকুয়াম তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়ে স্ফীত হবে। একটি বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে এটি প্রসারিত হয়ে বড় একটি মহাবিশ্বে রূপ লাভ করবে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, নকল ভ্যাকুয়ামের বুদ্‌বুদের স্ফীতির কারণে বুদ্‌বুদের দেয়াল এত প্রসারিত হবে যে নকল ভ্যাকুয়ামের অঞ্চল বড় হয়ে সত্যিকার ভ্যাকুয়ামের অঞ্চলকেও দখল করবে। কিন্তু এতে করে প্রত্যাশিত আচরণের উল্টো ঘটনা ঘটে। নিম্নশক্তির সত্যিকার ভ্যাকুয়ামই তো উচ্চশক্তির নকল ভ্যাকুয়ামকে সরিয়ে দেওয়ার কথা। উল্টোটা তো হওয়ার কথা নয়।

আজব ব্যাপার হলো, সত্যিকার ভ্যাকুয়াম থেকে দেখলে নকল ভ্যাকুয়ামের বুদ্‌বুদের দখল করা অঞ্চলকে দেখে স্ফীত হচ্ছে বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে এটাকে বরং দেখতে ব্ল্যাকহোলের মতো মনে হয়। (এ ক্ষেত্রে একে ডক্টর হুর টাইমমেশিনের টারডিসের মতো লাগে। যাকে বাইরের চেয়ে ভেতরে থেকে দেখলে বড় দেখায়) নকল ভ্যাকুয়াম বুদ্‌বুদের ভেতরে

অবস্থান করা একজন কাল্পনিক পর্যবেক্ষক মহাবিশ্বকে ব্যাপকভাবে স্ফীত হতে দেখবেন। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে একে খুব সংকুচিত মনে হবে।

এই অদ্ভুত অবস্থাটা বুঝতে হলে একটি উদাহরণ কাজে লাগতে পারে। ধরুন, একটি রাবারের চাদর একটি জায়গায় ফুলে উঠে বেলুনের মতো ছড়িয়ে গেল (১০.৪ চিত্র দেখুন)। এই বেলুন একধরনের শিশু মহাবিশ্ব তৈরি করবে। একটি সংযোজক সুতা বা ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে এটি মূল মহাবিশ্বের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। মূল মহাবিশ্ব থেকে ওয়ার্মহোলের গলাকে ব্ল্যাকহোলের মতো মনে হবে। এই গঠনটা খুব অস্থিতিশীল। হকিং প্রভাবের মাধ্যমে ব্ল্যাকহোলটি খুব দ্রুত মিলিয়ে যায়। মূল মহাবিশ্ব থেকেও খুব দ্রুত পুরোপুরি হারিয়ে যায়। ফলে ওয়ার্মহোলটি আলাদা হয়ে যায়। আর শিশু মহাবিশ্ব মূল মহাবিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে নিজেই হয়ে যায় নতুন ও এক স্বতন্ত্র মহাবিশ্ব। মূল মহাবিশ্ব থেকে কুঁড়ির জন্মের মাধ্যমে এই শিশু মহাবিশ্বের তৈরির মতো করেই আমাদের মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে বলে অনুমান করাও যেতেও পারে। হয়তো অল্প সময়ের জন্যে স্ফীতির পরে স্বাভাবিকভাবে প্রসারণ কমে এসেছিল। এই নমুনা স্পষ্ট করেই বলছে, আমাদের মহাবিশ্বও হয়তো এভাবেই এসেছে। এসেছে হয়তো অন্য কোনো মহাবিশ্বের সন্তান হিসেবে।

স্ফীতি তত্ত্বের জনক অ্যালান গুথ ও তাঁর সহকর্মীরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, ওপরে বর্ণিত চিত্র থেকে দারুণ একটি সম্ভাবনা পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষাগারেই হয়তো একটি মহাবিশ্ব বানানো যাবে। নকল ভ্যাকুয়াম ক্ষয়ে গিয়ে সত্যিকার ভ্যাকুয়ামের বুদ্‌বুদে পরিণত হওয়ার মতো আতঙ্কের ব্যাপার নয় এটি। সত্যিকার ভ্যাকুয়াম দিয়ে বেষ্টিত নকল ভ্যাকুয়ামের বুদ্‌বুদ তৈরির ঘটনা মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে না। হ্যাঁ, পরীক্ষা চালাতে গিয়ে একটি বিগ ব্যাংয়ের সূচনা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর বিস্ফোরণ ক্ষুদ্র একটি ব্ল্যাকহোলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর ব্ল্যাকহোলটি খুব দ্রুতই মিলিয়ে যাবে। নতুন মহাবিশ্ব নিজেই নিজের জায়গা বানিয়ে নেবে। আমাদের কোনো স্থান কেড়ে নেবে না।

হ্যাঁ, ভাবনাটি অনেকখানি অনুমাননির্ভর। এটি পুরোপুরি গাণিতিক তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তবে কিছু কিছু গবেষণা বলছে, এই প্রক্রিয়ায় নতুন মহাবিশ্ব জন্মলাভ করতেও পারে। খুব যত্নের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ শক্তিকে ঘনীভূত করে রচিত হতে পারে মহাবিশ্ব। খুব দূরের ভবিষ্যতে আমাদের নিজস্ব মহাবিশ্ব বাসের অযোগ্য হয়ে গেলে বা মহাধসের সম্মুখীন হলে আমাদের বংশধরেরা চিরতরে এখান থেকে চলে যেতে পারে। কুঁড়ি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন মহাবিশ্ব রচনা করে সংযোজক ওয়ার্মহোল দিয়ে সেই মহাবিশ্বে যেতে হবে। সেটাই হয়তো হবে চূড়ান্ত পরিযান বা স্থানান্তর। অবশ্য কেউই ঠিক

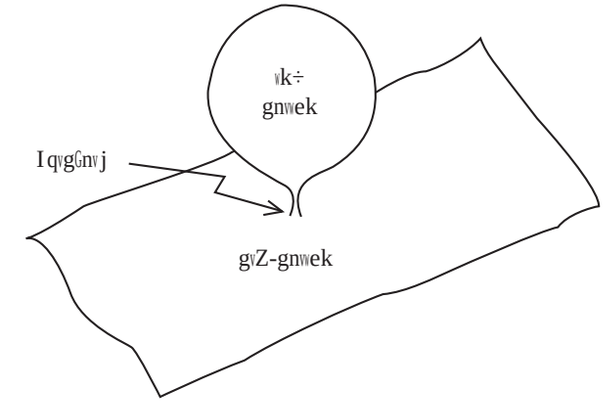

চিত্র ১০.৪

মূল মহাবিশ্ব থেকে বেলুনের মতো ছড়িয়ে গিয়ে একটি শিশু মহাবিশ্বের জন্ম। মূল মহাবিশ্বের সঙ্গে একটি সংযোজক সুতার সাহায্যে যুক্ত থাকে। মূল মহাবিশ্ব থেকে তাকালে ওয়ার্মহোলের মুখকে ব্ল্যাকহোল মনে হবে। ব্ল্যাকহোল মিলিয়ে গেলে ওয়ার্মহোলের গলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে সম্পূর্ণ নতুন একটি স্বতন্ত্র মহাবিশ্ব জন্মলাভ করে।

বলতে পারবেন না কীভাবে নির্ভীক প্রাণীরা এই কাজটি করবে বা আদৌ পারবে কি না। কম করে বললেও এই ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে যাত্রাটা মোটেও আরামদায়ক হবে না। যদি না যে ব্ল্যাকহোলে তারা ঢুকবে সেটি খুব বড় হয়।

এসব বাস্তব বিষয় বাদ দিলে শিশু মহাবিশ্বের ধারণা কিন্তু সত্যিকারের অম্বরত্বের পথ খুলে দিচ্ছে। শুধু আমাদের বংশধরদের জন্যই নয়, মহাবিশ্বের জন্যও। মহাবিশ্বের জন্ম-মৃত্যুর কথা চিন্তা করার বদলে আমাদের একগুচ্ছ মহাবিশ্ব নিয়ে ভাবতে হবে। চিরকাল যার সংখ্যা শুধু বাড়বে। প্রতিটি থেকে জন্ম হবে নতুন প্রজন্মের আরও অনেক অনেক মহাবিশ্ব। হয়তো অসংখ্য। মহাজাগতিক এই উর্বরতার ফলে এই মহাবিশ্বগুলোর সমাবেশ যাকে বলা উচিত মেগাভার্স-এর কোনো শুরু বা শেষ থাকবে না। প্রতিটি মহাবিশ্বেরই জন্ম থাকবে। ক্রমবিকাশ থাকবে। মৃত্যু থাকবে। আগের অধ্যায়গুলোতে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে। কিন্তু সার্বিকভাবে তাদের গুচ্ছ টিকে থাকবে চিরকাল।

এই চিত্র থেকে একটি প্রশ্ন তৈরি হয়: আমাদের মহাবিশ্ব কি প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা (স্বাভাবিকভাবে শিশুর জন্মের মতো) নাকি কোনো ইচ্ছার বাস্তবায়ন (টেস্টটিউব শিশুর মতো)? আমরা কল্পনা করতে পারি, মূল মহাবিশ্বের একটি যথেষ্ট উন্নত ও পরোপকারী জাতি হয়তো একটি শিশু

মহাবিশ্ব তৈরির সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সেটা নিজেদের টিকে থাকা নিশ্চিত করতে পালানোর ব্যবস্থা করতে নয়, বরং নিজদের মহাবিশ্ব শেষ হয়ে গেলেও অন্য জায়গায় প্রাণের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে। এটা হলে শিশু মহাবিশ্বে যাওয়ার জন্য অতিক্রমযোগ্য ওয়ার্মহোল তৈরি করতে গেলে যে কষ্ট হবে, তার আর কোনো দরকার হবে না।

শিশু মহাবিশ্ব মূল মহাবিশ্বেরই বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে, তা বলা যাচ্ছে না। প্রকৃতির বিভিন্ন বল ও বস্তুকণার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনো জানেন না। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হয়তো প্রকৃতির সূত্রের অংশ হতে পারে। যেগুলো হয়তো সব সময় সব মহাবিশ্বের জন্য কাজ করবে। অন্যদিকে কিছু বৈশিষ্ট্য আবার ক্রমবিকাশের ফলেও তৈরি হতে পারে। যেমন ধরুন, বেশ কয়েকটি সত্যিকার ভ্যাকুয়াম অবস্থার অস্তিত্ব থাকতে পারে, যার সবগুলোর শক্তি একই রকম বা প্রায় একই রকম। স্ফীতি যুগের শেষে নকল ভ্যাকুয়াম ক্ষয় হলে হয়তো-বা এটি অনেকগুলো সম্ভাব্য ভ্যাকুয়াম অবস্থার একটি দৈবভাবে বেছে নেয়। মহাবিশ্বের পদার্থবিদ্যার সূত্রের কথা বলতে হলে বলতে হয়, কণা ও তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের অনেক বৈশিষ্ট্যই নির্দিষ্ট ধরনের ভ্যাকুয়াম অবস্থাই ঠিক করে দেয়। একইভাবে নির্দিষ্ট করে স্থানের মাত্রার সংখ্যাও। ফলে শিশু মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য মূল মহাবিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। হয়তো এগুলোর অল্প কয়েকটিতেই শুধু প্রাণের উদ্ভব ঘটা সম্ভব হবে, যেখানে পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো আমাদের মহাবিশ্বের মতো বা কাছাকাছি হবে। অথবা হয়তো গুণাবলির ধারাবাহিকতা রক্ষার কোনো নীতি আছে, যার মাধ্যমে অদ্ভুত মিউটেশন ছাড়া মূল মহাবিশ্বের বাকি বৈশিষ্ট্যগুলো শিশু মহাবিশ্বে ভালোভাবে সঞ্চারিত হওয়া নিশ্চিত হয়। পদার্থবিদ লি স্মোলিন বলেছেন, মহাবিশ্বগুলোর মধ্যে হয়তো এমন একটি প্রক্রিয়া কাজ করে থাকতে পারে, যা পরোক্ষভাবে প্রাণ ও সচেতনতার আবির্ভাবের সমর্থন দেয়। এর চেয়ে মজার একটি সম্ভাবনাও আছে। মহাবিশ্বগুলো হয়তো মূল মহাবিশ্বের কোনো বুদ্ধিমান সত্তার ইচ্ছার প্রতিফলন। এগুলোতে হয়তো পরিকল্পনা করেই প্রাণ ও সচেতনতার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ভাবনা খামখেয়ালি অনুমানমাত্র। কিন্তু কসমোলজি শাখাটিই তো খুব নতুন একটি বিজ্ঞান। তবুও আগের অধ্যায়গুলোতে যে আবছা পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, এই কল্পনাপ্রবণ কথাগুলো তার কিছুটা হলেও অন্তত পরিষ্কার করবে। এগুলো থেকে বলা যায়, একদিন আমাদের বংশধরেরা শেষ ৩ মিনিটের মুখোমুখি হলেও কোথাও না কোথাও হয়তো সচেতন প্রাণীদের অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে।

একাদশ অধ্যায়

যে পৃথিবীর শেষ নেই

মহাজাগতিক বিপর্যয় এড়ানোর পথ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আগের অধ্যায়ের শেষে আলোচিত কথাগুলো ছাড়াও আরও কিছু সম্ভাবনা আছে। মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে লেকচার দিতে গেলেই সাধারণত কেউ না কেউ আমাকে চক্রাকার মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনই। মহাবিশ্ব একটি সর্বোচ্চ সাইজ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। তারপর গুটিয়ে মহাসংকোচন ঘটে। কিন্তু পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার বদলে এটি কোনোভাবে লাফিয়ে ওঠে। শুরু করে প্রসারণ ও সংকোচনের আরেকটি চক্র (চিত্র ১১.১ দেখুন)। এই প্রক্রিয়া হয়তো চিরকাল চলতে পারে। সে ক্ষেত্রে মহাবিশ্বের সত্যিকারের কোনো শুরু বা শেষ থাকবে না। প্রতিটি আলাদা আলাদা চক্রের স্বতন্ত্র সূচনা ও শেষ থাকবে যদিও। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত মানুষের কাছে এই তত্ত্বটা বিশেষ পছন্দের। ধর্মগুলোতে জন্ম-মৃত্যু ও সৃষ্টি-ধ্বংসের চক্র জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মহাবিশ্বের শেষের সময়ের জন্য দুটো খুব আলাদা চিত্রের বর্ণনা দিয়েছি আমি। এর কোনোটাই আশার আলো দেখায় না। মহাধসের মাধ্যমে মহাবিশ্বের নিজেকে ধ্বংস করে দেওয়ার সম্ভাবনা খুব ভয়ংকর কথা। সেটা যত দিন পরেই ঘটুক না কেন, তাতে কিছু আসে-যায় না। অন্যদিকে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্বমহিমায় সচল থাকা মহাবিশ্বের অসীম সময় পর্যন্ত মলিন অবস্থায় ফাঁকা হয়ে পড়ে থাকার বিষয়টা অবশ্যই মন খারাপ করে দেবে। কিছু কিছু মডেল থেকে মহাপ্রাণীদের তথ্য প্রসেসের যে অসীম ক্ষমতা অর্জনের সম্ভাবনা দেখা যায়, সেটা হয়তো আমাদের উষ্ণ রক্তের মানুষের কাছে শীতল সান্ত্বনা মনে হবে।

চক্রাকার নমুনা একদিক থেকে খুব লোভনীয়। এতে মহাবিশ্ব পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যগুলো চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এর ক্ষয় ঘটছে না। অবিরাম পুনরাবৃত্তিকে ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করতে

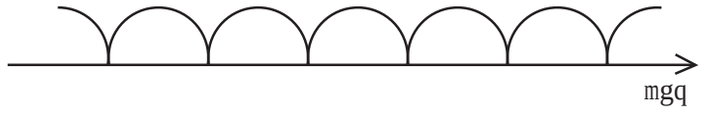

চিত্র ১১.১

মহাবিশ্বের চক্রাকার মডেল। নিয়মিত বিরতিতে মহাবিশ্বের আকার খুব ঘন ও খুব স্ফীত অবস্থার মধ্যে স্পন্দিত হয়। প্রতিটি চক্রের শুরু হয় একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে। শেষ হয় সংকোচনের মাধ্যমে। সময়ের সাপেক্ষে এটি মোটামুটি প্রতিসম।

হলে প্রতিটি চক্রকে কোনোভাবে অন্য চক্রগুলো থেকে আলাদা হতে হবে। তত্ত্বটির একটি জনপ্রিয় রূপ অনুসারে প্রতিটি নতুন চক্র এর পূর্ব রূপের নির্মম মৃত্যু থেকে ফিনিক্সের[১] মতো করে আবির্ভূত হয়। আদিম অবস্থা থেকে এটি নতুন কাঠামো গড়ে তোলে। পরের মহাসংকোচনে সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে এটিও নিজের মহিমা প্রদর্শন করে।

তত্ত্বটাকে দেখে কিন্তু আকর্ষণীয়ই মনে হয়। তবে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, এতে মারাত্মক কিছু ভৌত সমস্যা আছে। এর একটি হলো, এমন একটি গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া খুঁজে বের করা, যা সংকোচনশীল মহাবিশ্বের ঘনত্ব বেড়ে গেলে তাকে মহাসংকোচনের মাধ্যমে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে পুনরায় প্রসারিত করবে। এর জন্য মহাকর্ষের বিপরীতে কাজ করা কোনো ধরনের বল উপস্থিত থাকতে হবে। সংকোচনের শেষের পর্যায়ে যেটি অতিমাত্রায় বড় হয়ে উঠবে। যার ফলে অন্তঃস্ফোটন প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হবে। প্রতিহত হবে মহাকর্ষের দুমড়েমুচড়ে দেওয়ার অদম্য ক্ষমতা। বর্তমানে এমন কোনো বলের কথা জানা নেই। থাকলেও এর বৈশিষ্ট্য হতো খুবই অদ্ভুত।

আপনাদের হয়তো মনে আছে, বিগ ব্যাংয়ের স্ফীতি তত্ত্বে ঠিক এমন শক্তিশালী এক বিকর্ষী বলের কথাই বলা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, যে উত্তেজিত ভ্যাকুয়াম অবস্থা থেকে স্ফীতি বল তৈরি হয়, সেটা খুবই অস্থিতিশীল। তৈরি হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই এটি ধ্বংস হয়ে যায়। অবশ্য এটা সহজেই বোঝা যায় যে ক্ষুদ্র, সরল ও অপক্ক মহাবিশ্ব তো এমন অস্থিতিশীল অবস্থায়ই জন্ম নেবে। কিন্তু জটিল এক ম্যাক্রোস্কোপিক অবস্থা থেকে সংকুচিত হয়ে মহাবিশ্ব সব জায়গায় উত্তেজিত ভ্যাকুয়াম অবস্থা ফিরে পাবে—এমন ধারণা করা একেবারে ভিন্ন কথা। ব্যাপারটা একটা পেনসিলকে এর অগ্রভাগের ওপর দাঁড় করানোর মতো। পেনসিলটা খুব দ্রুত কাত হয়ে পড়ে যাবে। পেনসিলকে আবার আগের মতো মাথার ওপর দাঁড় করানো অনেক কঠিন কাজ হবে।

এ সমস্যাগুলো এড়ানো যাবে ধরে নিলেও চক্রাকার মহাবিশ্বের ধারণায় আরও জটিলতা থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর একটি নিয়ে আলোচনা করেছি। অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ায় চলা সিস্টেমগুলো সসীম হারে চলতে থাকলে সসীম সময়ের মধ্যেই তাদের শেষ অবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে। এই নীতির মাধ্যমেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহাবিশ্বের তাপীয় মৃত্যুর পূর্বানুমান করা হয়েছিল। মহাজাগতিক চক্রের ধারণা নিয়ে এলেও সমস্যাটি থেকেই যায়। মহাবিশ্বকে ক্রমেই ধীরগতিতে চলা একটি ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করা যায়। একসময় অনিবার্যভাবে এর কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে, যদি-না এর কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। কিন্তু কোন সে কৌশল যে নিজে অপ্রত্যাগামী পরিবর্তন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে মহাজাগতিক ঘড়ির পুনরাবৃত্তি করাবে?

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে ভৌত প্রক্রিয়াগুলো যেভাবে উল্টো দিকে কাজ করে, তেমনিভাবেই মহাবিশ্বের সংকোচন পর্যায় প্রসারণ পর্যায়ের মতোই হবে। বিক্ষিপ্ত হতে থাকা ছায়াপথগুলো কাছে চলে আসতে বাধ্য হবে। শীতল হতে থাকা পটভূমি বিকিরণ আবারও উত্তপ্ত হবে। আর জটিল পদার্থগুলো ভেঙে গিয়ে মৌলিক কণার স্যুপে পরিণত হবে। বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরে মহাবিশ্বের যে অবস্থা ছিল, মহাসংকোচনের ঠিক আগেও প্রায় একই রকম অবস্থা হবে। তবে দেখে এমনটা মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু এটা হবে না। মহাবিশ্বের পেছনে ঘোরার সময়ের জ্যোতির্বিদদের পর্যবেক্ষণ কেমন হবে, সেটা থেকে আমরা একটি ধারণা পেতে পারি। সে সময় প্রসারণ বন্ধ হয়ে সংকোচন চলতে থাকবে। ফলে সে সময়ের জ্যোতির্বিদ কিন্তু তখনো দেখবেন, বহু বিলিয়ন বছর ধরে ছায়াপথগুলো দূরে সরছে। দেখে মনে হবে, মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়েই চলেছে। যদিও আসলে সংকোচন শুরু হয়ে গেছে। এই ভুলের কারণে আলোর বেগ সসীম হওয়ায় সত্যিকার ঘটনা চোখে আসতে সময় লেগে যাচ্ছে।

১৯৩০-এর দশকে কসমোলজিস্ট রিচার্ড টোলম্যান দেখান, কীভাবে এই কারণে মহাবিশ্বের আপাতপ্রতিসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কারণটা খুব সরল। মহাবিশ্বের শুরুর সময় বিগ ব্যাং থেকে প্রচুর পরিমাণ তাপ বিকিরণ ধ্বংসাবশেষ হিসেবে থেকে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রের আলোর প্রভাবে এই বিকিরণ আরও বাড়ে। কয়েক বিলিয়ন বছর পর মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়া নক্ষত্রের আলোর জমাকৃত শক্তি পটভূমি তাপের সমান হয়। এর অর্থ হলো, সংকোচনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় মহাবিশ্বজুড়ে বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরের সময়ের চেয়ে লক্ষণীয় রকম বেশি পরিমাণ বিকিরণ শক্তি উপস্থিত থাকে। ফলে মহাবিশ্ব আবার যখন সংকুচিত হয়ে আজকের অবস্থায় আসবে, তখন এর উত্তাপ আরেকটু বেশি থাকবে।

এই বাড়তি তাপশক্তির জোগান দেয় মহাবিশ্বের ভৌত উপাদানগুলো। এটা কাজ করে আইনস্টাইনের $E=mc^2$ সূত্র দিয়ে। তাপশক্তি তৈরি করা নক্ষত্রের ভেতরে হাইড্রোজেনের মতো হালকা মৌলগুলো প্রসেস হয়ে আয়রন বা লোহার মতো ভারী মৌলে পরিণত হয়। সাধারণত আয়রনের একটি নিউক্লিয়াসে ২৬টি প্রোটন ও ৩০টি নিউট্রন থাকে। আপনার হয়তো মনে হবে, তাহলে তো এমন একটি নিউক্লিয়াসের ভর হবে ২০টি প্রোটন ও ৩০টি নিউট্রনের ভরের সমান। কিন্তু না। এভাবে তৈরি নিউক্লিয়াসের ভর আলাদা কণা দুটির মিলিত ভরের ১ ভাগ কম হয়। ভরের এই ঘাটতি হয়েছে সবল নিউক্লীয় বলের বন্ধন শক্তি তৈরি করতে গিয়ে। এই শক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকা ভরটুকুই নক্ষত্রের শক্তি হিসেবে নির্গত হয়।

এত সবকিছুর ফল হচ্ছে বস্তু থেকে বিকিরণে শক্তির নিট রূপান্তর। মহাবিশ্বের প্রসারণ প্রক্রিয়ার ওপর এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে। কারণ, বিকিরণে মহাকর্ষীয় টান একই ভরশক্তির পদার্থের টান থেকে একদমই আলাদা। টোলম্যান দেখিয়েছেন, সংকোচন পর্যায়ের বাড়তি বিকিরণের কারণে মহাবিশ্ব গুটিয়ে যায় আরও দ্রুত বেগে। আর কোনোভাবে যদি আরও একবার বিপরীত প্রক্রিয়া শুরু হয়, তাহলে দেখা যাবে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে আরও দ্রুত হারে। অন্যভাবে বললে, প্রতিটি বিগ ব্যাং আগেরটির চেয়ে বড় হবে। ফলে প্রতিটি নতুন চক্রে মহাবিশ্ব আগের চেয়ে বেশি প্রসারিত হবে। ফলে চক্রগুলো একই সঙ্গে বড় ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। (দেখুন ১১.২ নম্বর চিত্র)।

মহাজাগতিক চক্রের বৃদ্ধির অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার রহস্যও জানা। এটাও তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের অনিবার্য পরিণতির একটি উদাহরণ। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা বিকিরণের ফলে বাড়ে এনট্রপিও। এর প্রকাশ ঘটে মহাকর্ষীয়ভাবে ক্রমেই বড় থেকে আরও বড় চক্র তৈরির মাধ্যমে। তবে এর মাধ্যমে কিন্তু সত্যিকার অর্থে চক্র বলতে যা বোঝায়, তারও অবসান ঘটে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই মহাবিশ্বে পরিবর্তন ঘটে। অতীতের চক্রগুলো একের পর এক জটিল ও বিশৃঙ্খল সূচনার জন্ম দিয়েছে। আর ভবিষ্যতের চক্র প্রসারিত হবে লাগামহীনভাবে। একসময় এটি এত বড় হবে যে একটি নির্দিষ্ট চক্রের বড় অংশকে চিরপ্রসারমাণ চিত্রের তাপীয় মৃত্যু থেকে আলাদা করে চেনা যাবে না।

টোলম্যানের কাজের পরও বিজ্ঞানীরা এমন অন্য কিছু প্রক্রিয়াও খুঁজে পেয়েছেন, যা প্রতিটি চক্রের প্রসারণ ও সংকোচনের প্রতিসাম্য নষ্ট করে দেয়। এর একটি উদাহরণ হলো ব্ল্যাকহোলের সৃষ্টি। আদর্শ অবস্থা চিন্তা করলে, মহাবিশ্বের জন্ম হয় ব্ল্যাকহোল ছাড়া। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্ররা সংকুচিত হয়। আর অন্য প্রক্রিয়ায়ও তৈরি হয় ব্ল্যাকহোল। ছায়াপথের

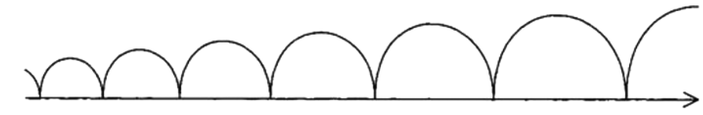

চিত্র ১১.২

[অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার কারণে মহাজাগতিক চক্র ক্রমেই বড় হতে থাকে। ফলে একসময় চক্র বলতেই কিছু থাকে না।

ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরও আরও ব্ল্যাকহোল তৈরি হতে থাকে। সংকোচনের শেষ পর্যায়গুলোতে আরও বেশি ব্ল্যাকহোল তৈরির পরিবেশ তৈরি হয়। কিছু ব্ল্যাকহোল মিলিত হয়ে বড় ব্ল্যাকহোলও তৈরি হয়। ফলে মহাসংকোচনের কাছাকাছি সময়ের মহাবিশ্বের অবস্থা বিগ ব্যাংয়ের পরের সময় থেকে অনেক বেশি জটিল। এটা পরিষ্কার যে সংকোচনের সময় অনেক বেশি ব্ল্যাকহোল থাকবে। মহাবিশ্বের চক্র নতুন করে শুরু হলে পরের চক্র অনেক বেশিসংখ্যক ব্ল্যাকহোল নিয়ে যাত্রা শুরু করবে।

ফলে মনে হচ্ছে যে চক্রীয় মহাবিশ্বে এক চক্র থেকে পরের চক্রে ভৌত কাঠামো স্থানান্তরিত হতে পারে, তার জন্য তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের বৈশিষ্ট্যক্ষয়কারী প্রভাব এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। এখানেও তাপীয় মৃত্যু ঘটবে। এই হতাশাজনক পরিণতি রোধ করার একটি উপায়ও আছে। সে জন্য ধরে নিতে হবে, প্রতিটি নতুন চক্রের ভৌত অবস্থা এত চরম যে আগের চক্রের কোনো তথ্য পরের চক্রে পৌঁছাতে পারে না। আগের সব ভৌত বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়। সব প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত মহাবিশ্ব একেবারে নতুন করে জন্মলাভ করে।

এমন একটি মডেলে আকর্ষণীয় কোনো দিক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। প্রতিটি চক্র ভৌতভাবে অন্য চক্র থেকে আলাদা হয়ে থাকলে এক চক্রের পর আরেক চক্র আস্তে, এমন কথা বলার কি কোনো অর্থ থাকে? বাস্তব তো প্রতিটি চক্রই আলাদা মহাবিশ্ব। এভাবেও তো বলা যায় যে এগুলো একের পর এক না থেকে অবস্থান করে সমান্তরালে। এই অবস্থাটি পুনর্জন্মবাদের কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে প্রতিটি মানুষ আগের জন্মের কথা ভুলে যায়। তাহলে কোন অর্থে বলা যাবে যে আগের মানুষটির পুনর্জন্ম হয়েছে?

আরেকটি সম্ভাবনা হলো, কোনোভাবে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে। ফলে পেছনে ঘোরার সময় ঘড়িটি নতুন করে ঘোরা শুরু করে। দ্বিতীয় সূত্র যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাবে সেটার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে এটি

তাহলে কী বলছে? সূত্রটির একটি বাস্তব উদাহরণ দেখা যাক। বোতল থেকে সুগন্ধির উবে যাওয়ার কথাই ধরুন না। সুগন্ধির আচরণ পাল্টে গেলে একটি আমূল পরিবর্তন ঘটবে, যেখানে ঘরে প্রতিটি কোনায় অবস্থান করা সুগন্ধির অণুগুলো ফিরে আসবে বোতলে। চলচ্চিত্র চলবে উল্টো দিকে। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র থেকেই আমরা অতীত ও ভবিষ্যতের পার্থক্য বুঝতে পারি, যার নাম সময়ের তির। তার মানে এই সূত্রের ব্যত্যয় ঘটলে সময় চলতে শুরু করবে উল্টো দিকে।

বিপর্যয় চলে এলে সময় পেছনে চলতে শুরু করবে মনে করাটা মহাজাগতিক মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়ার কিছুটা সাদামাটা একটি কৌশল। সময় খারাপ হয়ে গেলে মহাজাগতিক চলচ্চিত্রটাকে পেছন দিকে চালিয়ে দাও, ব্যস! তবে এই চিন্তাটাকেও অনেক কসমোলজিস্ট গ্রহণ করেছেন। ১৯৬০-এর দশকে জ্যোতিঃপদার্থবিদ থমাস গোল্ড এমন একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, পুনরায় সংকোচনশীল মহাবিশ্বের সংকোচন দশায় মহাবিশ্ব হয়তো পেছনে চলতে শুরু করবে। তিনি মনে করিয়ে দেন, এর ফলে কিন্তু সেই সময় জীবিত থাকা প্রাণীদের মস্তিষ্কও পেছনে চলবে। ফলে তাদের কাছে সময়ের ধারণাও বিপরীত হয়ে যাবে। ফলে সংকোচনশীল মহাবিশ্বের প্রাণীরা তাদের চারপাশের সবকিছুকে পেছনে চলতে দেখবে না। বরং আমাদের মতোই সবকিছুকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখবে। যেমন তারা মনে করবে মহাবিশ্ব সংকুচিত নয়, প্রসারিত হচ্ছে। তাদের চোখে মনে হবে, আমাদের সময়ের মহাবিশ্বই সংকুচিত হচ্ছিল। আর আমাদের মস্তিষ্কই কাজ করছিল বিপরীত দিকে।

১৯৮০-এর দশকে স্টিফেন হকিংও সময়ের উল্টো দিকে ঘোরা নিয়ে কিছু মজার কাজ করেন। পরে সেই চিন্তা থেকে সরে আসেন। আর বলেন, সেটা ছিল তার সবচেয়ে বড় ভুল। প্রথমে হকিংয়ের বিশ্বাস ছিল, চক্রাকার মহাবিশ্বে কোয়ান্টাম মেকানিকস প্রয়োগ করতে গেলে বিস্তারিত সময় প্রতিসাম্য দরকার হবে। পরে দেখা গেল, বিষয়টা তেমন নয়। কোয়ান্টাম মেকানিকসের আদর্শ সূত্রায়ন অন্তত এমনই বলে। সম্প্রতি মারে গিলম্যান ও জেমস হার্টল কোয়ান্টাম মেকানিকসের সূত্রগুলোকে একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করেছেন। এখানে তাঁরা সময় প্রতিসাম্য যুক্ত করেছেন। এরপর প্রশ্ন রেখেছেন, এই অবস্থা আমাদের মহাজাগতিক সময়কালে পর্যবেক্ষণযোগ্য কোনো প্রভাব রাখবে কি না। এখন পর্যন্ত এর উত্তর পরিষ্কার নয়।

মহাজাগতিক বিপর্যয় এড়ানোর সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি উপায় বলেছেন রুশ পদার্থবিদ আন্দ্রেই লিন্দ। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত স্ফীতি তত্ত্বকে বিস্তৃত করে উপায়টি ভাবা হয়েছে। মূল স্ফীতি তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে, খুব

প্রারম্ভিক মহাবিশ্বের কোয়ান্টাম অবস্থা একটি নির্দিষ্ট উত্তেজিত ভ্যাকুয়ামে সঙ্গে সম্পর্কিত, যার প্রভাবে কিছু সময় ধরে ব্যাপক প্রসারণ ঘটেছিল। ১৯৮৩ সালে লিন্দ বলেন, একেবারে প্রাথমিক মহাবিশ্বের কোয়ান্টাম অবস্থা বরং বিশৃঙ্খল উপায়ে জায়গাভেদে আলাদা হতে পারে। কোথাও নিম্নশক্তি, কোথাও মোটামুটি উত্তেজিত অবস্থা, কোথাও আবার অনেক বেশি উত্তেজিত প্রভৃতি। উত্তেজিত অঞ্চলে স্ফীতি ঘটে। এ ছাড়া কোয়ান্টাম অবস্থার আচরণ নিয়ে করা লিন্দের হিসেবে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, অতি-উত্তেজিত অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি স্ফীতি ঘটে। আর ক্ষয় ঘটে সবচেয়ে কম। তার মানে, কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল যত বেশি উত্তেজিত থাকবে, সেটি তত বেশি স্ফীত হবে। বোঝাই যাচ্ছে, খুব অল্প সময় পরই যে অঞ্চলে ঘটনাক্রমে শক্তি বেশি ও স্ফীতি সবচেয়ে দ্রুত ঘটেছে, সেটি খুব তাড়াতাড়ি স্ফীত হয়ে মোট স্থানের বেশির ভাগ অংশ দখল করে ফেলবে। লিন্দ বিষয়টাকে অর্থনীতির সঙ্গে তুলনা করেন। কোনো স্থানের খুব উত্তেজিত একটি অবস্থার একটি সফল কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশনের ফলে সেই স্থানের আয়তন হুট করে অনেক অনেক বেড়ে যাবে। যদিও সে জন্য প্রচুর শক্তি ধার করতে হবে। ফলে ধার করা শক্তির এই অতিস্ফীত অঞ্চলগুলোই মহাবিশ্বে বেশি থাকবে।

বিশৃঙ্খল এই স্ফীতির কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই মহাবিশ্ব অনেকগুলো ছোট ছোট মহাবিশ্বের বা বুদ্‌বুদের একটি গুচ্ছে পরিণত হবে। কিছু কিছু স্ফীতি হবে পাগলে মতো। কিছু কিছু আবার একটুও স্ফীত হবে না। নিছক এলোমেলো ফ্ল্যাকচুয়েশনের কারণে কিছু কিছু এলাকায় অনেক বেশি উত্তেজিত শক্তি থাকবে। ফলে সেসব এলাকায় প্রাথমিক সূত্রে যতটা মনে করা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি স্ফীতি হবে। আবার এই স্থানগুলোই সবচেয়ে বেশি স্ফীত হবে বলে স্ফীতি-উত্তর মহাবিশ্ব থেকে দৈবভাবে একটি বিন্দু বাছাই করলে সেটি খুব স্ফীত অঞ্চলে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। অতএব মহাশূন্যে আমরা হয়তো অতিস্ফীত একটি অঞ্চলের গভীরে আছি। লিন্দের হিসাব অনুসারে, বড় বুদ্‌বুদ হয়তো ১০x১০৮ গুণ বড় হয়েছে। মানে ১-এর পরে ১০ কোটি শূন্য দিলে যে সংখ্যা হয়, তত গুণ।

অসীমসংখ্যক অতিস্ফীত বুদ্‌বুদের মধ্যে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। ফলে বড় মাপকাঠিতে চিন্তা করলে আমাদের মহাবিশ্বকেও ব্যাপক বিশৃঙ্খল মনে হবে। আমাদের বুদ্‌বুদটি বর্তমানে পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের চেয়ে অনেক অনেক বড়। বুদ্‌বুদের অভ্যন্তরে পদার্থ ও শক্তি প্রায় সুষমভাবে বিন্যস্ত থাকবে। কিন্তু বুদ্‌বুদের বাইরে থাকবে অন্য আরও বুদ্‌বুদ। এ ছাড়া থাকবে এমন অঞ্চল, যেখানে এখনো স্ফীতি চলছে। আসলে লিন্দের মডেলে স্ফীতি কখনোই থামে না। সব সময়ই কোনো না কোনো স্থানে স্ফীতি চলতেই

থাকে। অন্য বুদ্‌বুদ তৈরি হতে থাকে। যদিও ততক্ষণে অন্য বুদ্‌বুদরা জীবনকাল শেষ করে মরে যাচ্ছে। ফলে এটাও একধরনের চিরন্তন মহাবিশ্ব। আগের অধ্যায়ে আলোচিত শিশু মহাবিশ্বের মতো অনেকটা, যেখানে জীবন, আশা ও মহাবিশ্বরা প্রতিনিয়ত জন্মলাভ করে। স্ফীতির মাধ্যমে নতুন বুদ্‌বুদ মহাবিশ্ব তৈরি চলতেই থাকে। এর হয়তো কোনো নির্দিষ্ট সূচনা ছিল না। অবশ্য এটা নিয়ে বর্তমানে কিছু বিতর্ক আছে।

অন্য বুদ্‌বুদের উপস্থিতির কারণে আমাদের বংশধরেরা কি টিকে থাকার অনুকূল পরিবেশ পাবে? তারা কি মারা যাওয়ার আগে আগে অন্য নতুন বুদ্‌বুদে সরে গিয়ে মহাজাগতিক বিপর্যয় বা আরও সঠিক করে বললে বুদ্‌বুদীয় বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে? লাইফ অ্যান্ড ইনফ্লেশন নামে একটি বীরোচিত গবেষণাপত্রে লিন্দ বিষয়টি আলোচনা করেন। এটা প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালের wdwRKm ˆjUvim Rvbvj-এ। তিনি বলেন, 'এই ফলাফলগুলো বলছে, স্ফীতি মহাবিশ্বে জীবনের অবসান কখনো হবে না। দুর্ভাগ্য হলো, এটা থেকে বলে দেওয়া যাচ্ছে না যে মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা খুব আশাবাদী হতে পারব। যেকোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা বুদ্‌বুদই ধীরে ধীরে বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। ফলে টিকে থাকার একমাত্র কৌশল হবে ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এলে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে চলে যাওয়া।"

লিন্দের স্ফীতি তত্ত্বে একটি হতাশাজনক দিক আছে। সেটা হলো একটি আদর্শ বুদ্‌বুদ অনেক অনেক বড়। তাঁর হিসাবমতে, আমাদের সবচেয়ে কাছের বুদ্‌বুদ এত দূরে আছে যে আলোকবর্ষ এককে তা প্রকাশ করতে হলে ১-এর পর কয়েক মিলিয়ন শূন্য বসাতে হবে। এটা এত বড় সংখ্যা যে একে লিখতে গেলে পুরো একটি বিশ্বকোষের পাতা শেষ হয়ে যাবে। আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে গেলেও এই দূরত্ব পাড়ি দিতে প্রায় একই পরিমাণ বছর সময় লাগবে, যদি না সৌভাগ্যক্রমে আমরা আমাদের বুদ্‌বুদের একেবারে প্রান্তের দিকে অবস্থান করে থাকি। এটাও সম্ভব হবে, যদি আমাদের মহাবিশ্ব অনুমিত পদ্ধতিতে প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমান সময়ে প্রকট ভূমিকা রাখা পদার্থ ও বিকিরণ অসীম পরিমাণ হালকা হয়ে গেলে বর্তমানে একেবারেই বোঝা সম্ভব নয়, এমন সবচেয়ে সূক্ষ্ম কোনো ভৌত প্রভাবের ওপরই হয়তো শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের প্রসারণে কৌশল নির্ভর করবে। যেমন ধরুন, স্ফীতি বলের খুব দুর্বল একটি ধ্বংসাবশেষ মহাবিশ্বে থেকে গেল। মহাকর্ষের কারণে যেটা এখন একেবারে থমকে আছে। কিন্তু বুদ্‌বুদ থেকে পালাতে আমাদের যে পরিমাণ সময় লাগবে, তাতে হয়তো সেই ধ্বংসাবশেষ আবার লক্ষণীয় হয়ে উঠবে। সে ক্ষেত্রে হয়তো যথেষ্ট দীর্ঘ সময় পর মহাবিশ্ব আবারও স্ফীত হতে শুরু করবে। বিগ ব্যাংয়ের পরের সেই সময়ের মতো এত প্রচণ্ডভাবে নয়,

বরং খুব ধীরে। বলা যায় যে বিগ ব্যাংয়ের একটি ক্ষীণ নমুনার মতো। কিন্তু ক্ষীণ এই প্রভাব দুর্বল হলেও এটা চলবে অনন্তকাল। মহাবিশ্বের বৃদ্ধি খুব ধীরে ধীরে বাড়লেও বড় হয়ে যাওয়ার এই হার বেড়ে যাওয়ার ভৌত প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রভাবে বুদ্‌বুদের মধ্যেই একটি ঘটনা দিগন্তের উদয় হবে, যেটাকে দেখতে অনেকটা ব্ল্যাকহোলের মতো মনে হবে, যার ভেতরটা থাকবে বাইরের দিকে। এটি একটি ফলপ্রসূ ফাঁদ হিসেবে কাজ করবে। তখনো বেঁচে থাকা যেকোনো জীব আমাদের বুদ্‌বুদের ভেতরের অসহায়ভাবে আটকে থাকবে। কারণ, তারা যতই বুদ্‌বুদের বাইরের দিকে যেতে থাকবে, বুদ্‌বুদের প্রান্ত স্ফীতির প্রভাবে ততই দ্রুত আরও সরে যেতে থাকবে। লিন্দের হিসাব-নিকাশ একটু কাল্পনিক। তবে এখানে খুব সুন্দর করে দেখানো আছে যে মানুষের চূড়ান্ত নিয়তি হয়তো খুব ক্ষুদ্র ভৌত প্রভাবের ওপর নির্ভর করবে। সে প্রভাব এত ছোট যে মহাজাগতিক পর্যায়ে সেটির বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়ার আগে আমরা তাকে শনাক্তও করতে পারব না।

কিছু দিক থেকে ভাবলে লিন্দের কসমোলজি পুরাতন স্থিরাবস্থা তত্ত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের শুরুতে তত্ত্বটি খুব জনপ্রিয় ছিল। মহাবিশ্বের সমাপ্তি এড়ানোর জন্য এটা এখনো সবচেয়ে সরল ও আকর্ষণীয় তত্ত্ব। এর মূল সংস্করণের প্রস্তাবক হলেন হারম্যান বান্ডি ও থমাস গোল্ড। এই তত্ত্বের মতে, বড় কাঠামোতে সব সময় মহাবিশ্ব অপরিবর্তিত থাকে। ফলে এর কোনো শুরু বা শেষ নেই। প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এর ফাঁকা স্থানে নতুন নতুন পদার্থ তৈরি হয়। সব সময় একটি নির্দিষ্ট ঘনত্ব বজায় থাকে। ছায়াপথগুলোর নিয়তি আমি আগের অধ্যায়গুলোতে যেমন বলেছি তেমনই : জন্ম, ক্রমবিকাশ ও মৃত্যু। কিন্তু অপরিসীম নবসৃষ্ট পদার্থ থেকে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন ছায়াপথ। ফলে প্রত্যেক যুগেই মহাবিশ্বের সাধারণ চেহারা সার্বিকভাবে একই থাকে। একটি নির্দিষ্ট আয়তনের স্থানে ছায়াপথের সংখ্যা সব সময় সমান থাকে, যাদের একেকটির বয়স একেক রকম।

শুরুতে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব কীভাবে এল, এই প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে স্থিরাবস্থা তত্ত্ব শেষ হয়ে যায়। এই তত্ত্বে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মহাজাগতিক অবিনশ্বরতার সঙ্গে মজাদার বৈচিত্র্যেও (interesting variety) সমন্বয় করা হয়েছে। আসলে এটি আরও এক ধাপ সামনেও যায়। কারণ, একেকটি ছায়াপথ ধীরে ধীরে মরে গেলেও সার্বিকভাবে মহাবিশ্ব কখনো বৃদ্ধ হয় না। আমাদের উত্তরপুরুষদের মাটি খুঁড়ে ক্রমেই ফুরিয়ে আসা জ্বালানির খোঁজ করতে হবে না। এক ছায়াপথ পুরোনো হয়ে গেলে শুধু আরেক ছায়াপথে চলে যেতে হবে, এই যা। এটা চলতে পারে অনন্তকাল পর্যন্ত। সব সময় থাকবে একই রকম তেজ, বৈচিত্র্য ও সক্রিয়তা।

তবে এটাকে কাজ করতে হলে কিছু ভৌত শর্ত পূরণ হতে হয়। প্রসারণের কারণে কয়েক শ বছর পরপর মহাবিশ্বের আকার দ্বিগুণ হয়। ঘনত্বকে একই থাকতে হলে এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১০^{৫০} টন নতুন পদার্থ প্রয়োজন। দেখে একে অনেক বেশি মনে হয়। কিন্তু এর মানে হলো, প্রতি শতকে বিমানের গ্যারেজের আকারের স্থানে গড়ে একটি পরমাণু সৃষ্টি। এমন ঘটনা আমাদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা খুব কম। এভাবে পদার্থ তৈরি হওয়ার ভৌত প্রক্রিয়ার আরও বড় একটি সমস্যা আছে। একেবারে কম করে হলেও আমাদের তো জানতে হবে বাড়তি ভরের জোগান দেওয়া সেই শক্তি কোথা থেকে আসবে। আর কেনই-বা এই শক্তি কখনো ফুরিয়ে যাবে না। ফ্রেড হয়েল ও তাঁর সহকর্মী জয়ন্ত নারলিকার এই সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। তাঁরা দুজনই স্থিরাবস্থা তত্ত্বকে বিস্তারিত রূপ দান করেন। শক্তির সরবরাহের জন্য তাঁরা সৃষ্টি ক্ষেত্র নামে নতুন ধরনের একটি ক্ষেত্র প্রস্তাব করেন। ধরে নেওয়া হয়েছিল, শক্তি ক্ষেত্রের নিজের থাকবে ঋণাত্মক শক্তি। m ভরের পদার্থের প্রতিটি নতুন কণার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি ক্ষেত্রে $-mc^2$ পরিমাণ শক্তি জমা হবে।

শক্তি ক্ষেত্রের ধারণার সাহায্যে শক্তির জোগান সমস্যার পদ্ধতিগত সমাধান হলো। কিন্তু অনেক প্রশ্ন থেকে গেল অমীমাংসিত। এ ছাড়া সমাধানটি নিছক প্রয়োজনের খাতিরেই তৈরি বলে মনে হচ্ছিল। এই রহস্যময় ক্ষেত্রের অন্য কোনো বহিঃপ্রকাশ ছিল না। এর চেয়ে বড় কথা হলো, ১৯৬০-এর দশকে পর্যবেক্ষণ চলে যাচ্ছিল তত্ত্বটির বিপক্ষে। বিপক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ছিল মহাজাগতিক পটভূমি তাপীয় বিকিরণের আবিষ্কার। সুষম এই পটভূমিকে সহজেই বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু স্থিরাবস্থা তত্ত্বে এর ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল। এ ছাড়া দূর আকাশের ছায়াপথ ও বেতার ছায়াপথের[২] জরিপ থেকে বড় কাঠামোতে মহাবিশ্বের পরিবর্তনের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা পরিষ্কার হয়ে গেলে ফ্রেড ও তাঁর সহকর্মীরা স্থিরাবস্থা তত্ত্বের সরল রূপ পরিহার করেন। অবশ্য মাঝেমধ্যে তত্ত্বটির আরও জটিল রূপের সাময়িক উদয় ঘটে।

ভৌত ও পর্যবেক্ষণমূলক সমস্যা বাদ দিলেও স্থিরাবস্থা তত্ত্ব কিছু আগ্রহোদ্দীপক দার্শনিক সমস্যার জন্ম দেয়। যেমন ধরুন, আমাদের বংশধরেরা হাতে অসীম সময় ও সম্পদ পেলে তাদের প্রযুক্তিগত উন্নতির কোনো সুস্পষ্ট সীমা থাকবে না। পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে তাদের সামনে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। ক্রমেই আরও বড় আয়তনের স্থান হবে তাদের করায়ত্ত। ফলে খুব দূরের ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের বড় একটি অংশ প্রযুক্তির দখলে আসবে। কিন্তু প্রস্তাব বলছে, মহাবিশ্বেও বড় কাঠামোর বৈশিষ্ট্য সময়ের

সঙ্গে সঙ্গে অপরিবর্তিত থাকবে। ফলে স্থিরাবস্থা তত্ত্ব বলছে, আমাদের বর্তমান মহাবিশ্ব ইতিমধ্যে প্রযুক্তির করায়ত্তে চলে এসেছে। স্থিরাবস্থার মহাবিশ্বে ভৌত অবস্থাগুলো সব যুগেই সার্বিকভাবে একই রকম। বুদ্ধিমান প্রাণীদের আবির্ভাব সব যুগেই হওয়ার কথা। আর যেহেতু এই প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধরে চলছে, সে কারণে এমন কিছু সম্প্রদায় থাকা উচিত, যারা অনেক দীর্ঘ সময় ধরে টিকে আছে। ফলে তারা প্রযুক্তি খাটিয়ে অনেক বিপুল পরিমাণ আয়তনের স্থান করায়ত্ত করার কথা, যার মধ্যে থাকবে মহাবিশ্বের আমাদের অঞ্চলটাও। বুদ্ধিমান প্রাণীরা মহাবিশ্ব দখল করতে চায় না বলে এই ফলাফল এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। অপরিসীম সময় আগে যেকোনো একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাবই এমন ফলাফলের জন্য যথেষ্ট। এর সঙ্গে প্রাচীন একটি ধাঁধার মিল আছে : অসীম মহাবিশ্বে যে ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা খুব কম, সেটিও একদিন না একদিন ঘটবে। তাও একবার-দুবার নয়। অসীম সংখ্যকবার। যুক্তির ধারা বেয়ে চলতে চলতে আমরা পৌঁছে যাই সেই তিক্ত উপসংহারে : স্থিরাবস্থা তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্বে সংঘটিত প্রক্রিয়াগুলো অবিকল এর অধিবাসীদের প্রযুক্তিগত কার্যক্রমের মতো। আমরা যাকে প্রকৃতি বলি, সেটা আসলে একটি বা একদল মহাপ্রাণীর কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। একে দেখে মনে হচ্ছে প্লেটোর ডেমিয়ার্জের একটি রূপ। ডেমিয়ার্জ হলো একটি দেবতা যে বেঁধে দেওয়া ভৌত সূত্রের সীমার মধ্যে থেকে কাজ করে। মজার ব্যাপার হলো, হয়েল তাঁর শেষের দিকের মহাজাগতিক তত্ত্বগুলোতে এমন মহাপ্রাণীদের কথা সমর্থন করে গেছেন।

মহাবিশ্বের সমাপ্তি নিয়ে কথা উঠলেই তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন আসে। আমি আগেই বলেছি, মহাবিশ্বের মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখে বার্ট্রান্ড রাসেল মনে করেছিলেন, মানুষের অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ। স্টিভেন ওয়েনবার্গও সম্প্রতি এ মত পোষণ করেছেন। তাঁর `Å dvÕ| w^ wgwbUm বইয়ের শেষের উপসংহার হলো, 'মহাবিশ্বকে যত বেশি বোঝা যাচ্ছে, ততই অর্থহীন মনে হচ্ছে। আমি বলেছি, ধীরে ধীরে মহাজাগতিক তাপীয় মৃত্যুর ভয়কে বড় করে দেখানো হয়েছে। হয়তো ভুলও করা হয়েছে। অবশ্যও মহাসংকোচনের মাধ্যমে মৃত্যু হলেও হতে পারে। আমি মহাপ্রাণীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে কিছু অনুমান করেছি, যারা বিস্ময়কর ভৌত ও বুদ্ধিগত অর্জন দিয়ে প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারে। এ ছাড়া আমি সংক্ষেপে চিন্তার সীমাহীনতা নিয়ে আলোচনা করেছি। যদিও মহাবিশ্বের সীমা থাকলেও থাকতে পারে।

কিন্তু বিকল্প এই চিত্রগুলো আমাদের হতাশা দূর করতে সক্ষম কি? একবার আমার এক বন্ধু বলল, স্বর্গ সম্পর্কে সে যা শুনেছে তাতে তার আগ্রহবোধ আসেনি। তার মতে, অনন্তকাল ধরে মহিমান্বিত ভারসাম্যপূর্ণ

জীবন হবে আকর্ষণহীন। এর চেয়ে দ্রুত মরে গিয়ে অনন্ত জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়াই ভালো। অমরত্বের জীবনে যদি একই চিন্তা ও অভিজ্ঞতাই ফিরে ফিরে ভোগ করতে হয়, তাহলে তা সত্যিই অর্থহীন। কিন্তু অমরত্বের সঙ্গে যদি উন্নতি যুক্ত হয়, তাহলে আমরা চিরন্তন নতুনত্বে বসবাসের কথা কল্পনা করতে পারি। সব সময় নতুন ও রোমাঞ্চকর কিছু করা ও শেখা যাবে। সমস্যা হলো, তার উদ্দেশ্য কী হবে? মানুষ একটি প্রকল্প হাতে নিলে তার পেছনে থাকে উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে প্রকল্প হয় ব্যর্থ (যদিও লব্ধ অভিজ্ঞতার মূল্য আছে) অন্যদিকে লক্ষ্য অর্জিত হলে প্রকল্প সফল। আর কার্যক্রম হবে সমাপ্ত। যে প্রকল্প কখনো শেষ হবে না, তার কি কোনো সত্যিকার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে? অস্তিত্বের স্বরূপ যদি হয় কখনো পৌঁছাতে না পারা এক গন্তব্য, তবে কি তাকে অর্থবহ বলা যাবে?

মহাবিশ্বের কোনো উদ্দেশ্য থাকলে আর সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হলে মহাবিশ্বের সমাপ্তি ঘটতেই হবে। কারণ, তখনো এর অস্তিত্ব অবিরাম থাকা হবে ভিত্তিহীন ও নিরর্থক। অন্যদিকে, মহাবিশ্ব চিরকাল টিকে থাকলে এর কোনো চূড়ান্ত উদ্দেশ্য আছে, কল্পনা করা কঠিন। ফলে মহাজাগতিক সফলতার বিনিময় হয়তো মহাজাগতিক মূল্য দিয়ে দিতে হবে। আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা হলো, আমাদের বংশধরেরা হয়তো শেষ তিন মিনিটের আগেই মহাবিশ্বের উদ্দেশ্য জানতে পারবে।

তথ্যনির্দেশ

১. ফিনিক্স মূলত গ্রিক রূপকথার একটি পাখি, যা চক্রাকারে একের পর এক এর পূর্বপুরুষের ছাই থেকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

২. বর্ণালির বেতার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অংশে যে গ্যালাক্সিগুলো খুব উজ্জ্বল, তাদের নাম বেতার ছায়াপথ। ১০ মেগাহার্টজ থেকে ১০০ গিগাহার্টজ কম্পাঙ্কে এদের দীপ্তি $১০^{৩৯}$ ওয়াট পর্যন্ত হয়।

পরিশিষ্ট

মহাবিশ্বের সম্ভাব্য পরিণতি

গত শতকে আমরা জানতে পারি, মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট অতীত আছে। তার আগে স্থিরাবস্থা তত্ত্ব জনপ্রিয় ছিল। ধারণা করা হতো, মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে উপস্থিত আছে। বয়স অনন্ত হলে ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে প্রশ্ন আসে না। কিন্তু কবির কথা, 'জন্মিলে মরিতে হবে।' তাই ভবিষ্যতে কী হবে, সেটা বড় এক প্রশ্ন।

১৯২০ থেকে ১৯৫০—এই ৩০ বছর ধরে বিজ্ঞানী এডউইন হাবলের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝা গেল, ছায়াপথগুলো একে অপর থেকে দূরে সরছে। এ থেকেই তৈরি হয় বিগ ব্যাং তত্ত্ব। ১৯২৭ সালে জর্জ লেমেইত্র বলেন, প্রসারণশীল মহাবিশ্ব থেকে বলা যায়, অতীতে মহাবিশ্ব ছিল নিবিড় এক বিন্দুর মতো। এর আগে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের সমাধান করে আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যানও একই কথা বলেছিলেন। আইনস্টাইনের সমীকরণের একটি সমাধান অনুসারে দেখা যায়, একটি প্রাথমিক সিঙ্গুলারিটি থেকে জন্ম মহাবিশ্বের। ১৯৬৪ সালে আবিষ্কৃত হয় মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ। বিগ ব্যাংয়ের পক্ষে একটি বড় প্রমাণ একটি।

১৯৯৮ সাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, মহাবিশ্বের প্রসারণের গতি ক্রমেই বাড়ছে। এর জন্য দায়ী শক্তিকে নাম দেওয়া হয় ডার্ক এনার্জি। আইনস্টাইনের সমীকরণ বলছিল, মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু আইনস্টাইন নিজেই সেটা বিশ্বাস করতেন না। সমীকরণ অসম্পূর্ণ মনে করে তিনি তাই বাড়তি একটি ধ্রুবক যোগ করেছিলেন। পরে স্বীকার করেন, এটা তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। কিন্তু এখন আবার মনে হচ্ছে এই ধ্রুবক দরকার আছে। এই ধ্রুবক আসলে ডার্ক এনার্জির বিপরীতে কাজ করে।

ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের ভাগ্যে মোটাদাগে বললে তিনটি ঘটনা ঘটতে পারে। হয় এটি চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে। মহাকর্ষ প্রসারণের গতি

কমানোর চেষ্টা করবে। তবে ডার্ক এনার্জির কারণে প্রসারণের গতি ক্রমেই বাড়বে। আরেকটি হতে পারে, মহাবিশ্বের প্রসারণ একসময় থেমে যাবে। শুরু হবে সংকোচন। আরেকটি সম্ভাবনা হলো, প্রসারণ চলতে থাকবে। তবে প্রসারণের গতি ক্রমেই কমতে থাকবে। কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে না।

ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের ভাগ্যে কী ঘটবে, তার বড় একটি প্রভাবক হলো মহাবিশ্বের ঘনত্ব পরিমিতি (density parameter)। একে গ্রিক বর্ণ ওমেগা (Ω) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এর মান পেতে মহাবিশ্বের বস্তুর গড় ঘনত্বকে ঘনত্বের একটি ক্রান্তি মান দ্বারা ভাগ করা হয়। ঘনত্বের যে মান খুব অল্পের জন্য মহাবিশ্বের প্রসারণকে থামাতে বন্ধ হবে, তার নাম ক্রান্তি (critical) ঘনত্ব।

মহাবিশ্বের ভবিষ্যতের সঙ্গে এর আকৃতিরও সম্পর্ক আছে। ওমেগার মান ১-এর বেশি হলে মহাবিশ্বের আকৃতি হবে আবদ্ধ গোলকের পৃষ্ঠের মতো। কারণ, এ ক্ষেত্রে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রান্তি ঘনত্বের চেয়ে বেশি। পৃথিবীর পৃষ্ঠের মতো এমন মহাবিশ্বের ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রির বেশি হবে। তবে বড় মাপকাঠিতে মহাবিশ্বের আকৃতি হবে উপবৃত্তের মতো। মহাকর্ষের প্রভাবে একসময় প্রসারণ থেমে যাবে। শেষ পর্যন্ত ঘটবে বিগ ক্রাঞ্চ (Big Crunch) বা মহাসংকোচন। বিন্দু থেকে আসা মহাবিশ্ব বিন্দুতে গিয়েই আবার মিশে যাবে।

তবে কিছু কিছু আধুনিক তত্ত্ব বলছে, ওমেগার মান ১-এর বেশি হলেও ডার্ক এনার্জির প্রভাবে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতেই থাকবে। এ কারণে মহাসংকোচন ঘটার সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত অর্জিত জ্ঞান অনুসারে কম। তবে ঘটবেই না, সেটা বলার জো নেই।

ওমেগার মান ১-এর কম হলে মহাবিশ্ব হবে উন্মুক্ত। ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রির কম হবে। মহাকর্ষ প্রসারণকে কিছুটা কমাবে। কিন্তু ডার্ক এনার্জির প্রভাবে সে বাধা উপেক্ষা করে প্রসারণের গতি বরং আরও বেড়ে যেতে থাকবে। এভাবে চলতে থাকলে একসময় মহাকর্ষ, তড়িৎ-চুম্বকত্ব ও সবল নিউক্লীয় বলের বাঁধন ছিঁড়ে যাবে। এ অবস্থাকে বলা হয় বিগ রিপ (Big Rip) বা মহাভাঙন।

একই রকম পরিস্থিতিতে আরেকটি সম্ভাব্য পরিণতির নাম বিগ ফ্রিজ (Big Freeze) বা মহাহিমায়ন। এ অবস্থায় সর্বত্র বিরাজ করবে হিমশীতল অবস্থা। হবে না কোনো রকম তাপ বিনিময়। থেমে যাবে বস্তুকণার চলাচল। এ কারণে এর অপর নাম তাপীয় মৃত্যু। এটা ঘটে গেলে বস্তুর মধ্যে আর কোনো ধরনের তাপ বিনিময় সম্ভব হবে না। সব যন্ত্র অচল হয়ে যাবে। এনট্রপি (শক্তি রূপান্তরের অক্ষমতা) হবে সর্বোচ্চ।

তবে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রান্তি ঘনত্বের সমানও হয়ে যেতে পারে। সত্যি বলতে, বর্তমান পর্যবেক্ষণ এর পক্ষেই কথা বলছে। এমন মহাবিশ্বেই ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রি হয়। এ ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব হবে সমতল। পর্যবেক্ষণ বলছে, মহাবিশ্ব এমনই। এই ফলাফলের ত্রুটির মাত্রা মাত্র ০.৪ শতাংশ। এই মহাবিশ্বও চিরকাল প্রসারিত হবে, তবে প্রসারণের হার ক্রমেই কমবে। তবে কখনোই একেবারে থেমে যাবে না। তবে ডার্ক এনার্জি ভূমিকা রাখলে প্রসারণ শুরুতে থামলেও আবার বেড়ে যাবে। পরিণতি হবে সেই উন্মুক্ত মহাবিশ্বের মতোই।

আরও কিছু সম্ভাব্য ঘটনা ঘটতে পারে মহাবিশ্বের ভাগ্যে। এর একটি হলো বিগ বাউন্স। এটা আসলে মহাবিশ্ব সম্পর্কে চক্রাকার মডেলের একটি অংশ। এটি অনুসারে, মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল সংকুচিত অবস্থা থেকে। আর সেই সংকুচিত অবস্থাটা এসেছিল তার পূর্ববর্তী একটি প্রসারণ থেমে গিয়ে গুটিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। এভাবে মহাবিশ্ব একের পর সংকুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে। একের পর ঘটছে বিগ ব্যাং ও বিগ ক্রাঞ্চ। এ জন্যই এই মডেলের নাম চক্রাকার মডেল।

বিজ্ঞানীরা বলছেন আরও একটি সম্ভাবনার কথা। এর নাম বিগ স্লার্প (Big Slurp)। স্লার্প অর্থ গ্রাস করা বা গ্রাস করার সময় সৃষ্ট শব্দ। এ তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্ব এখন নকল ভ্যাকুয়াম অবস্থায় আছে। যেকোনো সময় চলে যেতে পারে প্রকৃত ভ্যাকুয়ামে। প্রকৃতির যেকোনো ভৌত প্রক্রিয়া সব সময় সর্বনিম্নের শক্তির অবস্থানে থাকতে চায়। আর মহাবিশ্ব সর্বনিম্ন শক্তির অবস্থায় থাকলেই কেবল প্রকৃত ভ্যাকুয়ামে থাকবে। এখন সেটা না-ও হতে পারে। হয়তো মহাবিশ্ব এখন উচ্চতর শক্তির অবস্থানে আছে। তার মানে আছে নকল ভ্যাকুয়াম অবস্থায়। সে ক্ষেত্রে যেকোনো সময় এটি আসল ভ্যাকুয়ামে চলে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমূল পাল্টে যাবে আমাদের চিরচেনা মহাবিশ্ব। ভৌত ধ্রুবকদের মান বদলে যেতে পারে। পাল্টে যেতে পারে আলোর বেগের মান কিংবা অ্যাভোগেড্রো ধ্রুবক। ফলে স্থান, কাল, বস্তু ও শক্তির ধারণা একদম বদলে যেতে পারে। হয়তো আগাম কোনো সংকেত না দিয়েই ধ্বংস হয়ে যাবে মহাবিশ্ব।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এগারো ও তৃতীয় অধ্যায়ে।

পরিভাষা

অনেক সময় নিছক দু-একটি শব্দ বুঝতে না পারার কারণে কোনো বইয়ের মূল অংশই বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ সমস্যা দূর করতেই বইটিতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষা যোগ করা হয়েছে। পরিভাষাগুলোকে বাংলা একাডেমির নিয়ম মেনে বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

অনিশ্চয়তা নীতি (Uncertainty principle) : কোনো কণিকার অবস্থান ও বেগ একই সঙ্গে নিশ্চিত করে জানা সম্ভব নয়। এর একটি যত বেশি নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা হবে, অপরটি সম্পর্কে পাওয়া তথ্য ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এই নীতিটি হাইজেনবার্গের অবদান।

আকাশগঙ্গা (Milky Way) : আমাদের সূর্য যে ছায়াপথের অংশ। পৃথিবী থেকে সর্পিল বাহুর এই ছায়াপথের অরায়ন বাহুটি গ্রীষ্মের রাতের আকাশে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বৃত্তচাপের মতো দেখা যায়।

অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়া (Irreversible process) : যে প্রক্রিয়া শুধু একদিকেই চলে, পেছন দিকে ফিরে আসে না। এর প্রয়োগ দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

আইনস্টাইন-রোজেন সেতু (Einstein-Rosen bridge) : স্থান-কালের একটি সরু টিউব, যা দুটি ব্ল্যাকহোলকে যুক্ত করে। আরও দেখুন, 'ওয়ার্মহোল'।

আলোকবর্ষ (light-year) : আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে। মনে রাখতে হবে, আলোকসেকেন্ড এবং এই জাতীয় এককগুলো সময়ের নয়, দূরত্বের একক।

আলোকসেকেন্ড (Light-second) : আলো এক সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে।

ইলেকট্রন (Electron) : নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘূর্ণনরত নেগেটিভ বা ঋণাত্মক চার্জধারী কণিকা।

ইলেকট্রিক চার্জ বা তড়িৎ আধান (Electric charge) : কণিকার ধর্ম যার মাধ্যমে এটি বিপরীত চার্জধারী অন্য কণিকাকে আকর্ষণ করে এবং একই রকম চার্জধারী কণিকাকে বিকর্ষণ করে।

ওজন (Weight) : মহাকর্ষীয় (বা অভিকর্ষীয়) ক্ষেত্র দ্বারা কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল। এটি ভরের সমানুপাতিক কিন্তু সমান নয়। আমরা সাধারণত যাকে ওজন বলি, সেটি আসলে ভর। ভরের সঙ্গে অভিকর্ষীয় ত্বরণ গুণ করলে ওজন পাওয়া যায়।

ওয়ার্মহোল (Wormhole) : মহাবিশ্বের দূরবর্তী দুটি অঞ্চলের সংযোগ প্রদানকারী একটি পাতলা টিউব বা সুড়ঙ্গ। ওয়ার্মহোলের অপর প্রান্তে সমান্তরাল বা শিশু মহাবিশ্ব থাকতে পারে, যার মাধ্যমে সময় ভ্রমণ সম্ভব হতে পারে।

কণাত্বরকযন্ত্র (Particle accelerator) : যে মেশিনের সাহায্যে ইলেকট্রোম্যাগনেট বা তড়িৎ-চুম্বক ব্যবহার করে বেশি শক্তি দিয়ে দিয়ে গতিশীল চার্জধারী কণিকাদের বেগ বৃদ্ধি করা যায়।

কণাতরঙ্গ দ্বৈততা (Wave-particle duality) : কোয়ান্টাম মেকানিকসের এই নীতি, কণিকা ও তরঙ্গের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কোনো সময় কণিকা আচরণ করে তরঙ্গের মতো, আবার কখনো তরঙ্গ কণিকার মতো আচরণ করে।

কসমোলজি বা **মহাবিশ্বতত্ত্ব** (Cosmology) : সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়ে যে শাস্ত্রে।

কোয়ান্টাম (Quantum) : কোনো পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ায় অংশ নেওয়া বস্তুর সর্বনিম্ন পরিমাণ।

কোয়ান্টাম মেকানিকস (Quantum mechanics) : প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম নীতি ও হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি থেকে প্রস্তুত করা থিওরি।

কোয়ার্ক (Quark) : একটি চার্জধারী মৌলিক কণিকা, যা সবল নিউক্লিয়ার বল অনুভব করে। প্রোটন ও নিউট্রন দুটি কণিকাই তিনটি করে কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত।

কম্পাঙ্ক বা **ফ্রিকোয়েন্সি** (Frequency) : কোনো তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো চক্র বা কম্পন সম্পন্ন করে।

কৃষ্ণগহ্বর (Blackhole) : স্থান-কালের এমন অঞ্চল যেখান থেকে কোনো কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না। এমনকি আলোও না।

ক্ষেত্র (Field) : এমন কিছু যা স্থান-কালের উল্লেখযোগ্য অংশে বিস্তৃত। এটি কণিকার বিপরীত, যা নির্দিষ্ট কোনো সময়ে শুধু একটি বিন্দুতেই অবস্থান করে।

গামা রশ্মি (Gamma rays) : খুব ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চুম্বকীয় রশ্মি। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা মৌলিক কণিকাদের সংঘর্ষের ফলে এটি উৎপন্ন হয়। আরও দেখুন, 'তেজস্ক্রিয়তা'।

গ্যালাক্সি (Galaxy) : দেখুন, 'ছায়াপথ'।

ঘটনা (Event) : নির্দিষ্ট স্থান ও সময়বিশিষ্ট স্থান-কালের ওপরস্থ কোনো বিন্দু।

ঘটনা দিগন্ত (Event horizon) : ব্ল্যাকহোলের সীমানা। ব্ল্যাকহোলের চারপাশের যে অঞ্চলের বাইরে আলো আসতে পারে না।

চৌম্বক ক্ষেত্র (Magnetic field) : চৌম্বক বলের জন্য দায়ী ক্ষেত্র। তড়িৎ ক্ষেত্রের (electric field) সঙ্গে সমন্বিত হয়ে এটি এখন তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের অংশ।

ছায়াপথ (Galaxy) : মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ বহু নক্ষত্র, আন্তনাক্ষত্রিক গ্যাস, ধূলির ও ডার্ক ম্যাটারের সমাবেশ।

ডার্ক ম্যাটার (Dark matter) : গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সিপুঞ্জ ও এদের মধ্যে অবস্থিত সেসব বস্তু, যাদের এখনো সরাসরি দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু মহাকর্ষীয় প্রভাবের কারণে এদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। মহাবিশ্বের অন্তত ৯০ শতাংশ ভরই ডার্ক ম্যাটার।

ডিউটেরিয়াম (Deuterium) : ২টি প্রোটনসংবলিত হাইড্রোজেনের একটি রূপ।

তড়িৎ-চুম্বকীয় বল (Electromagnetic force) : ইলেকট্রিক চার্জধারী কণিকাদের মধ্যে যে বল কাজ করে। চার প্রকার মৌলিক বলের মধ্যে শক্তিতে দ্বিতীয়।

তত্ত্ব (Theory) : তরঙ্গদৈর্ঘ্য কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারা ও ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে অনুমান করতে পারা কোনো একটি মডেল।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wavelength) : কোনো তরঙ্গের পাশাপাশি অবস্থিত দুটি চূড়া বা খাঁজের মধ্যে দূরত্ব। **[চিত্র দেখুন]????????????????**

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র (Second Law of Thermodynamics) : একটি আবদ্ধ সিস্টেমের এনট্রপি কখনো কমে না। এনট্রপি মানে শক্তি রূপান্তরের অক্ষমতা। যেমন ফ্যান চালালে বিদ্যুৎশক্তি ঘূর্ণশক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু তাপশক্তি আকারে কিছু শক্তি অপচয় হয়, যেটাকে কাজে লাগানো যায় না। এভাবে প্রতিনিয়ত কিছু শক্তি অব্যবহারযোগ্য হয়ে যায়। সাধারণত এনট্রপি সব সময় বাড়ে। এনট্রপি পরিবর্তন হবে না, যদি প্রক্রিয়া প্রত্যাগামী হয়। আরও দেখুন, প্রত্যাগামী।

তারামণ্ডলী (Constellation) : আকাশের ৮৮টি অঞ্চলের আলাদা নাম। মহাজাগতিক বিভিন্ন বস্তু আকাশের কোন দিকে অবস্থিত, তা সহজে চেনার জন্য তারামণ্ডলী কাজে আসে। এমনিতে একই তারামণ্ডলীতে অবস্থিত নক্ষত্র বা ছায়াপথগুলো বাস্তবে সাধারণত বহু দূরে দূরে থাকে। শুধু দেখতেই একই দিকে। কেউ দূরে, কেউ কাছে।

তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) : কিছু কিছু পরমাণু নিজেই নিজেই অন্য পরমাণুতে পরিণত হওয়ার যে প্রক্রিয়া।

দশা (Phase) : নির্দিষ্ট সময়ে কোনো তরঙ্গের অবস্থান। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে তরঙ্গের অবস্থান কি খাঁজে, চূড়ায় নাকি এই দুইয়ের মধ্যে অন্য কোথাও আছে।

দুর্বল নিউক্লিয়ার বল (Weak force) : চার প্রকার মৌলিক বলের মধ্যে দ্বিতীয় দুর্বল বল। এটি মহাকর্ষের চেয়ে শক্তিশালী। এরও পাল্লা খুব ছোট। এটি যেকোনো বস্তুকণাকে আকর্ষণ করে, তবে বলবাহী কণিকাকে আকর্ষণ করে না। (*একে সংক্ষেপে বলা হয় দুর্বল বল।)

নক্ষত্র (Star) : মহাকর্ষ বন্ধনে আবদ্ধ গোলাকৃতির প্লাজমা পদার্থ। গ্রহ-নক্ষত্রের পার্থক্য হলো, বেশির ভাগ নক্ষত্রের জীবনের উল্লেখযোগ্য সময়জুড়ে ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আলো ও তাপ উৎপন্ন করে।

নিউক্লিয়ার ফিউশন (Nuclear fusion) : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস সংঘর্ষের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে মাত্র একটি ভারী নিউক্লিয়াস গঠন করে।

নিউক্লিয়াস (Nucleus) : পরমাণুর কেন্দ্রীয় অংশ। এতে সবল বলের মাধ্যমে প্রোটন ও নিউট্রন যুক্ত থাকে।

নিউট্রন (Neutron) : অনেকটা প্রোটনের মতোই একটি কণিকা, তবে এতে কোনো চার্জ নেই। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অর্ধেক কণিকা এই নিউট্রন দিয়ে পূরণ হয়।

নিউট্রন নক্ষত্র (Neutron star) : সুপারনোভা বিস্ফোরণের পরে অনেক সময় যে শীতল অংশ বাকি থেকে যায়। এটি ঘটে যখন কোনো নক্ষত্রের কেন্দ্রভাগের বস্তু গুটিয়ে নিউট্রনের ঘনভরের বস্তুতে পরিণত হয়। (*এর মহাকর্ষ এতটা শক্তিশালী যে ইলেকট্রন ও প্রোটন এক হয়ে গিয়ে পুরোটা চার্জহীন নিউট্রনে পরিণত হয়।) আরও দেখুন : নিউট্রন।

নিউট্রিনো (Neutrino) : একটি অসম্ভব হালকা কণিকা, যা শুধু মহাকর্ষ ও দুর্বল নিউক্লিয়ার বল দ্বারা প্রভাবিত হয়।

নিশ্চল ভর (Rest Mass) : সিস্টেমের সার্বিক গতি থেকে স্বাধীন মোট ভরকে নিশ্চল ভর বলে। অন্য নাম : প্রকৃত (proper) ভর, অভ্যন্তরীণ (intrinsic) ভর।

ত্বরণ (Acceleration) : যে হারে (সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে) কোনো বস্তুর বেগ পরিবর্তন হয়।

দ্বৈততা (duality) : আপাতদৃষ্টে আলাদা হলেও একই ফলাফল প্রদান করা দুটো থিওরির মধ্যে সম্পর্ক। আরও দেখুন, 'কণা/ তরঙ্গ দ্বৈততা'।

পজিট্রন (Positron) : ইলেকট্রনের ধনাত্মক চার্জধারী প্রতিকণিকা। আরও দেখুন, 'প্রতিকণিকা'।

পরম শূন্য তাপমাত্রা (Absolute zero temperature) : সর্বনিম্ন সম্ভাব্য সেই তাপমাত্রা, যাতে বস্তুর কোনো তাপশক্তি থাকে না। এর মান ০ কেলভিন বা -২৭৩.১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পরমাণু (Atom) : সাধারণ বস্তুর মৌলিক একক। এতে একটি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসের (প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে তৈরি) চারপাশে ইলেকট্রনরা কক্ষপথে ঘুরতে থাকে।

প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম নীতি (Planck's quantum principle) : আলো (বা অন্য যেকোনো প্রচলিত তরঙ্গ) শুধু বিচ্ছিন্ন কোয়ান্টা আকারে নির্গত হয়, যার শক্তি এর কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক। আরও দেখুন, 'সমানুপাতিক ও ব্যস্তানুপাতিক'।

প্রতিকণিকা (Antiparticle) : বস্তুর কণিকার বিপরীতে একটি প্রতিকণিকা আছে (যার চার্জ ছাড়া আর সব ধর্ম কণিকার মতোই। যেমন ইলেকট্রনের প্রতিকণিকা পজিট্রন, যার চার্জ +১।)। কণিকা ও প্রতিকণিকার মধ্যে সংঘর্ষ হলে দুটিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, বিনিময়ে পাওয়া যায় শক্তি।

প্রতিসাম্য (Symmetry) : একটি বিন্দু বা অবস্থানের সাপেক্ষে কোনো জিনিসকে দুই বিপরীত দিক থেকে দেখতে একই রকম দেখা গেলে তাকে প্রতিসম জিনিস বা ঘটনা বলে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, নবম অধ্যায়ের অনুবাদকের নোট।

প্রোটন (Proton) : প্রায় নিউট্রনের মতোই একটি কণিকা। কিন্তু এর রয়েছে ধনাত্মক চার্জ। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের কণিকাদের প্রায় অর্ধেকসংখ্যক এরা।

ফোটন (Photon) : আলোর একটি কোয়ান্টাম। আরও দেখুন, 'কোয়ান্টাম'।

ফিউশন : দেখুন, 'নিউক্লিয়ার ফিউশন'।

বর্ণালি (Spectrum) : একটি তরঙ্গের উপাদান কম্পাঙ্কগুলো। সৌরবর্ণালির দৃশ্যমান অংশ রংধনুতে দেখা যায়। আমরা খালি চোখে যে আলো দেখি, এর বাইরেও নানান আলো আছে জগতে। সব আলোকে একসঙ্গে বলা হয় বর্ণালি।

বিগ ব্যাং (Big bang) : মহাবিশ্বের শুরুতে যে সিঙ্গুলারিটি ছিল। আরও দেখুন, 'সিঙ্গুলারিটি'।

বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব (Special relativity) : মহাকর্ষের অনুপস্থিতিতে যেকোনো বেগে গতিশীল সব পর্যবেক্ষকের কাছে বিজ্ঞানের সূত্রগুলো একই থাকবে—এই নীতির ভিত্তিতে তৈরি আইনস্টাইনের থিওরি। কাল দীর্ঘায়ন, দৈর্ঘ্য সংকোচন, ভর-শক্তি সমতুল্যতা প্রভৃতি এই থিওরির ফসল। আরও দেখুন, 'সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব'।

ব্যস্তানুপাতিক (inversely proportional) : X Y-এর ব্যস্তানুপাতিক হলে এর অর্থ হচ্ছে Y-কে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে X-কে সেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ দেওয়া হচ্ছে। অর্থ্যাৎ, Y যত গুণ বাড়বে, X তত গুণ কমে যাবে। যেমন Y দ্বিগুণ হলে X হয়ে যাবে অর্ধেক। Y তিন গুণ হলে X হবে তিন ভাগের এক ভাগ। তবে যদি বলা হয় X Y-এর বর্গের ব্যস্তানুপাতিক, তাহলে Y দ্বিগুণ হলে X হবে চার ভাগের এক ভাগ। আরও দেখুন, 'সমানুপাতিক'।

ব্ল্যাকহোল (Black hole) : দেখুন, 'কৃষ্ণগহ্বর'।

ভর (Mass) : কোনো বস্তুতে উপস্থিত পদার্থের পরিমাণ; বস্তুর জড়তা বা ত্বরণের প্রতি-বাধা।

ভার্চ্যুয়াল কণিকা (Virtual particle) : যে কণিকাদের সরাসরি দেখা যায় না, কিন্তু পরিমাপযোগ্য প্রতিক্রিয়া থাকে। এরা খুব ক্ষণস্থায়ী। অনিশ্চয়তা নীতির মাধ্যমে তৈরি হয় ও আবার দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায়।

মহাজাগতিক ধ্রুবক (Cosmological constant) : স্থান-কালের সহজাত ধর্মই হচ্ছে প্রসারিত হওয়া—এমন ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আইনস্টাইনের উদ্ভাবিত গাণিতিক ধ্রুবক। পরে দেখা গিয়েছিল এই ধ্রুবক আনা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। কিন্তু এখন আবার এর প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে।

মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ (Microwave background radiation) : আদি উত্তপ্ত মহাবিশ্ব থেকে নির্গত বিকিরণ। বর্তমানে এর এত বেশি লাল সরণ হয়েছে যে একে আর আলো হিসেবে দেখা যায় না, পাওয়া যায় মাইক্রোওয়েভ হিসেবে। মাইক্রোওয়েভ হলো কয়েক সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ। আরও দেখুন, 'লাল সরণ'।

মিল্কিওয়ে : দেখুন 'আকাশগঙ্গা'।

মৌলিক কণিকা (Elementary particle) : এমন কণিকা, যাকে আর ভাঙা যায় না বলে বিশ্বাস করা হয়।

রেডার (Radar) : বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের যন্ত্র। যন্ত্র থেকে প্রেরিত সংকেত বস্তুতে পৌঁছে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে, তা কাজে লাগিয়ে দূরত্ব বের করা হয়।

লাল বা লোহিত সরণ (Red shift) : ডপলার ক্রিয়ার কারণে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া নক্ষত্রের আলোকে লাল দেখা।

সবল নিউক্লিয়ার বল (Strong force) : চার প্রকারের মৌলিক বলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বল। তবে এর পাল্লা সবচেয়ে ছোট। মানে, এর প্রভাব বেশি দূর পর্যন্ত কাজ করে না। এটি কোয়ার্কদের যুক্ত করে প্রোটন ও নিউট্রন এবং প্রোটন ও নিউট্রনকে যুক্ত করে পরমাণু গঠন করে। সংক্ষেপে সবল বলও বলা হয়।

সমানুপাতিক (Proportional) : X Y-এর সমানুপাতিক হলে এর অর্থ হচ্ছে Y-কে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হলে X-কেও সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হবে। এর অর্থ হবে Y যে হারে বাড়বে X ও সেই হারে বাড়বে। তবে যদি বলা হয় X Y-এর বর্গের সমানুপাতিক, তবে Y দ্বিগুণ হলে X চার গুণ হবে; Y ৩ গুণ হলে X ৯ গুণ হবে ইত্যাদি।) আরও দেখুন, 'ব্যস্তানুপাতিক'।

সাধারণ বা সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব (General relativity) : যেকোনো গতিতে চলা পর্যবেক্ষকের কাছে বিজ্ঞানের সূত্রগুলো একই হবে—এই ধারণার ভিত্তিতে তৈরি আইনস্টাইনের থিওরি। এই থিওরি মহাকর্ষকে চতুর্মাত্রিক স্থান-কালের সাহায্যে প্রকাশ করে। বড় মাপকাঠিতে মহাবিশ্বকে এই তত্ত্ব দিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়।

স্থান-কাল (Space-time) : চতুর্মাত্রিক স্থান, যার বিন্দুগুলোকে ঘটনা বলা হয়।

সিঙ্গুলারিটি (Singularity) : স্থান-কালের এমন বিন্দু, যেখানে স্থান-কালের বক্রতা (অথবা অন্য কোনো বস্তুগত রাশি) অসীম হয়।

স্ট্রিং থিওরি (String theory) : পদার্থবিদ্যার সেই থিওরি, যাতে বিভিন্ন কণিকাকে স্ট্রিংয়ের (সুতা, দড়ি ইত্যাদি) কম্পন মনে করা হয়। স্ট্রিংয়ের শুধু দৈর্ঘ্য আছে, অন্য কোনো মাত্রা (উচ্চতা বা প্রস্থ) নেই।

সিমুলেশন (simulation) : বাস্তবে করা অসম্ভব বা কঠিন, এমন ক্ষেত্রে বিশেষত কম্পিউটারের সাহায্যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করার নাম সিমুলেশন। বিস্তারিত দেখুন পঞ্চম অধ্যায়ের নোটে।